بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O (سورة ال عمران : اية - ١٠٤)

দা'ওয়াত

সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার,

আলমগীর খানক্বাহ শরীফ ষোলশহর, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১১৯৯-২২৪৪০৩

প্রকাশনায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,

E-mail:anjumanturst@gmail.com,monthlytarjuman@gmail.com

www.anjumantrust.org

দা'ওয়াত

সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

আলমগীর খানক্বাহ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল

১ রজব, ১৪৩৭ হিজরী

২৬ চৈত্র ১৪২২ বাংলা

৯ এপ্রিল, ২০১৬ ইংরেজী

কম্পোজ - সেটিং

মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

হাদিয়া: ১৫০/- (একশ' পঞ্চাশ) টাকা

DA'WAT EDITED BY **MOULANA MUHAMMAD ABDUL MANNAN**, DIRECTOR GENERAL, ANJUMAN RESEARCH CENTRE, CHITTAGONG, PUBLISHED BY **ANJUMAN-E RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST.** CHITTAGONG, BANGLADESH. **HADIAH TK. 150/-** ONLY.

সূচীপত্র

ক্র.ম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	সম্পাদকীয়	০৪
০২.	**তাফসীরুল ক্বোরআন-** **পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে দা'ওয়াত-ই খায়র** মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান	০৫ ০৬
০৩.	**হাদীস-ই নবভী শরীফ-** **চারটি হাদীস সম্পর্কে বিভ্রান্তির নিরসন** মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মঈন উদ্দীন আশরাফী	১৫ ১৬
০৪.	**প্রবন্ধ-** **ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে নামায-রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য** মাওলানা মুফীত সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলক্বাদেরী	৩৮ ৩৯
০৫.	**ইসলামী অনুষ্ঠানাদি-** আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ	৫১
০৬.	**ইমাম-ই আ'যম আলায়হির রাহ্মাহ্ ও হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব** মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান	৮৬
০৭.	**আক্বীদার বিশুদ্ধতার সাথে আমল ও সচ্চরিত্রের গুরুত্ব** হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান	১০১
০৮.	**দা'ওয়াত-** **ক্বোরআনুল করীম ও হাদীস শরীফের আলোকে রিসালত ও দ্বীন প্রচার** ড. মাওলানা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী	১১৮ ১১৯
০৯.	**দ্বীন প্রচার (দা'ওয়াত)-এর গুরুত্ব ও পদ্ধতি** মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আলআযহারী	১৩৪
১০.	**তাসাওফ-** **তাসাওফ ও তরীক্বতের গুরুত্ব** অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী	১৬৩ ১৬৪
১১.	**উপমহাদেশে শাহানশাহে সিরিকোটের অবদান** মাওলানা ড. মুহাম্মদ সাইফুল আলম	১৮৫
১২.	**ইসলামী সংস্কৃতি-** **ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি, তাৎপর্য ও এর পরিধি** অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার	২০৭ ২০৮

সম্পাদকীয়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
নাহ্মাদুহূ ওয়ানুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা হাবীবিহিল করীম
ওয়া 'আলা- আ-লিহী ওয়া সাহ্বিহী আজমা'ঈন

'দা'ওয়াতে খায়র' অর্থাৎ কল্যাণের প্রতি আহ্বান, অন্য ভাষায় সৎকাজের প্রতি আহ্বান ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসে এর প্রতি অত্যন্ত তাকীদ ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা একেবারে বর্জনের বিরুদ্ধেও পবিত্র ক্বোরআন এবং হাদীসে শাস্তির হুমকি এসেছে। তাই, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গ ওলামা-মাশাইখ এ কাজকে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব হিসেবে নির্ভয়ে ও হিকমত বা কৌশল অবলম্বন করে অতি যত্নসহকারে পালন করে এসেছেন।

বর্তমান যুগেও সঙ্গত কারণে 'দা'ওয়াতে খায়র'-এর কাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুল আলী ও পীরে বাঙ্গাল হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ সাহেব হুযূর ক্বেবলা 'দা'ওয়াতে খায়র'-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বলাবাহুল্য, এ পবিত্র ও বরকতমন্ডিত দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুবাল্লিগ (প্রচারক)-এর বিকল্প নেই। তাই, আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায় এবং 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির তত্বাবধানে এবং আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের পরিচালনায়, আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফে প্রতিষ্ঠিত 'আনজুমান রিসার্চ সেন্টার অডিটোরিয়াম'-এ বিগত ১৪ মার্চ থেকে ১১ জুলাই ২০১৫ইং পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৫ (পাঁচ) ব্যাচে ইলমে ক্বিরাআতসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর সর্বমোট ৩১৮ জন (মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগাহ্)কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর তাঁদের অনেকে আপন আপন এলাকায় 'দা'ওয়াতে খায়র'-এর কাজ করে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে এভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে দা'ওয়াতের কাজ আরো ব্যাপক ও বেগবান হবে।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত প্রশিক্ষণের জন্য যে সব দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদেরকে অনুরোধ করা হয়েছিলো যেন তাঁরা নিজ নিজ নির্দ্ধারিত বিষয় কিংবা যুগের চাহিদানুসারে প্রবন্ধ প্রদান করেন, যাতে একটি ম্যাগাজিন আকারে ওই প্রবন্ধগুলো প্রকাশ করা যায়। অতি আনন্দের বিষয় যে, বেশ কয়েকজন সম্মানিত প্রশিক্ষক তাঁদের গবেষণালবদ্ধ প্রবন্ধ সরবরাহ্ করেছেন। সুতরাং আমরা ওইসব প্রবন্ধ এবং আরো কিছু জরুরী বিষয়ের প্রবন্ধে সমৃদ্ধ করে এ ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। ম্যাগাজিনটার নামকরণ করা হয়- 'দা'ওয়াত'। আশাকরি, সেটা লিখিত আকারেও পাঠক সমাজে দা'ওয়াত বা সত্যের পথে আহ্বান ও অসত্যের পথরোধকল্পে জোরদার ভূমিকা পালন করবে।

ম্যাগাজিনটার প্রকাশনার দায়িত্ব নিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম। এটা পাঠক সমাজের উপকারে আসলে আমাদের এ উদ্যোগ সফল ও ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ্ কবূল করুন! আ-মী-ন।

ধন্যবাদান্তে -

(মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান)
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

তাফসীরুল ক্বোরআন

পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে

দা'ওয়াত-ই খায়র

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান*

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O

তরজমা: এবং তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া উচিৎ, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে। আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে। [সূরা আল-ই ইমরান: আয়াত-১০৪, কান্যুল ঈমান]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক

এ আয়াতের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে কয়েক প্রকারের সম্পর্ক বিদ্যমান- **প্রথমত,** পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে সাফল্যের দু'টি উসূল (মূলনীতি) বাতলে দেওয়া হয়েছে- ১. তাক্বওয়া (খোদাভীরুতা) ও 'তাহারাত' বা পবিত্রতা অবলম্বন করা এবং ২. আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা। এ আয়াতে সাফল্যের তৃতীয় উসূল বা মূলনীতি বলে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ইসলাম প্রচারে অংশগ্রহণ করা। **দ্বিতীয়ত,** পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে এক বিশেষ নি'মাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন- তাদের মধ্যেকার শত্রুতা খতম হয়ে যাওয়া এবং পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাওয়া। এখন সেটার শোক্রিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আর ওই নি'মাতের শোক্রিয়া হচ্ছে তোমরা অন্যান্য লোককেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদেরকেও ভাই ভাই করে দাও। শুধু তোমরা 'ইসলাম' দ্বারা উপকৃত হয়ে ক্ষান্ত হয়ো না, অন্য লোকদেরকেও তা পৌঁছিয়ে দাও। **তৃতীয়ত,** পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ করা হয়েছিলো যে, তোমরা দোযখের একেবারে কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিলে। আমি আমার মাহবূবের মাধ্যমে তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা

---

* **সাবেক উপাধ্যক্ষ-** গহিরা আলিয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম, **সাবেক মুহাদ্দিস-** ছোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম। **অনুবাদক-**কান্যুল ঈমান এবং খাযাইনুল ইরফান ও নূরুল ইরফান, মিরআত শরহে মিশকাত, বাহ্যাতুল আসরার ইত্যাদি। **মহাপরিচালক-** আনজুমান গবেষণা কেন্দ্র। আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

করেছি। এখন (এ আয়াতে) বলা হচ্ছে- তোমাদের মতো আরো অনেকে রয়েছে, যারা দোযখের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা দৌড়ে যাও, তাদেরকে রক্ষা করো, আল্লাহর সুন্নাত ও রসূলে করীমের সুন্নাত অনুসারে কাজ করো। অর্থাৎ পতন্মুখদেরকে রক্ষা করে নাও। **চতুর্থত,** পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছিলো- 'তোমরা হিদায়ত পেয়ে যাবে।' এখন হিদায়ত পাওয়ার তাফসীল (বিস্তারিত পদ্ধতি) বর্ণনা করা হচ্ছে। তা হচ্ছে- তোমরা দ্বীনের প্রচার করো, 'দাওয়াত-ই খায়র' (ভাল কাজের দিকে আহ্বান) করো, তোমরা হিদায়ত তথা সঠিক পথের দিশা পেয়ে যাবে। **পঞ্চমত,** পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতগুলো নাযিল করার একটা উদ্দেশ্য বলেছিলেন। তা হচ্ছে তোমাদের হিদায়ত (সঠিক পথের দিশা) পেয়ে যাওয়া। এখন ওই আয়াতগুলো নাযিল করার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে। আর তা হচ্ছে- সেগুলো অন্য লোকদেরকে নিকট পৌঁছানো। **ষষ্ঠত,** পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কিতাবী সম্প্রদায়ের দু'টি দোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছেঃ ১. তাদের নিজেদের পথভ্রষ্ট হওয়া এবং ২. অন্য লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করা। এখন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এরশাদ হচ্ছে- তোমরা তাদের বিরোধী হয়ে যাও! অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও হিদায়তের উপর থাকো, অন্য লোকদেরকেও হিদায়ত করো।

[আশরাফুত্ তাফাসীর: ৪র্থ খন্ড]

তাফসীর

এ আয়াত শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন- সৎকর্মের দাওয়াত দেওয়া, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে সাধ্যানুসারে বাধা দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা এ তিনটি কাজের বিনিময়ে উভয় জাহানের সাফল্যের ওয়াদা করেছেন।

এ আয়াত শরীফের দু'টি তাফসীর বা ব্যাখ্যা সবিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ

এক. হে মুসলমানগণ, তোমরা এমন দল হয়ে থাকো, অথবা বনে যাও, অথবা এমন দল হিসেবে সুদৃঢ় হয়ে থাকো, যারা সমস্ত বক্র প্রকৃতির লোকদেরকে ভাল কাজের দিকে দাওয়াত দেবে অর্থাৎ কাফিরদেরকে ঈমানের দিকে, ফাসিক্বদের (পাপাচারীগণ) তাক্বওয়া-পরহেযগারীর দিকে, অলস বা উদাসীনদেরকে জাগ্রত হবার দিকে, মূর্খদেরকে ইল্ম ও মা'রিফাত অর্জনের দিকে, শুষ্ক মেজাজের লোকদেরকে ইশক্বের তৃপ্তি লাভের দিকে, শয়নকারীদেরকে ঘুম থেকে জাগার দিকে আহ্বান করবে।

আর ভাল কথা, ভাল আক্বীদা ও উত্তম আমলের মৌখিকভাবে, কলম দিয়ে, উত্তম আমল দেখিয়ে, শক্তি প্রয়োগ করে, নম্রতা অবলম্বন করে এবং কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে লোকজনকে সৎপথে আনার চেষ্টা করবে।

পক্ষান্তরে, মন্দ কথা, মন্দ আক্বীদা, মন্দ কাজ ও মন্দ খেয়াল থেকে লোকজনকে মৌখিকভাবে, মন জয় করে, উত্তম কাজের উপমা দেখিয়ে, কলম দ্বারা লিখে এবং প্রয়োজনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে রুখবে।

বস্তুত: যে দলের মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ রয়েছে, তারাই পূর্ণাঙ্গভাবে সফলকাম। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই এ পন্থাগুলো অবলম্বন করলে অবশ্যই সফলকাম হবে।

এ আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করছে এ আয়াত শরীফও-

ক্বোরআনে করীমের অন্যত্র একই বিষয়ে এরশাদ হয়েছে-

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তরজমা: তোমরা হলে ওইসব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানবজাতির জন্য; (যেহেতু) প্রকৃত সৎ কাজের নির্দেশ তোমরাই দিচ্ছো আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখছো এবং আল্লাহর উপর (যথার্থ) ঈমান রাখছো।' [সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত ১১০, কান্যুল ঈমান]

দুই. আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে- হে মুসলমানগণ, তোমাদের সবাই না দুনিয়ার কাজে মশগূল হয়ে যাবে, দ্বীনের প্রচার কাজ ছেড়ে দেবে, না তোমাদের সবাই দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে দ্বীনের প্রচারকারী হয়ে যাবে; বরং তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া জরুরী, যারা জীবনভর 'দাওয়াত-ই খায়র' তথা দ্বীনের প্রচার-কাজ চালিয়ে যাবে, পূর্ণাঙ্গ আলিম হবে, নিজের জীবনের মাক্বসাদ বা লক্ষ্য এটাই স্থির করবে যে, লোকজনকে ভাল কাজের নির্দেশ দিতে থাকবে ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করতে থাকবে। বস্তুত: সমস্ত মুসলমানের মধ্যে এ মুবাল্লিগ আলিমদের জমা'আত বা দলই অত্যন্ত কামিয়াব বা সফলকাম। ফলে, তাদের দুনিয়ায়ও সম্মান হবে, আখিরাতেও তাঁরা মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদা পাবেন। এ মর্মার্থের পক্ষে তাফসীর হচ্ছে এ আয়াত শরীফ-

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ O

তরজমা: এবং মুসলমানদের থেকে এটাতো হতে পারে না যে, সবাই একসাথে বের হবে; সুতরাং কেন এমন হলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটা দল বের হতো, যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতো এবং ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতো, এ আশায় যে, তারা সতর্ক হবে? [সূরা তাওবা: আয়াত-১২২]

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর পূর্ণাঙ্গ আলিম হওয়া ফরয নয়; বরং তাদের মধ্য থেকে একটা জমা'আত বা দল আলিম হওয়াও জরুরী। যখন প্রত্যেক শহরে ডাক্তার, হাকিম, মিস্ত্রী, দোকানদার (ব্যবসায়ী) ইত্যাদি থাকা জরুরী, তখন প্রত্যেক শহরে ও এলাকায় আলিমও অবশ্যই থাকা চাই। ফলে, প্রথমোক্তদের মাধ্যমে পার্থিব চাহিদাদি পূরণ হবে, এ শেষোক্তদের দ্বারা দ্বীনী প্রয়োজনাদি পূরণ হবে। [আশ্‌রাফুত্ তাফাসীর: ৪র্থ খন্ড]

এ আয়াত শরীফ থেকে আরো যা প্রতীয়মান হয়-

এক. ইসলামে দ্বীনী বিষয়াদির প্রচার অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কারণ, অন্য সব ইবাদতের উপকারিতা নিজের জন্য হয়; কিন্তু 'দ্বীন প্রচারের' উপকারিতা অন্যরাও ভোগ করতে পারে। নিজের উপকারের চেয়ে পরোপকারিতা শ্রেয়তর। হযরত দুর্‌রাহ্ বিনতে আবূ লাহাব থেকে বর্ণিত, কেউ হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করলেন, "সর্বাধিক উত্তম বান্দা কে?" হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করলেন, "ভাল কাজের নির্দেশদাতা, মন্দ কার্যাদিতে বাধাদাতা, আল্লাহ্ তা'আলাকে যে ভয় করে এবং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।" হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি সৎকাজের নির্দেশ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়, সে আল্লাহ্ তা'আলারও খলীফা, তাঁর রসূলেরও খলীফা, তাঁর কিতাবেরও। যদি সব মুসলমান দ্বীনের প্রচার (দাওয়াত-ই খায়র) ছেড়ে দেয়, তবে তাদের উপর যালিম বাদশাহ্ (শাসক) চেপে বসবে, তাদের দো'আ কবূল হবে না।" [সূত্র. তাফসীর-ই রূহুল মা'আনী]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "হে লোকেরা, সৎ কাজের নির্দেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও? তাহলে তোমাদের জীবন উত্তমরূপে অতিবাহিত হবে।" হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "দ্বীনের প্রচার সর্বোত্তম জিহাদ।" [সূত্র. তাফসীর-ই কবীর]

দুই. দ্বীনের প্রচার যেমন সর্বোত্তম ইবাদত, দ্বীনের প্রচারকার্য ছেড়ে দেওয়াও নিকৃষ্টতম অপরাধ (গুনাহ্), এ বর্জনকারী লাঞ্ছিত-অপমানিত হবে। একথা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী শরীফ (আয়াতাংশ) هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ(তারাই সফলকাম) থেকে বুঝা যায়। কারণ, তাতে এ বিশেষ কৃতকার্যতাকে উক্ত কাজগুলো করেন এমন সব লোকের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। হযরত আলী মুরতাদ্বা বলেছেন, "যে ব্যক্তি ভাল কাজের নির্দেশ দেয় না, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে না, তাকে মাথা নিচের দিকে করে লটকানো হবে।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মুসলমানদের উদাহরণ একটি জাহাজের আরোহীদের মতো। যদি একজন আরোহী জাহাজের তলদেশের তক্তা উপড়ে ফেলে কিংবা ভেঙ্গে ফেলে, আর তখন অন্য আরোহীরা তার হাত ধরে না নেয়, তবে তো সবাই ডুবে মরবে।" হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, "যে ব্যক্তি আপনার সবার এবং সমস্ত প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রিয় হয়, সে দ্বীনের ব্যাপারে তেল মালিশকারী (শিথিলতা অবলম্বনকারী)ই। দ্বীনদারের পরিচয় হচ্ছে- তার প্রতি পরহেযগার-খোদাভীরুরা সন্তুষ্ট থাকেন। আর ফাসিক্ব, পাপাচারী এবং কাফির ও বে-দ্বীনরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে। [সূত্র. তাফসীর-ই কবীর]

সাহাবা-ই কেরামের আজ পর্যন্ত বে-দ্বীনরাই সমালোচনা করে। কেন? এ জন্য যে, তাঁরা ছিলেন اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ(কাফিরদের উপর কঠোর, তাঁদের তথা মুসলমানদের প্রতি দয়াপরবশ। ৪৮: ২৯)

তিন. এটাই সমীচিন হবে যে, দ্বীনের প্রচারণা প্রথমে নম্রতার সাথে করবে, তারপর কঠোরতার সাথে করবে। যেমন আয়াতের يَدْعُوْنَ (আহ্বান করে)-এর ব্যাপক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয়। মহান রব পরস্পর বিবাদে রত মুসলমানদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন-

.فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَافَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
...الاية

তরজমা: ...এবং যদি মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধ করে, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি করাও। অতঃপর যদি একে অপরের উপর সীমালংঘন করে, তবে ওই সীমালংঘনকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। [সূরা হুজুরাত: আয়াত-৯, কানযুল ঈমান]

অর্থাৎ প্রথমে উভয়ের মধ্যে সন্ধি করাতে চেষ্টা করো, যদি তাতে কাজ না হয়, তবে সীমালংঘনকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করো।

অবাধ্য স্ত্রীদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ. وَاضْرِبُوْهُنَّ ج ; তরজমা: যে সমস্ত স্ত্রীর অবাধ্যতা সম্পর্কে আশংকা হয়, তবে তাদেরকে বুঝাও, তাদের থেকে পৃথক হয়ে শয়ন করো এবং তাদেরকে প্রহার করো। [সূরা নিসা: আয়াত-২৪, কান্যুল ঈমান]

বুঝা গেলো যে, এমন স্ত্রীদের সংশোধন প্রথমে বয়কট করে করা হবে, যদি তাতে কাজ না হয়, তবে মৃদু শাস্তি দেওয়া হবে।

চার. দ্বীনের প্রচার সাধারণত প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্বে বর্তায়। যে মাসআলা কারো জানা থাকে, সে অন্য কাউকে, যার তা জানা নেই, বলে দেবে। যেমন مِنْكُمْ (তোমাদের থেকে) -এর প্রথম তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়।

পাঁচ. পূর্ণাঙ্গ মুবাল্লিগ (প্রচারক) হওয়া এবং নিজেকে এ কাজের জন্য ওয়াক্বফ (উৎসর্গ) করে দেওয়া 'ফরযে কেফায়া'; কেউ তা করলে সবাই দায়মুক্ত হতে পারবে। যেমন مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্য থেকে) -এর দ্বিতীয় তাফসীর থেকে বুঝা গেলো।

ছয়. দ্বীনের প্রচার কাজ নিজের সাধ্যানুসারে অপরিহার্য। এ কথা আতাংশ يَدْعُوْنَ (তারা আহ্বান করে)-এর ব্যাপকতা থেকে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং শক্তি প্রয়োগ করে দ্বীনের প্রচার করা, বাদশাহ্, শাসকবর্গ ও সমাজের নেতৃবর্গের দায়িত্বে বর্তায়; মৌখিকভাবে দ্বীনের প্রচারকার্য সম্পাদন করা আলিমদের দায়িত্বে বর্তায়; যখন তাঁরা এ সামর্থ্য রাখেন। আর যদি কোন বাধ্যবাধতা থাকে, তাহলে মনে মন্দ কাজগুলোর প্রতি ঘৃণাবোধ থাকা অপহিহার্য। এ ধরনের ঘৃণাবোধকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'দুর্বলতম ঈমান' বলেছেন।

সাত. কিছু সংখ্যক আলিম يَدْعُوْنَ (আহ্বান করবে)-এর ব্যাপক অর্থ দেখে বলেছেন, 'পাপাচারী, ফাসিক্বও দ্বীন-প্রসারের কাজ করবে, বা অংশ নেবে। কারণ, তারাও তো রসূলে করীমের উম্মত।' প্রত্যেকের উপর নিজের আমল যেমন বর্তায়, তেমনি অন্যকে দ্বীনের বিষয়াদি পৌঁছানোর কর্তব্যও তার উপর বর্তায়। এ দু'টি পৃথক পৃথক বিধান। একটা পালন করলে অন্যটা মাফ হয় না, বে-নামাযীর উপরও রোযা এবং হজ্ব ফরয। [তাফসীর-ই কবীর]

অবশ্য কেউ কেউ এর বিপরীত মতও অবলম্বন করে থাকেন। কারণ, ক্বোরআন-ই করীমে নিজে আমল না করে অপরকে নেক আমল করার জন্য নির্দেশ দেয়ার বিপক্ষে ধমকও দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন-

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ

তরজমা: আল্লাহর নিকট কেমন জঘন্য অপছন্দনীয় এ কথা যে, তা বলবে যা করবে না! [সূরা সফ্ফ, আয়াত-৩: কান্যুল ঈমান]

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ O

তরজমা: তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিচ্ছো এবং নিজেদের আত্মাগুলোকে ভুলে বসেছো? অথচ তোমরা কিতাব পড়ছো। তবুও কি তোমাদের বিবেক নেই? [সূরা বাক্বারা: আয়াত-৪৪, কান্যুল ঈমান]

এ শেষোক্ত অভিমত থেকে মুবাল্লিগগণও প্রথমে আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহ্ পাবেন।

আট. মন্দ কাজে বাধা দেওয়া নিঃশর্তভাবে ওয়াজিব। তবে ভাল ও পুণ্যময় কাজের নির্দেশ দেওয়া কখনো ওয়াজিব, কখনো সুন্নাত, কখনো মুস্তাহাব। যে পর্যায়ের নেক কাজ, নির্দেশ দেওয়ার বিধানও ওই পর্যায়ের। ফরয কাজগুলোর জন্য নির্দেশ দেওয়া ফরয, ওয়াজিবগুলোর নির্দেশ দেওয়া ওয়াজিব, মুস্তাহাব কাজগুলোর জন্য নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া মুস্তাহাব।

নয়. না-বালেগ ছোট শিশুদেরকেও ভাল কাজগুলোর হুকুম দেওয়া যাবে, মন্দ কাজগুলো থেকে বারণ করা যাবে, যাতে তারা বয়োপ্রাপ্ত হবার আগে নেক্কার হয়ে যায়। শিশুরা হচ্ছে গাছের তাজা ডালের ন্যায়; যেদিকে চাইবেন মোচড়াতে পারবেন। তারা বয়োপ্রাপ্ত হলে শুষ্ক বাঁশের মতো হয়ে যাবে। তখন সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে। এটাও يَدْعُوْنَ (তারা আহ্বান করবে)-এর ব্যাপক অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরের হয়, তখন তাদেরকে নামাযের নির্দেশ দাও, আর যখন দশ বছরের হবে, তখন তাদেরকে নামায না পড়লে শাস্তি দাও।

[আশরাফুত্ তাফাসীর (তাফসীর-ই নঈমী), খাযাইনুল ইরফান ইত্যাদি]

সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান বর্জন করলে দো'আ কবুল হয় না, আল্লাহর দান ও সাহায্য পাওয়া যায় না

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوْا فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ وَتَسْاَلُوْا اللهَ فَلاَ يُعْطِيْكُمْ وَتَسْتَنْصِرُوْهُ فَلاَ يُنْصُرُكُمْ

অর্থাৎ : তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং অসৎ কাজে বাধা দাও এর পূর্বে যে, তোমরা দো'আ করবে, অতঃপর তা কবুল করা হবে না, তোমরা আল্লাহর কাছে

চাইবে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দেবেন না, আর তোমরা তাঁর দরবারে সাহায্য চাইবে, অতঃপর তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন না।

হযরত বেলাল ইবনে সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন-

اِنَّ الْمَعْصِيَةَ اِذَا اُخْفِيَ لَمْ تَضُرَّ اِلاَّ صَاحِبَهَا وَاِذَا اُعْلِنَتْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ

অর্থাৎ: পাপকাজ যখন গোপনে করা হয় (গোপন থাকে) তখন তা শুধু পাপী লোকটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আর যখন প্রকাশ্যে করা হয়, (আর তাতে বাধা দেওয়া না হয়; বরং নিরবে সমর্থন করা হয়) তখন তা সাধারণভাবে (ব্যাপকহারে) ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে কারো তোয়াক্কা করতেন না, নির্ভিক ছিলেন

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ গিয়াস যাহিদ এক প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তি বোখারার কবরস্থানে বসবাস করতেন। একদিন তিনি তাঁর এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য শহরে প্রবেশ করলেন। তদানীন্তনকালে সেখানকার শাসক (আমীর) ছিলেন নযর ইবনে আহমদ। ঘটনাচক্রে ওইদিন আমীরের দরবারে এক আতিথ্যের অনুষ্ঠান ছিলো। হযরত আবূ গিয়াস দেখতে পেলেন- আমীরের দরবার থেকে গায়ক ও শিল্পীরা বাদ্যযন্ত্রসহকারে বের হচ্ছে। হযরত আবূ গিয়াস তখন নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, "ওহে, এখন তো তোমার সামনে এক চরম পরীক্ষা এসে পড়েছে। এখন তুমি যদি চুপ থাকো, তাহলে তুমিও তাদের এ অপকর্মে শরীক বলে বিবেচিত হবে।" তখন তিনি আসমানের দিকে মাথা উঠালেন আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সাহায্য চাইলেন। তারপর হাতে লাঠি নিলেন। আর তাদের সবার উপর চড়াও হয়ে তাদের তাড়া করতে লাগলেন। তারা সবাই ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে শাসক (আমীর)-এর দরবারের দিকে পালিয়ে গেলো। আর আমীরকে ঘটনা বর্ণনা করলো।

আমীর হযরত আবূ গিয়াসকে দরবারে ডেকে পাঠালো। তিনি হাযির হলেন। অতঃপর তাঁর উদ্দেশে আমীর বললো, "আপনি কি জানেন না যে, কেউ আমীরের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে তাকে জেল খানায় ভোর করতে হয়?" তদুত্তরে হযরত আবূ গিয়াস বললেন, "তুমি কি জানো না- যে ব্যক্তি 'রাহমান' পরম করুণাময়ের বিরোধিতায় বের হয়, তাকে 'নীরান' অর্থাৎ দোযখের আগুনে সন্ধ্যা করতে হয়?" তখন আমীর বললো, "আপনাকে মানুষের কাজের হিসাব নিতে কে নিয়োগ করেছেন?" তিনি বললেন, "যিনি তোমাকে 'আমীর' হিসেবে নিয়োগ

করেছেন, তিনিই আমাকে এ খিদমতে নিয়োজিত করেছেন।" তারপর আমীর বললো, "আমাকে তো খোদ্ খলীফা আমীর নিয়োগ করেছেন।" তদুত্তরে হযরত আবূ গিয়াস বললেন, "আমাকে খলীফার মহান রবই নিয়োগ করেছেন।" তখন আমীর বললো, "ঠিক আছে, আমি আপনাকে সমরকন্দের শাসক পদে নিয়োগ করলাম।" তখন হযরত আবূ গিয়াস বললেন, "আমি নিজেকে ওই পদ থেকে অপসারিত করলাম।" তখন আমীর বললো, "আপনার ব্যাপারটাই আজব ধরনের। আপনাকে যখন দায়িত্ব রাজ্যের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি, তখন আপনি প্রজাদের শাসন করছেন, আর যখন সরকারীভাবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তখন আপনি তা গ্রহণ করছেন না। এর কারণ কি?" তখন আবূ গিয়াস বললেন, "আমি তোমার নিয়োগকে প্রত্যাখ্যান করছি। কারণ, তোমার ইচ্ছা হলে তুমি আবার তোমার এ নিয়োগ প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু যখন আমার রব আমাকে এ কাজে নিয়োগ করেন, তখন আমাকে অন্য কেউ এ দায়িত্ব থেকে অপসারণ করতে পারবে না।"

তখন আমীর বললো, "তাহলে আপনি আমার নিকট আপনার যা দরকার চাইতে পারেন।" তদুত্তরে হযরত আবূ গিয়াস বললেন, "আমার যৌবনটা আমাকে ফিরিয়ে দাও!" আমীর বললো, "তাতো আমার ক্ষমতায় নেই। অন্য কিছু চান?" তখন তিনি বললেন, "তুমি দোযখের দারোগার নিকট একটি চিঠি লিখে দাও যেন তিনি আমাকে শাস্তি না দেন।" আমীর বললো, "তাও তো আমার ক্ষমতার আওতায় নেই। অন্য কিছু চান।" তিনি বললেন, "তাহলে বেহেশতের দারোগাকে একটা চিঠি লিখে দাও যেন তিনি আমাকে বেহেশতে প্রবেশাধিকার দেন।" আমীর বললো, "এটাও তো আমার ক্ষমতায় নেই। কারণ এসব ক'টি তো ওই মহান রবের কুদরতের হাতে, যিনি সব কিছুর মালিক। তিনি নিজে এবং তিনি যাঁকে এর ক্ষমতা প্রদান করেন তিনি তা সম্পন্ন করতে পারেন।" তখন হযরত আবূ গিয়াস বললেন, "আমি তোমার নিকট যা-ই চেয়েছি, তার কোনটাই তুমি দিতে পারলে না, অথচ আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যা-ই চেয়েছি, তিনি তার প্রত্যেকটি আমাকে দিয়েছেন এবং দিয়ে থাকেন।" তখন আমীর তাঁকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

সুতরাং বুঝা গেলো যে, সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে বাধা দান যত কঠিন কাজই হোক না কেন, তা নিষ্ঠার সাথে করতে গেলে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও এর উত্তম প্রতিদান পাওয়া নিশ্চিত। আর তা থেকে বিরত থাকলে সেটার

পরিণামও ভয়াবহ। তাই, আমাদের বর্তমান হুযূর ক্বেবলা রাহনুমা-ই শরীয়ত ও ত্বরীক্বত, আলমবর্দারে আহলে সুন্নাতের সদয় উপস্থিতিতে ও অনুমোদনক্রমে পীরে বাঙ্গাল, রওনক্বে আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লামা হুযূর-ই ক্বেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুল আলী 'গাউসিয়া কমিটি' ও সমস্ত পীর ভাই-বোনকে 'দা'ওয়াতে খায়র'-এর নির্দেশ দিয়েছেন এবং ক্বোরআন-সুন্নাহ্ সম্মত এ মহান কাজের প্রতি জোর তাকিদ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তা পালন করার আমাদেরকে তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

---o---

হাদীস-ই নবভী শরীফ

চারটি হাদীস সম্পর্কে বিভ্রান্তির নিরসন

মাওলানা কাযী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী •

আপত্তি

'জুমার খুতবায় জাল হাদিস বয়ান প্রসঙ্গে খতিবের কাছে খোলা চিঠি' শিরোনামে মুহাম্মদ ফজলুল করীম লিখিত বিগত ১৮ এপ্রিল, ২০১২ইং 'আমার দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এতে উক্ত লেখক বলেন-

গত ২৭ জানুয়ারী, ২০১২ইং বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা সালাহ উদ্দীন সাহেব জুমার খুতবাপূর্ব বয়ানে কয়েকটি হাদীস বয়ান করেছেন, যা *২৮ জানুয়ারী দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি আমার (খোলা চিঠি লেখক) দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমার অনুসন্ধান মতে খতীব সাহেব তাঁর বয়ানে কমপক্ষে ৪টি জাল হাদীস উল্লেখ করেছেন।*

তার উল্লিখিত হাদিসগুলোর-

প্রথমটি হচ্ছে- হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার বয়স কত? তিনি উত্তরে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না; তবে এ সম্পর্কে এতটুকু বলতে পারি, চতুর্থ আসমানে একটি সিতারা (নক্ষত্র) আছে, যা ৭০ হাজার বছর পরপর উদিত হয়, আমি এ যাবত ওই সিতারাটি ৭২ হাজার বার দেখেছি।" এটা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে জিব্রাঈল, শপথ মহান আল্লাহর, আমিই সেই সিতারা।"

দ্বিতীয়টি হচ্ছে- হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, আপনি আমাকে অবহিত করুন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাক কোন্ বস্তু

• **শায়খুল হাদীস-** সোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
সাধারণ সম্পাদক- আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.এ.সি.)।

সৃষ্টি করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, হে জাবির, আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম তাঁর নূর থেকে তার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।

তৃতীয়টি হচ্ছে- মারফু' সূত্রে হাদিস বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার কাছে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, "আল্লাহ্ পাক বলেছেন, আমি যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে বেহেশত সৃষ্টি করতাম না। যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে দোযখও সৃষ্টি করতাম না।"

চতুর্থটি হচ্ছে-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সৃষ্টি করার হাজার হাজার বছর আগে নবী ছিলেন, আল্লাহ পাকের নূর রূপে, তাঁর তাসবিহ পাঠ করতেন।" [আমার দেশ- পৃ. ৬, ক. ২ ও ৩]

(অতঃপর খোলা চিঠির লেখক বলেন)- *এ হাদিসগুলোর বিষয়ে আমাদের প্রথম কথা এ যে, আপনি এ ৪টি হাদিস দ্বারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মর্যাদার বিষয়ে যে কথাগুলো প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন ওইগুলোর সবই ঈমান ও আক্বিদার বিষয়। আর শরীয়তের বিধান হলো ঈমান ও আক্বিদার কোন বিষয় প্রমাণের জন্য সে ব্যাপারে এমন দলীল থাকা অপরিহার্য, যা হবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং এর বক্তব্য হবে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।*

অতএব, আক্বিদার কোনো মাসআলা প্রমাণের জন্য অবশ্যই ক্বোরআনের আয়াত কিংবা হাদিসে মুতাওয়াতের থাকা প্রয়োজন। আর বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত খবরে ওয়াহেদ নামক কোন হাদিস অকাট্য দলিল না হওয়ার কারণে (তথা দলিলে জন্নি হওয়ার কারণে) আক্বিদার ক্ষেত্রে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলো ১১টি শর্তে শুধু আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায়; অথচ আপনি (অর্থাৎ জাতীয় মসজিদের খতিব মহোদয়) রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে উল্লিখিত আক্বিদার মাসয়ালাগুলো সাব্যস্ত করার জন্য যে ৪টি হাদিস উল্লেখ করেছেন তার প্রথম যে হাদিসটি (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ আকাশে লাখ লাখ বছর তারকারূপে ছিলেন) সব হাদিস বিশারদের ঐক্যমতেই এ হাদিসটি জাল। এটি কোন হাদিসের কিতাবে নেই।

[আমার দেশ পৃ. ৬, ক.৩ ও ৪]

খন্ডন

প্রথম আপত্তির জবাব

আপত্তিকারী যে চারটি হাদীসের প্রসঙ্গে সেগুলো 'জাল' বলে আপত্তি উত্থাপনের ধৃষ্টতা দেখিয়েছে, সেগুলোর কোনটি যে জাল নয়, তা আমি নিম্নে প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছিঃ

প্রথম হাদীসটি যে জাল নয় বরং এর পক্ষে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

এক. হাদীসটি তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৩-এ বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ كَمْ عُمْرُكَ مِنَ السِّنِيْنَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَسْتُ اَعْلَمُ غَيْرَ اَنَّ فِى الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْمًا يَطْلَعُ فِىْ كُلِّ سَبْعِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً رَاَيْتُهُ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ اَلْفَ مَرَّةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا جِبْرِيْلُ وَعِزَّةِ رَبِّىْ اَنَا ذَالِكَ الْكَوْكَبُ

অর্থঃ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাইল আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার বয়স কত? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি এ সম্পর্কে কিছু জানি না; তবে এ সম্পর্কে এতটুকু বলতে পারি, চতুর্থ হিজাবে একটি সিতারা (তারকা) আছে, যা ৭০ হাজার বছর পরপর উদিত হয়, আমি এ যাবত ওই সিতারাটি ৭২ হাজার বার দেখেছি। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে জিব্রাঈল, শপথ মহান আল্লাহর, আমিই সেই সিতারা।"

দুই. সীরাত বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব 'ইনসানুল 'উয়ূন ফী সীরাতিল আমীনি ওয়াল মা'মূন' প্রকাশ সীরাতে হালাবিয়া: ৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَأَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ كَمْ عُمْرُكَ مِنَ السِّنِيْنَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَسْتُ اَعْلَمُ غَيْرَ اَنَّ فِى الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْمًا يَطْلَعُ فِىْ كُلِّ سَبْعِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً رَأَيْتُهُ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ اَلْفَ مَرَّةٍ فَقَالَ يَا جِبْرِيْلُ وَعِزَّةِ رَبِّىْ جَلَّ جَلَالُهُ اَنَا ذٰلِكَ الْكَوْكَبُ ـ

অর্থাৎ: হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইল আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার বয়স কত? তিনি বললেন, "আমি জানি না; তবে এতটুকু বলতে পারি যে, চতুর্থ হিজাবে একটি তারকা আছে, যা সত্তর হাজার বছর পরপর উদিত হয়। আমি এ যাবৎ তারকাটি বাহাত্তর হাজার বার দেখেছি।" তখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "আমার মহামহিম রবের শপথ, আমিই হলাম ওই তারকা।"

[সীরাতে হালাবিয়া-১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬, মাতবা'আহ্-এ মোস্তফা মুহাম্মদ, মাকতাবাতু তেজারিয়াতিল কুবরা, মোহাম্মদ আলী সড়ক, মিশর]

এ কিতাবের ভূমিকায় সংকলক আল্লামা আলী ইবনে বুরহান উদ্দীন আল হালাবী আশ্‌শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি (ওফাত ১০৪৪হি.) বলেন-

وَلَا يَخْفٰى اَنَّ السِّيَرَ تَجْمَعُ الصَّحِيْحَ وَالسَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْبَلَاغَ وَالْمُرْسَلَ وَالْمُنْقَطِعَ وَالْمُعْضَلَ دُوْنَ الْمَوْضُوْعِ

অর্থাৎ- সীরাত গ্রন্থসমূহে সহীহ্, সাক্বীম, দ্বা'ঈফ, বালাগ, মুরসাল, মুনক্বাতি' ও মু'দ্বাল হাদিসসমূহ সংকলন করা হয়; তবে 'মাউদ্বূ' বা জাল হাদীস নয়।"

[সীরাতে হালাবিয়াঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ২]

সুতরাং বুঝা গেলো যে,, তিনি তাঁর এ সীরাত গ্রন্থে কোন 'মাউদ্বূ' বা জাল হাদীস বর্ণনা করেননি। সুতরাং আর যাই হোক, অন্তত বর্ণিত হাদিসটি 'মাউদ্বূ' বা জাল হতে পারে না। অতঃপর পরবর্তী নির্ভরযোগ্য আলিমগণ বিশুদ্ধ সীরাত গ্রন্থসমূহের তালিকায়ও "সীরাতে হালাবিয়াকে" স্থান দিয়েছেন। যেমন-এক সময়ের হারাম শরীফের অন্যতম শিক্ষক মক্কা শরীফে শাফে'ঈ মাযহাবের অন্যতম মুফতী আল্লামা সাইয়্যেদ আহমদ (প্রকাশ দাহ্‌লান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ওফাত-১৩০৪হি.) বলেন-

اِنَّهٗ لَمَّا مَنَّ اللهُ تَعَالٰى عَلَىَّ بِقِرَاءَةِ الشِّفَا فِىْ حُقُوْقِ النَّبِىِّ الْمُصْطَفٰى ﷺ وَكَانَ ذٰلِكَ بِمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ فِى الْعَامِ الثَّامِنِ وَالسَّبْعِيْنَ بَعْدَ الْمِاءَتَيْنِ وَالْاَلْفِ يَسَّرَ اللهُ لِىْ مُطَالَعَةَ جُمْلَةٍ مِنْ شُرُوْحِ الشِّفَا مَعَ مُرَاجَعَةِ الْمَوَاهِبِ وَشَرْحِهَا لِلْعَلَّامَةِ الزُّرْقَانِىِّ وَمَعَ مُرَاجَعَةِ شَيْئٍ مِنْ كُتُبِ السِّيَرِ كَسِيْرَةِ اِبْنِ سَيِّدِ النَّاسِ وَسِيْرَةِ اِبْنِ هِشَامٍ وَالسِّيْرَةِ الشَّامِيَّةِ وَالسِّيْرَةِ الْحَلَبِيَّةِ وَهٰذِهِ الْكُتُبُ هِىَ اَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ فِىْ هٰذَا الشَّأْنِ

অর্থাৎ- যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করলেন, তখন আমি ১২৭৮ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় (ইমাম ক্বাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি রচিত) 'আশ্‌শেফা' ফী হুক্বুক্বিন্ নবিয়্যিল মোস্তফা'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ সহকারে পাঠ করি। সাথে সাথে 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' ও এর ইমাম যারক্বানী রচিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং অন্যান্য 'সীরাত গ্রন্থ', যেমন 'সীরাতে ইবনে সাইয়্যেদিন্নাস, 'সীরাতে ইবনে হিশাম', 'সীরাতে শামিয়া' ও 'সীরাতে হালাবিয়া' পাঠ করি। এ কিতাবগুলো হচ্ছে 'সীরাত' (জীবনী) বিষয়ে বিশুদ্ধতম কিতাবাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

[আস্‌সীরাতুন্ নবভিয়্যাহ্ ওয়াল আ-সারুল মুহাম্মাদিয়া-এর ভূমিকা-এটি সীরাতে হালাবিয়ার সাথে মুদ্রিত।]

এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'সীরাতে হালাবিয়া' একটি নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থ। এতেই 'খোলা চিঠি' লেখকের ভাষায় 'জাল হাদীস' হিসেবে চিহ্নিত প্রথম হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদিসকে কোন্ মুহাদ্দিস, কোন্ কিতাবে 'জাল হাদীস' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তার কোন রেফারেন্স উক্ত 'খোলা চিঠি'তে উল্লেখ নেই। এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়ে লেখকের নিকট কোন রেফারেন্স থাকলে তা তিনি পেশ করবেন। অন্যথায় তাকে জঘন্য অপবাদ রচনাকারী হিসেবে গণ্য করতে বাধ্য হবো। আমরা ইনশা-আল্লাহ্ এ হাদীসের পক্ষে আরো অকাট্য প্রমাণাদি পেশ করতে পারবো; কিন্তু বেচারা আপত্তিকারী যে তার দাবী প্রমাণ করতে পারবে না তা নিশ্চিত। এ ধরনের লোকেরা একদিকে তাদের নবী-বিদ্বেষ প্রকাশ করা, অন্যদিকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এমনটি করে থাকে।

দ্বিতীয় আপত্তির জবাব

আপত্তিকারী এ হাদীস শরীফকেও জাল বলার ধৃষ্ঠতা দেখালেন- 'হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন, আপনি আমাকে অবহিত করুন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্পাক কোন্ বস্তু সৃষ্টি করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, "হে জাবির, আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম তাঁর নূর থেকে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন।" বস্তুত: সর্বপ্রথম সৃষ্টি হলেন হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তিনি যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি এ বিষয়টি পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস শরীফ দ্বারা তো অকাট্যভাবে প্রমাণিত, অনুরূপ উম্মতের অধিকাংশ (প্রায়

সব) আলিমও এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এমনকি ওলামায়ে দেওবন্দও এ ব্যাপারে একমত। অতএব, আমরা এখানে প্রথমত প্রমাণ করছি যে, রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম সৃষ্টি। অতঃপর আমরা আলোচ্য হাদীসগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি-

প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَاشَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ

অর্থাৎ হে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!) আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার হজ্ব, আমার ক্বোরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। আর এটাই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি সর্বপ্রথম মুসলমান।

[সূরা আন্'আম: আয়াত-১৬৩, ১৬৪]

আলোচ্য আয়াতের শেষ বাক্য, যার অর্থ 'আমি সর্বপ্রথম মুসলমান' একটি গবেষণাযোগ্য বাক্য। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে বলছেন যে, 'মহান স্রষ্টা এ জগতসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টির কোন অংশীদারিত্ব বিহীন প্রতিপালক, তিনিই আমাকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, সৃষ্টিতে সবার আগে তাঁর সম্মুখে মস্তক অবনতকারী আমিই। অন্য কোন সৃষ্টি ছিল না, যা মাথা অবনত করতো এবং তাঁর রাবূবিয়াতকে মেনে নিতো।' দেখার বিষয় হলো এ সৃষ্টি জগতে কোন্ কোন্ সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলাকে সাজদা করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র ক্বোরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاٰصَالُهُمْ

অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে তাঁর আনুগত্য অবলম্বন করেছে। আর সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

[আলে ইমরান]

অপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

اِنْ كُلُّ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِی الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যারা অবস্থান করছে, তারা আল্লাহর নিকট বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে।

যেহেতু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম সাজদাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান স্থাপনকারী, সেহেতু প্রমাণিত হলো- তাঁর আগে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টি ছিল না। যদি কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকত, তাহলে সে-ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনত এবং আনুগত্য স্বীকার করত।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ হে প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম) আমি আপনাকে জগতসমূহের জন্য রহমত করেই প্রেরণ করেছি।

আলোচ্য আয়াতের প্রতি যদি গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়, তাহলে রহমতের বিভিন্ন পর্যায় দেখা যায়, যা জগত সৃষ্টি ও তার লালন-পালনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। কোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম রহমত হলো তাকে অস্তিত্ব দান করা। যেমনিভাবে অস্তিত্ব লাভ করা রহমত, তেমনিভাবে তার অস্তিত্ব টিকে থাকা এবং পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করাও রহমত। সকল রহমত যে কোন সৃষ্টির জীবনের ক্ষেত্রে পতিত হয়, ওইসব তার অস্তিত্ব হবার উপর সীমাবদ্ধ। যদি কোন সৃষ্টি অস্তিত্বই লাভ না করে, তাহলে তার প্রতি রহমতের প্রশ্নই আসে না। সুতরাং সর্বপ্রথম রহমত হলো কোন সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

অর্থাৎ 'নিশ্চয় মানুষের উপর এমন এক সময় অতীত হয়েছে, যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না।' [৭৬:১]

এ বিষয়টি স্মরণ করার জন্য পবিত্র ক্বোরআনে মানবজাতিকে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। যেসব আয়াত দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট করাই মূল উদ্দেশ্য যে, কোন সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম রহমত হলো- তাকে অস্থিত্ব দান করা, রহমতের সূচনাই তখন হয় যখন কোন কিছু অস্তিত্ব লাভ করে। আর হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে- "আপনাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত করে প্রেরণ করা হয়েছে।" বুঝা গেল যে, জগতের সবকিছুর অস্তিত্ব হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় হয়েছে। অতএব, যদি জগতসৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর রহমত শামিল

ছিল বলে মেনে নেয়া না হয়, তাহলে তিনি রাহমাতুল্লিল আলামীন কিভাবে হলেন? আর যদি জগতসৃষ্টির সূচনায় রহমত শামিল না হয়, তাহলে তাঁর 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়। এজন্যই তাঁকে বলা হয়েছে- 'হে প্রিয় নবী! আমি আপনাকে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক স্তরের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি।' এতে প্রমাণিত হলো যে, সৃষ্টিজগতের প্রত্যেক কিছু তার অস্তিত্বে টিকে থাকতে এবং পূর্ণতা অর্জনের প্রতিটি স্তরে ও ক্ষেত্রে রাহমাতুল্লিল আলামীন-এর মুখাপেক্ষী। আর অমোঘ বিধান হচ্ছে এ যে, محتاج (অর্থাৎ মুখাপেক্ষী) محتاج اليه (অর্থাৎ যার মুখাপেক্ষী)-এর পরেই অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন আমরা বেঁচে থাকার জন্য বাতাসের মুখাপেক্ষী।

অতএব, যদি বাতাস আগে থেকে না থাকত, তাহলে আমরা কখনো অস্তিত্ব লাভ করতে পারতাম না। কারণ, বাতাস ছাড়া জীবিত থাকার বিষয়টি কল্পনাই করা যায় না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে বাতাস সৃষ্টি করেছেন, তারপর আমাদেরকে জীবন দান করেছেন। একইভাবে পানির ক্ষেত্রেও বলা যায়। তেমনিভাবে সন্তানের অস্তিত্বের আগে মাতা-পিতার অস্তিত্ব থাকতে হবে।

যেহেতু সমগ্র সৃষ্টিজগত অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে রহমতের মুখাপেক্ষী, সেহেতু সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে পরে, আর সমগ্র জগতের রহমত নবী, যাঁর রহমতের মুখাপেক্ষী সমগ্র সৃষ্টিজগত, তাঁর সৃষ্টি সবার আগে।

তৃতীয়ত

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি স্পষ্ট, তিনি গুপ্ত, তিনি সব বিষয়ে অবহিত। [৫৭:৩]

ভারত উপমহাদেশের সর্বজনমান্য মুহাদ্দিস আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর প্রখ্যাত সীরাত গ্রন্থ "মাদারিজুন্নবুয়ত'-এর ভূমিকা এ আয়াত দিয়ে আরম্ভ করে বলেন-

ایں کلمات اعجاز سمات ہم مشتمل بر حمد و ثناء الٰہی ہست تعالیٰ و تقدس کہ در کتاب مجید خطبہ کبریائی

خود بداں خواندہ و ہم ... بر نعت و وصف حضرت رسالت پناہی ہست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وی سبحانہ

وادرا بداں تسمیہ و توصیف نمودہ و چندیں اسماء حسنیٰ الٰہی جل سلطانہ ہست کہ در وحی متلو و غیر متلو حبیب

خودرا بداں . . امیده وحلیه جمال وحلی کمال وی ساخته اگرچه وی ﷺ بتمامه اسماء وصفات الٰہی . اق ومتصف است باوجود آں به بعض ازاں . . صوص . . باه‌رد . . امور گشته است مثل نور، حق، علیم، حکیم، مؤمن، مهیمن، ولی، هادی، ف، رحیم، وجزآں وایں چهار اسم اول، آخر، ظاہر وباطن نیزازآں قبیل است -

অর্থাৎ ক্বোরআনে পাকের এ শব্দসমূহ যেমনিভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও প্রশংসা সম্বলিত, যা পবিত্র ক্বোরআনে তিনি তাঁর মহানত্বের বর্ণনায় এরশাদ করেছেন, তেমনিভাবে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা ও গুনগানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এ সকল শব্দ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার এ কতেক পবিত্র নাম, যা পবিত্র ক্বোরআনে এবং হাদীস শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীবকে এসব শব্দ দ্বারা নামকরণ করেছেন এবং তাঁকে এগুলো দ্বারা তাঁর অনন্য সৌন্দর্য ও পূর্ণতায় অলংকৃত করেছেন, যদিওবা তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) সকল নাম ও গুণাবলীর গুণে গুনান্বিত, এতদ্সত্ত্বেও বিশেষ কিছু গুণবাচক নামে তাঁকে বিশেষভাবে নামকরণ করেছেন। যেমন-নূর, হক্ব, আলীম, হাকীম, মু'মিন, মুহাইমিন, ওলী, হাদী, রঊফ, রহীম এগুলো ছাড়াও এ চার গুণবাচক নাম- আউয়াল, আখির, যাহির, বাতেন এসব নামও ওইসব নামের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

اما اول وی ﷺ اولست درایجاد که اول ما خلق الله نوری اونبوت که . . بیت . . . دبیا وآدم منجدل فی طینه . . . واول درعالم دربرور . . . اق الست بربکم قالوا بلی واول من آمن بالله وبذالک امرت وانا واول المؤمنین

অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম। কারণ, তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা হলো আমার নূর। তিনি নুবূয়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম। তিনি এরশাদ করেন, আমি নবী ছিলাম যখন আদমের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়নি। তিনি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের দিন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- 'আমি কি তোমাদের রব নই'- এর বেলায় সর্বপ্রথম 'হ্যাঁ' বলে উত্তরদাতা। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান স্থাপনকারী।

পবিত্র ক্বোরআনের এ তিনটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীয়ে আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম সৃষ্টি। ভারত-উপমহাদেশের প্রখ্যাত ও সর্বজনস্বীকৃত অন্যতম হাদিস বিশারদ হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দেসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর প্রখ্যাত সীরাতগ্রন্থ 'মাদারিজুন্নবুওয়াত' গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচ্য তিন আয়াতের দু'টি আয়াত যথাক্রমে- هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ কে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। তাঁর এ ব্যাখ্যাকে এদেশের বিজ্ঞ কোন আলেম খণ্ডন করেন নি; বরং তাঁর পেশকৃত বক্তব্যকে নিজেদের রচনাবলীতে সমর্থন করে অকুণ্ঠচিত্তে পেশ করেছেন অনেক ওলামা-ই কেরাম। এমনকি দেওবন্দী আলেমদের অন্যতম পেশোয়া মৌং রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের নিকট এতদ্সম্পর্কিত হাদীস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বরাত দিয়ে উত্তর দেন-

سوال : اول ما خلق الله نوری اور لولاک لما خلقت الافلاک یه دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا وضعی؟ زیداں کو وضعی بتلا . . . ہے فقط بینواتوجروا

অর্থাৎ মৌং গাঙ্গুহীর নিকট কেউ প্রশ্ন করেন যে, "সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, তা হলো- আমার নূর" এবং "আপনাকে সৃষ্টি না করলে আসমানসমূহ সৃষ্টি করতাম না" মর্মে বর্ণিত হাদিসগুলো বিশুদ্ধ, না কি জাল? যায়েদ এগুলোকে জাল বলছে।

এ প্রশ্নের উত্তরে মৌং গাঙ্গুহী বলেন-

جواب: یه حدیثیں کتب صحاح میں موجود نہیں۔ مگر شیخ عبد الحق رحمة الله علیه نے اول ما خلق الله نوری کو نقل کیا ہے اور بتایا که اس کی کچھ اصل ہے

অর্থাৎ "এ হাদিসগুলো সিহাহ্-এর কিতাবসমূহে নেই। কিন্তু শায়খ আব্দুল হক্ব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি "সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, তাহলো- আমার নূর"- হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর ভিত্তি আছে।"

[ফতোয়া-এ রশিদীয়া, পৃ. ৮১, প্রকাশক- মুহাম্মদ আলী, কারখানা-এ ইসলামী কুতুব। উর্দুবাজার, করাচী]

এতে প্রমাণিত হলো যে, আলোচ্য হাদীসটি হযরত আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর মত বড় মাপের হাদীস বেত্তা তাঁর লিখিত গ্রন্থে বর্ণনা করাই হাদিসটির ভিত্তি আছে বলে প্রমাণ বহন করে। তাই মৌং গাঙ্গুহী সাহেব উক্ত হাদীসকে 'জাল' বলে অভিহিতকারী যায়িদ-এর সাথে একমত হননি, অর্থাৎ তিনি হাদীসটিকে 'মাউদ্বূ' বা জাল বলেও অভিহিত করেননি। দেওবন্দী আলিমদের মধ্যে তিনি বড় মুহাদ্দিস ও তাদের বরেণ্য আলেম। তিনি হাদিসটির সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন এবং এর ভিত্তি আছে বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু মৌং গাঙ্গুহী সাহেবদের বর্তমান অনুসারীগণ কোন হাদীসকে 'জাল' বলতে চিন্তা-ভাবনা করেন না বলে প্রতীয়মান হয়।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র ক্বোরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম মুসলিম, অতএব, সর্বপ্রথম সৃষ্টি। তন্মধ্যে অকাট্যভাবে বর্ণিত- وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আমি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম। এবার আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বিজ্ঞ মুফাস্‌সিরগণের মতামত তুলে ধরছি, যাতে বিষয়টি আরো ভালভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। যথা-

এক. আল্লামা আ'লুসী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

وقيل هذا اشارة الى قوله عليه الصلوة والسلام اول ما خلق الله نورى

অর্থাৎ- আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি 'সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।' এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

[তাফসীরে রুহুল মা'আনী ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৪, আল মাকতাবাতুত্ তাওফীক্বিয়া, মিশর]

দুই. আল্লামা ইসমাঈল হক্বক্বি হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

(وانا اول المسلمين) يعنى اول من استلم عند الايجاد الامر "كن" وعند قبول فيض المحبة لقوله (يحبهم ويحبونه) والاستلام للمحبة فى قوله يحبونه دل عليه قوله عليه السلام اول ماخلق الله نورى

অর্থাৎ- আমি সর্বপ্রথম মুসলিম-এর অর্থ হলো- সর্বপ্রথম সৃষ্টি করার সময় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ 'কুন' (হয়ে যাও)- কে আমি সর্বপ্রথম মেনে নিয়েছি। অনুরূপ, মুহব্বতের ফয়য গ্রহণ করার সময় আমি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছি। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- তিনি তাঁদের মুহাব্বত করেন। আর তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলাকে মুহব্বত করেন। এ মুহব্বতের ফয়য গ্রহণের বেলায় নবী

করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথম, যা তাঁর উক্তি "আল্লাহ তা'আলা আমার নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন" প্রমাণ করছে।

[তাফসীরে রুহুল বয়ান- ৮ম খণ্ড, পৃ. ১২৯।]

তিন. আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা শওকানী বলেন-

قيل اول المسلمين اجمعين لانه وان كان متاخرا فى الرسالة فهو اولهم فى الخلق ومنه قوله تعالى (واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنک ومن نوح)

অর্থাৎ- হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকল মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম। কেননা তিনি রসূল হিসেবে পরে আবির্ভূত হলেও সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম। আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি "স্মরণ করুন! যখন আমি মজবুত ওয়াদা নিয়েছি নবীগণ থেকে, আপনার নিকট থেকে এবং নূহ আলায়হিস্ সালাম থেকে" এতে ওই কথাই বিবৃত হয়েছে।

[ফাতহুল ক্বদীর আলজামে' বায়না ফান্নায়র, রেওয়ায়াতি ওয়াদ্ দেরায়াতি মিন্ ইলমিতাফসীর, ২য় খণ্ড, পৃ.২৩৬, দরুল হাদীস, কায়রো, প্রকাশকাল ১৪২৩হি. ২০০২ সাল]

চার. আল্লামা সদরুল আফাযিল নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

اولیت یاتواس اعتبارسے ہے کہ انبیاء کا اسلام انکی امیت پر مقدم ہو، یا ہے یا اس اعتبار سے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق ہیں

অর্থাৎ- হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হয়তো এ হিসেবে প্রথম মুসলিম যে, নবীগণের ইসলাম উম্মতের ইসলামের আগেই হয়ে থাকে। অথবা এ হিসেবে যে, তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি।

[তাফসীরে খাযা-ইনুল ইরফান, সূরা আন্'আম, আয়াত নম্বর ১৬৪, পাদটীকা নম্বর ৩৪০, পৃ. ২১৭]

পাঁচ. হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

میں اللہ کے سارے مطیع بندوں میں پہلا مطیع ہوں حضرات انبیاء واولیاء ساری مخلوق نے مجھ سے اطاعت الٰہی سیکھی ہے میں نے کروروں سال جب اللہ کی اطاعت کی ہے جب کہ میرے نور کے سوا کوئی چیز نہ تھی نہ زمین وآسماں نہ سورج وچاند نہ فرشتے نہ جن وانس وغیرہ مسامدیں میں اول حقیقی حضور ﷺ باقی انبیاء واولیاء اور مؤمنین اضافی اول ہیں حقیقی اول اور اضافی اول میں بہت فرق ہو، یا ہے ہم اپنی اولاد اپنے بعض دوستوں بعض ماتحتوں شاگردوں مریدوں میں اول مطیع ہو سکتے ہیں مگر حقیقی پہلے عابد حضور ﷺ ہی ہیں۔

অর্থাৎ-আমি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দাদের মধ্যে প্রথম অনুগত। আম্বিয়া-ই কেরাম, আউলিয়া-ই এযাম এবং সকল সৃষ্টি আমার নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য শিখেছেন। আমি অনেক বছর যাবৎ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করেছি, যখন আমার নূর ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, না যমীন ছিল, না আসমান, না চন্দ্র ছিল, না সূর্য, না ফেরেশতা ছিল, না জিন- ইনসান ইত্যাদি। মুসলমানদের মধ্যে মৌলিক অর্থে সর্বপ্রথম হলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। অবশিষ্ট নবীগণ, আউলিয়া কেরাম এবং ঈমানদারগণ হলেন তুলনামূলক প্রথম। মৌলিক প্রথম ও তুলনামূলক বা আপেক্ষিক প্রথমের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমরা আমাদের সন্তান, কোন কোন বন্ধু, কোন অধস্তনের শিষ্যদের তুলনায় প্রথম অনুগত হতে পারি; কিন্তু প্রকৃত অর্থে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই প্রথম।

[তাফসীরে ন'ঈমী, ৮ম খণ্ড, পৃ.৩১০]

ছয়. আল্লামা পীর করম শাহ্ আযহারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

یا اولیت سے مراد اولیت حقیقیہ ہے کہ سب مخلوقات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا عرفاں ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کیونکہ ہر چیز سے پہلے حضور کے نور کی تخلیق ہوئی اور سب سے پہلے حضور نے ہی اپنے رب کی توحید کی شہادت دی قال قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کنت اول ... فی الخلق وآخرہم فی البعث انہ اول ... الخلق اجمع [قرطبی]

অর্থাৎ "আমি সর্ব প্রথম মুসলিম" বলতে প্রকৃত অর্থে প্রথমকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, সকল সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার তাওহিদের পূর্ণ পরিচয় প্রিয়নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অর্জিত হয়েছিল। কেননা, সকল সৃষ্টির আগে তাঁর নূর সৃষ্টি হয়েছে এবং সবার আগে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই স্বীয় রবের তাওহিদের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। হযরত ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমি নবীগণের মধ্যে প্রথম এবং প্রেরিত হবার ক্ষেত্রে তাঁদের সকলের সর্বশেষ। নিশ্চয় আমি সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি। [ক্বোরত্বুবী]

[তাফসীরে যিয়াউল ক্বোরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২০,
যিয়াউল ক্বোরআন পাবলিকেশন্স, গন্জে বখশ রোড, লাহোর]

সাত. আল্লামা শায়খ আহমদ সাভী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

ای المنقادین لله واستشکل بانه تقدم الانبیاء وامهم واجاب المفسرون بان الاولیة بالنسبة لامته واجیب ایضا بان الاولیة بالنسبة لعالم الذر فهی حقیقة

অর্থাৎ- আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম। তখন প্রশ্ন আসবে যে, তাঁর পূর্বে আম্বিয়া কেরাম ও তাঁদের উম্মতগণ অতীত হয়েছেন, তাহলে তিনি অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কিভাবে হলেন? এর উত্তরে তাফসীরকারকগণ বলেছেন- তিনি তাঁর উম্মতের তুলনায় সর্বপ্রথম। আর এভাবেও উত্তর দেয়া হয়েছে যে, 'রোযে আযল'-এ তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার রুবূবিয়াতকে মেনে নিয়েছেন। অতএব, এটা হবে প্রকৃত অর্থে প্রথম।

[হাশিয়াতুস্সাভী আলাল জালালাইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭]

আট. বর্তমান আরববিশ্বের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আলী সাবূনী বলেন-

اول من اقرّ واذعن وخضع الله عزوجل

অর্থাৎ- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্ তা'আলার রাবূবিয়াতকে সর্বপ্রথম স্বীকার করেছেন, দৃঢ়বিশ্বাস ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। [সাফ্ওয়াতুত্ তাফাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩২]

নয়. ওলামায়ে দেওবন্দ-এর তাফসীর, যেমন- আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী বলেন-

عموما مفسرین ... اول المسلمین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین ہیں لیکن جب جامع ترمذی کی حدیث "کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد" کے موافق آپ ... انبیاء ہیں تو اول المسلمین ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے

অর্থাৎ- সাধারণত তাফসীরকারকগণ 'আমি সর্বপ্রথম মুসলিম'-এর ব্যাখ্যা এভাবেই করে থাকেন যে, তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার তুলনায় সর্বপ্রথম মুসলিম; কিন্তু জামে' তিরমিযীর হাদীস "আমি তখন নবী ছিলাম, যখন আদম রূহ ও দেহের মাঝামাঝি অবস্থানে ছিলেন।" (অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি হয়নি) এর আলোকে যেহেতু তিনি সর্বপ্রথম নবী, অতএব, তিনি প্রকৃত অর্থে সর্বপ্রথম মুসলিম হওয়াতে কি সন্দেহ থাকতে পারে? (অর্থাৎ তিনি নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম মুসলিম।)

[তরজমায়ে ক্বোরআন কৃত. মৌং মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী, হাশিয়া বা পাদটিকা, মৌং শাব্বির আহমদ ওসমানী। পাদটিকা নম্বর-২, পৃ. ১৯৪, মদীনা প্রেস-বিজনুর, ইউ,পি, ইন্ডিয়া থেকে মুদ্রিত]

দশ. মাওলানা মুফতি শফি সাহেব (পাকিস্তান) বলেন-

اور پہلا مسلماں ہونے سے اس طرف بھي اشارہ ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے رسول کریم ﷺ کا نور مبارک پیدا کیا گیا ہے اس کے بعد تمام آسماں ورمین اور مخلوقات وجود میں آئے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے اول ما خلق اللہ نوری (روح المعانی)

অর্থাৎ- প্রথম মুসলমান বলতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হতে পারে যে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুর মুবারক সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর সকল আসমান-যমীন এবং সকল সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। [রুহুল মা'আনী]

[মা'আরিফুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১০, ইদারাতুল মা'আরিফ, করাচী-১৪]

এখানে দশটি তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। যার সবগুলোতে আয়াতে ক্বোরআন وانا اول المسلمين অর্থাৎ 'আমি মুসলমানদের সর্বপ্রথম' এর তাফসীরে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম সৃষ্টি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ নূর মুবারক সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন। এরপর আসমান, যমীন, জ্বিন, ইনসান ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। আলোচ্য আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম, উম্মতের তুলনায় নবীর ইসলাম বা মুসলমান হওয়া আগে। সে হিসেবে তিনি প্রথম মুসলমান। দ্বিতীয়ত, তিনিই সৃষ্টির সর্বপ্রথম বিধায় তিনিই প্রথম মুসলমান। অতঃপর তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি হবার পক্ষে হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ওই হাদীসও রয়েছে, যাকে ইদানিং 'মাওদ্বূ' বা জাল বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আর তাহলো اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِىْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব প্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। এখানে যেসব তাফসীরকারের নাম এসেছে তাঁদের মধ্যে দেওবন্দী আলেমগণের শীর্ষস্থানীয় হিসেবে পরিচিত, যেমন- মৌং শাব্বির আহমদ ওছমানী ও মুফতী শফি সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আলেম মুহাম্মদ আলী ইবনে মুহাম্মদ শওকানী। (জন্ম ১১৭৩হি. মৃত্যু-১২৫০হি. মোতাবেক ১৭৬৯-১৮৩৪ ইং)-এর নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি তাঁর তাফসীরগ্রন্থে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যে বিষয়টি পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত

দ্বারা প্রমাণিত, সে বিষয়ে কোন ঈমানদার মাত্রই অস্বীকার তো দূরে থাক, ন্যূনতম সন্দেহও পোষণ করতে পারে না।

ইতোপূর্বে বরেণ্য ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরকারদের মতামতের আলোকে "প্রিয়নবী হুযূর পূরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র 'নূর' যে প্রথম সৃষ্টি, তিনিই যে, আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি এ বিষয়টি পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতের অংশ وانا اول المسلمين অর্থাৎ 'আমি সর্ব প্রথম মুসলমান'-এর ব্যাখ্যা পাঠক সমীপে পেশ করা হয়েছে। এতে দেওবন্দী ও আহলে হাদীস বা সালাফীদের নির্ভরযোগ্য আলেমদের মতামতও হুবহু পেশ করা হয়েছে। এবার ধারাবাহিকভাবে অবশিষ্ট ৩টি হাদীস কোন্ কোন্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তা পাঠক সমীপে পেশ করা হচ্ছে, যাতে বিভ্রান্তির ভালভাবে নিরসন হয়। অতঃপর 'দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকায় আলোচ্য চারটি হাদীস সম্পর্কে 'খোলা চিঠি' দাতার বক্তব্যের উপর আলোচনা আসবে।

দ্বিতীয় হাদিস- হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন, আপনি আমাকে অবহিত করুন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্পাক কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "হে জাবির, আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম তাঁর নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।"

আলোচ্য হাদিসটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তাই যথাসম্ভব এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। আশা করি আপনারা গভীর মনযোগ ও একান্ত আগ্রহচিত্তে পাঠ করবেন-

প্রথমত, আলোচ্য হাদিসটি অনেক বিশ্ববরেণ্য হাদীসবিদ ও নির্ভরযোগ্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেক বিশ্ববরেণ্য হাদীসের ইমাম, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির দাদা, হাফেযুল হাদীস ইমাম আবু বকর আবদুর রায্যাক ইবনে হুম্মাম ইবনে নাফে' আল হিম্ইয়ারী আস্সান্'আনী আল ইয়ামনী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সংকলিত নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ "আল মুসান্নাফ"-এর বরাত দিয়েই বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের বর্ণনা পেশ করা হলো-

বুখারী শরীফের অন্যতম ব্যাখ্যাকারী ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর আলখতীব আল ক্বাস্তলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করেন-

رَوٰى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهٖ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَاجَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرَ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذَالِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَاقَلَمٌ وَلَاجَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَامَلَكٌ وَلَاسَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَاجِنٌّ وَلَا اِنْسٌ فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَمَ ذَالِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِىْ اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْ جُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِى الْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِىَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمٰوَاتِ وَمِنَ الثَّانِى الْاَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ نُوْرَ اَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمِنَ الثَّانِىْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِىَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ اِنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ: ইমাম আব্দুর রায্যাক্ব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর সনদ সূত্রে হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন, আপনি আমাকে অবহিত করুন- আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বে সর্বপ্রথম কোন্ জিনিস সৃষ্টি করেছেন। উত্তরে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- "হে জাবির! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর আগে তোমার নবীর নূরকে তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ওই নূর আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুসারে তাঁর শক্তিতে ঘুরতে থাকলো। তখন লওহ, কলম, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, জিন ও ইনসান কিছুই ছিলো না। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা অপরাপর মাখলুখ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন ওই নূরকে চার ভাগে ভাগ করলেন- তারপর প্রথম অংশ থেকে 'ক্বলম' (তাক্বদীর লিখার কলম), দ্বিতীয় অংশ থেকে 'লওহ', তৃতীয় অংশ থেকে 'আরশ' সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ অংশকে চার ভাগে বিভক্ত করলেন। এর প্রথম অংশ থেকে আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ, দ্বিতীয় অংশ থেকে 'কুরসী' ও তৃতীয় অংশ থেকে অবশিষ্ট ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর চতুর্থ অংশকে চার ভাগে ভাগ

করলেন, এর প্রথম অংশ থেকে আসমানসমূহ, দ্বিতীয় অংশ থেকে যমীনসমূহ, তৃতীয় অংশ থেকে জান্নাত-দোযখ সৃষ্টি করলেন। তৎপর চতুর্থ অংশকে চারভাগে ভাগ করলেন। এর প্রথম অংশ থেকে ঈমানদারগণের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয় অংশ থেকে তাদের ক্বলবের নূর অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয়, তৃতীয় অংশ থেকে তাদের আত্মার জ্যোতি আর তা হলো তাওহীদের বাণী- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ।"[মাওহিবে লাদুনিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ.-৯, দারুল বায, প্রকাশনা, মক্কা মুকার্‌রমা]

উল্লেখ্য, এখানে সর্বশেষ চতুর্থ অংশের বর্ণনা নেই। তার একাধিক কারণ থাকতে পারেঃ প্রথমত, পাণ্ডুলিপির তারতম্যের কারণে, যা হাদীস বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ওলামা কেরাম ভালভাবেই অবহিত আছেন। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেন। হতে পারে এখানেও এ ধরনের কোন কারণে চতুর্থ অংশের বর্ণনা আলোচিত হয়নি। আবার অনেক সময় পাণ্ডুলিপি যিনি তৈরি করেন তাঁর ভুলের কারণে কোন অংশ বাদ পড়ে যায়, যা অন্য পাণ্ডুলিপি থেকে শুদ্ধ করে নেয়ার সুযোগ থাকে। কারণ, একটি গ্রন্থের একাধিক পাণ্ডুলিপি থাকতে পারে। কেননা- সংকলক থেকে তাঁর একাধিক শীষ্য কপি করে থাকেন।

উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য নিম্নরূপঃ

প্রথমত, 'সীরাতে হালাবিয়া' ৩৬ পৃষ্ঠায় হাদীসটির শেষে رواه البخارى (অর্থাৎ হাদীসটি ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন) এমন একটি মন্তব্য বিদ্যমান। অতঃপর নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর বিশ্বখ্যাত ও সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'বোখারী শরীফ' সংকলন করেননি; কিন্তু তিনি তো আরো অনেক গ্রন্থ রচনা বা সংকলন করেছেন। এসবের কোন একটিতে হাদীসটি বিদ্যমান থাকার কথাই বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত 'তাফসীরে ফউযুল আযীয'-এর ৬৫৭ পৃষ্ঠা, উক্ত হাদীসটির সূত্র প্রসঙ্গে রয়েছে رواه البخارى فى تاريخه অর্থাৎ হযরত ইমাম বোখারী তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'তারীখে বোখারী'তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য হাদীসটি ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর কোন গ্রন্থে পাওয়াটাই যথেষ্ট।

তৃতীয়ত, النجم বা তারকা আকৃতিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থানের সাথে পবিত্র ক্বোরআনে পাকের সূরা 'ওয়ান্নাজম'-এর মধ্যে মজবুত যোগসূত্র পাওয়া যায়। কারণ, অনেক তাফসীরকার উক্ত সূরায়

'আন্‌নাজম' বলতে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝিয়েছেন। যথা-

হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- النجم انه محمد صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ সূরায়ে ওয়ান্ নাজ্‌মে 'নাজ্‌ম' বা তারকা বলতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে রুহুল মা'আনী, পারা-২৭, পৃ.৪৫), কৃত. আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আ'লূসী বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (ওফাত ১২৭৪হি.), তাফসীরে মাযহারী ৯ম খণ্ড, পৃ. ১০৩, কৃত. আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী রাহমাতুল্লাহি, আলায়হি। ওফাত-১২২৫হি.' 'কিতাবুল মুফরাদাত ফী গারা-ইবিল ক্বোরআন' কৃত, ইমাম হোসাইন ইবনে রাগেব ইসফাহানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, ওফাত ৫০২হিজরী। অনুরূপ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'তাফসীরে কবীরে', ইমাম খাযেন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ওফাত ৭২৫ হিজরী, 'তাফসীরে সা'ভী ৪র্থ খণ্ড, ১২৯ পৃ., কৃত. আল্লামা শায়খ আহমদ সাভী মালেকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম রোযবাহান বকলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, 'তাফসীরে আরা-ইসুল বয়ানে' আলোচ্য আয়াতে 'আন্‌নাজ্‌ম' বলতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝিয়েছেন। বিশ্ববরেণ্য তাফসীরকারকগণের তাফসীর ও আলোচ্য হাদীসটির মধ্যে মজবুত যোগসূত্র পাওয়া যায়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম আক্বিদা ও বিশ্বাস- আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্পষ্টত ভিত্তি হলো প্রখ্যাত নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থ 'মুসান্নাফে আবদির রায্‌যাক্ব'-এর হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। আলোচ্য হাদীসটি পূর্ববর্তী নির্ভরযোগ্য ইমামগণ নিজেদের লিখিত কিতাবাদিতে 'মুসান্নাফ-এ আবদির রায্‌যাক্ব'-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে এক শ্রেণীর লোক থেকে এমন একটি আওয়াজ উঠল যে, আলোচ্য হাদীসটি উক্ত হাদিস গ্রন্থে নেই। বিষয়টি সুন্নী ওলামা কেরামের নিকট কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। কারণ, ইতোপূর্বে লিখিত প্রায় সব সীরাত গ্রন্থে হাদীসটি 'মুসান্নাফ-এ আবদির রায্‌যাক্ব'-এর বরাতে বর্ণিত হয়ে আসছে। সুতরাং এটা কোনভাবেই ভিত্তিহীন হতে পারে না। এর কয়েকটি রেফারেন্সে ওহাবী-দেওবন্দীদের সর্বজন স্বীকৃত আলেম আশরাফ

আলী থানভী সাহেবের 'নাশ্‌রুত্বত্বীব' রয়েছে। হাদিসটি 'মুসান্নাফ-এ আবদির রায্‌যাক' গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে না মর্মে প্রকাশিত খবর সুন্নী ওলামা-ই কেরামকে সেটার পুনঃ অন্বেষণে নামতে বাধ্য করল। তন্মধ্যে দুবাই 'আওক্বাফ'-এর সাবেক পরিচালক ড. আল্লামা ঈসা মানে' হিমইয়ারী (মু.যি.আ.)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতঃপর পাকিস্তানের বরেণ্য আলেম আল্লামা আবদুল হাকীম শরফ ক্বাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হিও একই সাথে নেমে পড়েন সেটার অন্বেষণে। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করা জরুরী।

তিনি বলেন, ''মুসান্নাফে আবদির রায্‌যাক্ব'' ১৯৭০ সনে বৈরুতে মুদ্রিত হয়। এটি পুনঃযাচাই করেছেন একজন দেওবন্দী আলেম-হাবীবুর রহমান আ'যমী। ১৯৭৫ সনের দিকে কূছা-ই গাউসিয়া, নাওয়া বাজার, লাহোর-এর লাইব্রেরীর মালিক উক্ত মুদ্রিত 'মুসান্নাফ-এ আবদির রায্‌যাক' সংগ্রহ করে আনেন। কিতাব আসার আগেই ওই মালিক এ কথা বলতে শুরু করল, সুন্নীরা 'হাদীসে নূর'-এর ক্ষেত্রে 'মুসান্নাফ-এ আবদির রায্‌যাক্ব'-এর বরাত দিয়ে থাকেন। এখন তা কি সত্য না মিথ্যা প্রমাণিত হবে।'' অতঃপর একটি শ্রেণী লেখনী ও বক্তব্যে এর ভিত্তিতে বেশ তোড়জোড় শুরু করল যে, 'এ হাদীসের 'সনদ' বা বর্ণনা সূত্র কি? এর রেফারেন্স কোথায়?' ফলে এর 'রেফারেন্স' অন্বেষণে আমি (আল্লামা আবদুল হাকীম শরফ কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি)ও তৎপর হই। কেননা, আলোচ্য হাদীসটি হাদীসের সম্মানিত ইমামগণ বর্ণনা এবং গ্রহণ করেছেন। এটা ভাবাও অপরাধ হবে যে, তাঁরা মিথ্যে বলেছেন। অতঃপর বৈরুত থেকে মুদ্রিত যে কিতাব (মুসান্নাফে আবদির রায্‌যাক্ব) এসেছে-সেটা পরিপূর্ণ ছিল না, বরং অসম্পূর্ণ, যা স্বয়ং নিরীক্ষক (মৌং হাবীবুর রহমান আ'যমী)ও স্বীকার করেছেন। ফলে আমি বিভিন্ন বিজ্ঞ আলিমের নিকট সরাসরি এবং কারো কারো নিকট পত্রযোগে আবেদন করেছি যেন উক্ত কিতাবের কোন হস্তলিখিত পাণ্ডলিপির সন্ধান দেন যাতে উক্ত 'হাদীসে নূর' বিদ্যমান। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। একবার আমি (আল্লামা আবদুল হাকীম শরফ কাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ইসলামাবাদে গেলাম। সেখানে 'এদারা-এ তাহক্বীক্বাতে ইসলামী'-এর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'মুসান্নাফ-এ আবদির রায্‌যাক্ব'-এর ফটোকপি ছিল। তা দেখলাম, কিন্তু হাদীসটি তাতেও পাওয়া গেল না।

অতঃপর আমি বিভিন্ন দেশে আমার পরিচিত নিম্নবর্ণিত জ্ঞানীজনদের নিকট পত্র লিখলামঃ ড. কমরুন্নেসা, হায়দারাবাদ, ভারত, ড. আবদুস সত্তার, শিকাগো, আমেরিকা, শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ আলাহুত, বৈরুত, মিশর 'জামেউল আযহারে'

অধ্যয়নরত ড. আবদুল ওয়াহেদ এবং ড. মুমতায আহমদ সাদীদী আযহারী পত্রে আমি তাঁকে লিখলাম, আপনি মিশর 'দারুল কুতুব' কায়রো থেকে জেনে নিন। কিন্তু কোন স্থান থেকে সন্তোষজনক অর্থাৎ হ্যাঁ সূচক উত্তর পেলাম না। তৎপর আন্তর্জাতিক ইসলাম প্রচারক পীরে তরীক্বত সৈয়দ ইয়ূসুফ সৈয়দ হাশেম রেফা'ঈ (মু. যি.আ.) (যিনি ইতোপূর্বে আমাদের বাংলাদেশে এমনকি চট্টগ্রামে একাধিকবার তাশরীফ এনেছেন)-এর সাথে এক সাক্ষাতে আরয করলাম, আমি শুনেছি-ইয়েমেনের রাজধানী সানাতে এক ব্যক্তির নিকট ইমাম আবদুর রায্যাক্ব রাহমাতুল্লাহি আলায়হির হস্তলিখিত কপি আছে। আপনি একটু তাঁর নিকট জেনে নিন। তদুত্তরে তিনি বললেন, ওই লোক তো ওটা কাউকে দেখাননি। 'খানিওয়াল'-এর এক হেকিম সাহেব বললেন, আমি বাগদাদ শরীফ থেকে উক্ত হাদীসের ফটোকপি এনেছি। কিন্তু বারবার চেয়েও ওই হেকিম সাহেবের ফটোকপি দেখার সুযোগ হলো না। অবশেষে ওই ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন। অপর এক জ্ঞানী ব্যক্তি বললেন, ''মুসান্নাফ-ই আবদির রায্যাক্ব'-এর হস্তলিখিত কপি মদীনা ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারে আছে এবং তাতে 'হাদীসে নূর'ও বিদ্যমান। আমি এর ফটোকপি এনেছি। কিন্তু, কোথায় রেখেছি তা স্মরণ নেই।'' কিছুদিন পর জানতে পারলাম ওই ব্যক্তি 'ওমরাহ'-এর উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যাচ্ছেন। আমি তাঁকে বললাম- যেন 'হাদীসে নূর'-এর ফটোকপি আনতে না ভুলেন। তিনি ওমরাহ্ করে ফিরে এলে আমি তাঁকে ফোন করলাম। সংযোগ পেতেই কোন ভূমিকা ছাড়াই জিজ্ঞেস করলাম উক্ত হাদীস শরীফের ফটোকপি এনেছেন কিনা। ওই ব্যক্তি বললেন, ''যেদিন আমি মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হই, ওই দিন ইউনিভার্সিটি বন্ধ ছিল। পরদিন আমার চলে আসার সময়, কাজেই আনতে পারিনি।''

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার অপার অনুগ্রহে ১৯৯৪ সনে হারামাঈনে শরীফাঈন যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। আমি মদীনা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী পরিচালকের সাথে সাক্ষাত করে 'মুসান্নাফ'-এর হস্তলিখিত কপি দেখার আগ্রহ প্রকাশ করি। তিনি জানতে চাইলেন- কেন দেখতে চাচ্ছি। আমি বললাম, 'মুসান্নাফ'-এর মুদ্রিত কপিগুলো অসম্পূর্ণ। আমি দেখতে চাই যে, এখানকার হস্তলিখিত কপিটা সম্পূর্ণ কিনা। তখন তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট এ বিষয়টি জানতে চাইলে উক্ত কর্মকর্তা বললেন, ''আমাদের নিকট 'মুসান্নাফ'-এর কোন হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিই নেই।'' তারপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারার মুহাদ্দিস শায়খ হাম্মাদ আনসারীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, পাকিস্তানের কিছু লোক 'মুসান্নাফ'-এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি দেখতে চান, আমাদের গ্রন্থাগারে কি ওটা আছে? ওই মুহাদ্দিস সাহেব বললেন, ''নেই।''

আলোচ্য হাদীসটি হাতে পেতে আমার (আল্লামা আবদুল হাকীম শরফ কাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) এটার প্রতি আগ্রহের বিষয় পাঠক নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে। না জানি এমনিভাবে আরো কতো নবীপ্রেমিক 'হাদীসে নূর'-এর জন্য অস্থির। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর 'হাদীস শরীফটি' হস্তগত হলে কি পরিমাণ আনন্দ অনুভূত হতে পারে, তাও অনুমান করা যায়। যে বস্তুটির অন্বেষণ যতো কঠিন ও দীর্ঘ হবে, তা অর্জনে আনন্দও হবে সীমাহীন।

জনাব সৈয়দ মুহাম্মদ আরেফ মাহজূব রেজভী গুজরাট 'মুসান্নাফ'-এর হারিয়ে যাওয়া 'দশ অধ্যায়' হস্তগত হবার তারিখকে আবজাদের সংখ্যা হিসেবে 'মাখযানে হাদিসে জাবের' বের করেছেন। যার সংখ্যা দাঁড়ায়- ১৪২৫। অর্থাৎ অবশেষে ১৪২৫ হিজরী সনে আলোচ্য হাদীসটি হস্তগত হয়। এ পাওয়ার আনন্দে সৈয়দ মুহাম্মদ আরেফ মাহজূব, যার অনুবাদ হচ্ছে দু'টি শে'র লিখেছেন, যে দু'টি অর্থ হয় নিম্নরূপঃ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'নূর' হওয়ার বিষয়ে অস্বীকারকারীগণ লজ্জিত হয়েছে। কারণ, 'হাদীসে নূর' এর ভিত্তি পাওয়া গেছে।

২. ঈমানদারগণের আনন্দ দেখার মতো 'মাহজুব'-এর আনন্দে আত্মহারা হবার বিষয় জিজ্ঞেস করোনা। [মাসিক রযায়ে মোস্তফা, সংখ্যা জানুয়ারী, ২০০৬, পৃ.৯]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির পীর-পরিবার, মারহারা শরীফ-এর সাজ্জাদানশীন হযরত মাওলানা সৈয়দ আমীন মিঞা (মু.যি.আ.) ও মুজাহিদে ইসলাম হাজী মুহাম্মদ রফিক বরকাতী (মু.যি.আ.)-এর অনন্য প্রচেষ্টা 'মুসান্নাফ'-এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি হাতে আসার ক্ষেত্রে সত্যিই অশেষ মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতার যোগ্য।

দুবাই, 'আওকাফ'-এর সাবেক ডাইরেক্টর ড. ঈসা মানে' (মু.যি.আ.) কর্তৃক 'মুসান্নাফ'-এর হারিয়ে যাওয়া দশ অধ্যায় এর উপর লিখিত ভূমিকা ও জ্ঞানসমৃদ্ধ পাদটিকা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। 'মুসান্নাফ'-এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আফগানিস্তানের এক কিতাব ব্যবসায়ীর নিকট থেকে হস্তগত হয়েছে। এটা ৯৩৩হিজরিতে শায়খ ইসহাক্ব ইবনে আবদির রহমান সালমানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বাগদাদ শরীফে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ড. আল্লামা ঈসা মানে' (মু.যি.আ.)-এর লিখিত ভূমিকা ও পাদটীকা সহকারে এটা সর্বপ্রথম বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। অতঃপর 'মুজারুসসাতুশ্‌শরফ', লাহোর-এর প্রকাশনার সৌভাগ্য লাভ করে। তারপর এর উর্দু অনুবাদ, প্রকাশিত হয় উর্দুভাষীদের সুবিধার্থে।

এর উর্দু অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী উর্দুভাষায় ভাষান্তর করেন হযরত আল্লামা আবদুল হাকীম শরফ ক্বাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, পাকিস্তান। তিনি বলেন, আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ খান ক্বাদেরী বৈরুতে প্রকাশিত কপি আমাকে

যোগাড় করে দেন। ড. মুমতায আহমদ সাদিদী আযহারী অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, দি ইউনিভার্সিটি অফ ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান এবং আমার প্রিয় হাফেয নেছার আহমদ ক্বাদেরী দিনরাত পরিশ্রম করে এ অমূল্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ পুণ্যময় কাজে অংশগ্রহণকারী সকল সম্মানিত ব্যক্তি ও বন্ধুদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আ-মী-ন।

পাকিস্তানের সুন্নী ওলামা কেরাম আলোচ্য 'হাদীসে নূর' প্রাপ্তির শোকরিয়া ও আনন্দ প্রকাশের নিমিত্তে 'হাদীসে নূর কনফারেন্স (১৫ জানুয়ারী), ২০০৬ রোববার' শিরোনামে বিশাল আয়োজন করেন লাহোরে।

ক্বোরআন পাক ও হাদীস শরীফ-এর অসংখ্য বাণী সম্বলিত অনেক অমূল্যগ্রন্থ পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যাঁরা পরবর্তীদের জন্য জ্ঞানের মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে রেখে গেছেন, তাঁদের অসাধারণ অবদান চিরকাল মুসলমানদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হবে। আবার অনেক অমূল্য গ্রন্থ কখনো যত্নের অভাবে, কখনো অমুসলিমদের আগ্রাসনের শিকার হয়ে কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। তাই মুসলমানদের উচিত ইসলামী জ্ঞান ভাণ্ডার সংরক্ষণে সদা সচেষ্ট থাকা। আমাদের দেশেও অনেক প্রবীণ আলেমের সংগৃহীত জ্ঞান ভাণ্ডার অবহেলায় অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই প্রতিটি সুন্নী মাদরাসায় সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও তার যথাযথ সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে, তৃতীয় ও চতুর্থ আপত্তির জবাবও আনুষঙ্গিকভাবে এ দীর্ঘ নিবন্ধে এসে গেছে। তাই, কলেবর বৃদ্ধি এড়ানোর জন্য এখানে পৃথকভাবে তা উল্লেখ করলাম না। পরবর্তীতে সময়-সুযোগ হলে তাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো। ইনশা-আল্লাহ।

---o--

প্রবন্ধ

ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে নামায-রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মাওলানা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আল-ক্বাদেরী •

আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে মুসলমানরূপে সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে সৃষ্টির সেরা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে বিজয়ী ইসলামকে আমাদের দ্বীন হিসেবে প্রদান করেছেন। আর ইসলামই একমাত্র ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা, যা স্বয়ং আল্লাহরই মনোনীত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ ইসলামই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম বা জীবন-ব্যবস্থা। আর নামায এবং রোযা হচ্ছে ইসলামের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ। ঈমানের পরপরই রয়েছে নামায। রোযাও এ পঞ্চ বুনিয়াদের অন্যতম। এ নিবন্ধে এ দু'টি স্তম্ভ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি-

।। এক ।।

নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ঈমানের পরই রয়েছে নামাযের গুরুত্ব। বান্দার জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের উত্তম উপায় হচ্ছে নামায। নামাযের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর কাছে সরাসরি আরজি পেশ করতে পারে। ক্বোরআনুল কারীমের এমন অনেক আয়াত শরীফ রয়েছে, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের নামায আদায় এবং নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন। হাদীসে পাকেও মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায কায়েম করার প্রতি তাকিদ প্রদান করেছেন এবং নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। নামায অন্যতম ফরয এবাদত। ক্বোরআন-ই পাকের অনেক জায়গায় নামাযের কথা অতি গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-আল্লাহ্ রাব্বুল

• **প্রধান ফক্বীহ্**- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
সাবেক সভাপতি- আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও.এ.সি)।

আলামীন পবিত্র ক্বোরআনুল করীমে মুত্তাক্বী বান্দাগণের পরিচয় প্রদান করে ইরশাদ করেন-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣)

তরজমা: এ কিতাব ক্বোরআন হিদায়তকারী মুত্তাক্বীদের জন্য; মুত্তাক্বী তারাই, যারা না দেখে আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং নামায ক্বায়েম রাখে আর আমার প্রদত্ত জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে। [সূরা বাক্বারা, আয়াত ২-৩]

নামায প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেকসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয। রাব্বুল আলামীন আরো এরশাদ করেন-

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (٤٣)

অর্থাৎ এবং তোমরা নামায ক্বায়েম করো ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ' করে, তাদের সাথে রুকূ' করো। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-৪৩]

এ আয়াতে কারীমায় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা নামাযকে ক্বায়েম বা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। নামায কখন ও কীভাবে ক্বায়েম করা যাবে? প্রথমতঃ নামায ক্বায়েম করার মূল দাবী হচ্ছে জামা'আত সহকারে সম্পন্ন করা। এর ফলে নামাযের সাওয়াবও ২৫ কিংবা ২৭ গুণ বেশী পাওয়া যায়। তাছাড়া, জামা'আতের ফলে জামা'আতে অংশগ্রহণকারী সকলের নামায ক্ববূল হওয়ার আশা করা যায়।

[তাফসীরে খাযা-ইনুল ইরফান, কৃত. সদরুল আফাযিল সৈয়দ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী ও আহকামুল ক্বোরআন]

নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনারও নির্দেশ রয়েছে। ক্বোরআন পাকে এরশাদ হচ্ছে-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (١٥٣)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৫৪]

এ আয়াত থেকে একটি বিষয় প্রতীয়মান হলো যে, ধৈর্যশীল মু'মিন কৃতজ্ঞ মু'মিন অপেক্ষা উত্তম। কেননা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর জন্য নি'মাত বৃদ্ধির ওয়াদা রয়েছে, কিন্তু ধৈর্যশীলদের সাথে মহান রবই রয়েছেন।

কোন বিশেষ ওযর (যেমন নাবালেগ, পাগল ও অজ্ঞান হওয়া) ব্যতীত নামায ছেড়ে দেওয়ার বিধান নেই। তাছাড়া, সকলের জন্য নামায সহজ ইবাদত হবে,

যদি নামাযে ধৈর্য, আন্তরিকতা এবং একাগ্রতা থাকে; অন্যথায় নামাযকে কিছু কিছু মহলের জন্য কষ্টসাধ্য বা ভারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন- আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ **তরজমা:** নিশ্চয় (নামায) ভারী ও কষ্টসাধ্য, কিন্তু আন্তরিকভাবে যারা আমার প্রতি বিনয়ী, তাঁদের জন্য নয়। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-৪৫]

সুতরাং নিয়মিতভাবে যথা নিয়মে নামায আদায় করা ঈমান ও অন্তরের বিনয়েরই চিহ্ন। আর শর'ঈ ওযর ব্যতীত নামাযের প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন করা মারাত্মক অপরাধের শামিল। নামাযের প্রতি উদাসীন না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং উদাসীনতার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

অর্থাৎ দূর্ভোগ (আযাব) রয়েছে ওই সব নামাযীর জন্য, যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর, উদাসীন। [সূরা মা'ঊন, আয়াত-৪-৫]

এখানে 'নামাযীগণ' মানে ওই সকল নামাযী, যারা শুধু নামায আদায় করে; কিন্তু অন্তরে ইখলাস বলতে কিছুই নেই। নিষ্ঠা, একাগ্রতা, নম্রতা ও বিনয় (خشوع وخضوع) হচ্ছে- নামায ক্ববূল হওয়ার পূর্বশর্ত। একাগ্রতা ও নম্রতা, যা ব্যতীত নামায নিষ্ফল আর উদাসীনভাবে নামায আদায় করলে ইহ ও পরকালীন অনিষ্টের কারণ হয়, যা ويل নামক 'দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে' নিয়ে যাবে।

নামাযের প্রতি উদাসীন ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআনে আরো এরশাদ হয়েছে-

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩)

তরজমা: অতঃপর তাদের পরে তাদের স্থলে ওই সকল উত্তরাধিকারী এলো, যারা নামায নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্যি' নামক উদ্যানে মিলিত হবে।

[সূরা মরিয়ম, আয়াত-৫৯]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, নামাযের বেলায় অবহেলা ও অলসতা করা বড় অন্যায় এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানদের আলামত; প্রকৃত মু'মিনদের নয়।

এ অলসতা কয়েক ধরনের হতে পারে- নামায না পড়া, ওয়াক্বত চলে গেলে বা নিষিদ্ধ সময়ে অবহেলা বশত নামায আদায় করা, বিনা কারণে জামা'আত ত্যাগ

করা, নামায না পড়তে থাকা, অথবা রিয়াকারী বা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়া ইত্যাদি। আর 'গায়্যি' (غَيٍّ) হলো জাহান্নামের এমন একটি উদ্যানের নাম, যার উত্তাপ থেকে জাহান্নামের অন্যান্য স্তরগুলোও পানাহ্ চায়।

[তাফসীরে কবীর ও রুহুল বয়ান]

এ আয়াতে কারীমাগুলোর আলোকে নামায আদায়ের গুরুত্ব ও সালাত বর্জনকারী বা সালাতের প্রতি উদাসীনতার অশুভ পরিণতি, পরকালীন কঠিন আযাব ও মর্মান্তিক শাস্তির কথা প্রমাণিত হলো। এ ছাড়া আরো বহু আয়াতে পাক রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা নামায আদায়ের প্রতি তাকিদ প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ

নিশ্চয় নামায যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

[সূরা আনকাবূত, আয়াত-৪৫]

বস্তুত: যে সব মু'মিন নর-নারী পরিশুদ্ধ নিয়তে যথাযথ আদব ও হৃদয়ের একাগ্রতা সহকারে নামায আদায় করে সে যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্মসমূহ থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকবে। এ ছাড়া পবিত্র হাদীসে পাকেও নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বহু বর্ণনা এসেছে।

সালাত তথা নামায আদায়কারী ব্যক্তির গুনাহ্সমূহ আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চিহ্ন করে দেন। যেমন, মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

অর্থাৎ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা হতে অপর জুমা এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান মাঝখানে সংঘটিত গুণাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়, যদি কবীরাহ্ গুনাহ্সমূহ হতে বিরত থাকা যায়।

[মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ, হাদীস নম্বর ৫১৮]

উক্ত হাদীস শরীফ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নামায যাবতীয় সগীরা (ছোট) গুনাহ্সমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অবশ্য যদি নামাযের পূর্বাপর দো'আ-মুনাজাতে খালিস নিয়তে গুনাহ কবীরা (বড়) গুনাহ্সমূহ হতে তাওবা করে, তবে কবীরা গুনাহও মাফ হয়ে যায়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে সরওয়ারে দু'জাহান হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا " [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

অর্থাৎ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা কি মনে কর? যদি তোমাদের কারো ঘরের দরজায় একটি নদী থাকে, আর সে ওই নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তবে তার গায়ে কি কোন ময়লা থাকবে? উপস্থিত সাহাবা-ই কেরাম উত্তর দিলেন, "কোন ময়লা থাকবেনা।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এরূপই। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা গুনাহ্সমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেন। [বোখারী ও মুসলিম এবং মিশকাত শরীফ]

মুহাদ্দিসীন-ই কেরাম (হাদীস বিশারদগণ)-এর দৃষ্টিতে এরূপ উপমাদানের কারণ হলো-গোসল যেভাবে শরীরের ময়লা দূর করে দেয় তেমনি নামাযও নামাযী বান্দার গুনাহসমূহ দূর করে দেয়। তাই নামায গুনাহ্ ও পাপ হতে পবিত্র হওয়ার মহান ওসীলা বা মাধ্যম।

অপর এক হাদীসে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ [رَوَاهُ مُسْلِمُ]

অর্থাৎ হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মু'মিন বান্দা ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ত্যাগ করা। [মুসলিম শরীফ ও মেশকাত শরীফ]

অর্থাৎ প্রকৃত মু'মিন নর-নারী অবশ্যই নামায আদায় করেন আর কাফির ও নাফরমান নামায আদায় করে না।

নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব এবং তা পরিত্যাগকারীর পরিণাম প্রসঙ্গে প্রিয়নবী রাসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوِبْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ .

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা নামাযের আলোচনা প্রসঙ্গে এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি নামায যথাযথভাবে যত্ন সহকারে সম্পন্ন করবে ক্বিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর, অকাট্য প্রমাণ ও মুক্তির গ্যারান্টি ও কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হবে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তা না নূর হবে, না অকাট্য দলীল হবে, না হবে মুক্তির কারণ এবং ক্বেয়ামতের দিন সে শ্রেষ্ঠ জালিম ক্বারূন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবনে খালাফের সাথে তার হাশর হবে।

[ইমাম আহমদ, দারেমী এবং বায়হাক্বী তাঁর শু'আবুল ঈমানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, মেশকাত শরীফেও হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।]

তাইতো আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু স্বীয় কালামে মজীদে ঘোষণা করেছেন-

اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ...ط

অর্থাৎ আমি তোমাদের সাথে আছি; যদি তোমরা নামায ক্বায়েম করো... ।

[সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-১২]

পাঞ্জেগানা নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের নূরানী আমলের অনুকরণের এক মহান সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা আমাদের পাপী-তাপী উম্মতের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার। একদিকে দয়াময় আল্লাহর আদেশ পালন, অন্যদিকে প্রিয়নবী ইমামুল আম্বিয়া আক্বা ও মাওলা হুযূর পূরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের অনুকরণও।

তাফসীরে নঈমী ১ম পারায় হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, তাফসীরে রুহুল বয়ানের বরাতে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার সারমর্ম হল- সর্বপ্রথম যমীনে নামায-ই ফজর আদায় করেছেন আদিপিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম, নামায-ই যোহর আদায় করেছিলেন হযরত খলীলুল্লাহ্ ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম, নামায-ই আসর আদায় করেছিলেন হযরত ইয়ূনুস আলায়হিস্ সালাম, নামায-ই মাগরিব আদায় করেছিলেন হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম এবং নামাযে এশা আদায় করেছিলেন রূহুল্লাহ্ হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম। [তাফসীরে নঈমী, ১ম পারা, সূরা বাক্বারা, পৃ. ১১৮]

বস্তুত: নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক, বিশাল। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নামায ক্বায়েম রাখার তাওফীক্ব দিন! আ-মী-ন।

।।দুই।।

রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের ৩য় স্তম্ভ হচ্ছে সাওম বা রোযা। নামাযের পর আর এক শারীরিক ইবাদত সাওমের অবস্থান বা গুরুত্ব। ধনী-গরীব সবার জন্য এ রোযাকে ইসলামী শরীয়ত ফরয করেছে নামাযের ন্যায়। রোযা দ্বারা দারিদ্র ও ক্ষুধার মূল্যায়ন হয় এবং সমাজে দরিদ্রকে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। রোযা দ্বারা নিজের বন্দেগী এবং মহান রবের মালিকানা প্রকাশ পায়। আরবী বার (১২) মাসের মধ্যে 'রমযান মাস' হলো নবম মাস। রমযান ব্যতীত কোনো মাসের নাম আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআনে উল্লেখ করেনি।

সুতরাং এটাও মাহে রমযানের অশেষ গুরুত্ব, ফযীলত, মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মূলত এ মাসের রোযা বা সিয়াম সাধনা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য একটি অনন্য নি'মাত, যা আমরা শাফা'আতের কান্ডারী, রহমতে দো'আলম ও সাইয়্যিদুল আরব ওয়াল আজম আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বদৌলতে উপহারস্বরূপ পেয়েছি। পূর্বেকার কোন নবী-রাসূল স্বীয় উম্মত ও জাতিকে নির্দিষ্ট করে কোন সময় বা মাস দান করেননি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রজব মাস হলো আল্লাহ তা'আলার, শা'বান মাস আমি নবীর এবং রমযান মাস হলো আমার উম্মতের। আল্লাহ তা'আলা পূর্বেকার সকল উম্মতের উপরই রোযার বিধান দিয়েছেন। এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)

তরজমা: হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিলো, যাতে তোমরা পরহেযগারী লাভ করতে পারো। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৮৩]

এ আয়াতে পাক থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে অত্যন্ত কষ্টকর এ রোযা শুধু উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ফরয করা হয়নি; বরং তা পূর্বেকার নবী-রাসূলের উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছিলো।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলার বড় দয়া হয়েছে। আমাদের উপর রমযানুল মুবারকের রোযা ফরয করে মূলত: আমাদের জন্য তাক্বওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং সাথে সাথে তা পালনেরও নির্দেশ প্রদান করেছেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ

তরজমা: সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই এ মাসের রোযা পালন করে। আর যে কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততসংখ্যক রোযা অন্য দিনগুলোতে ক্বাযা করবে। [সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৮৫]

রমযান মাসের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এ মাসে মহাগ্রন্থ ক্বোরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়েছে, মানব জাতির হিদায়ত স্বরূপ এবং পথ নির্দেশনা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ

তরজমা: রমযানের মাস, যাতে ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের জন্য হিদায়ত ও পথ-নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণীস্বরূপ ।[সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৮৫]

এ রমযানের আর একটি বরকত হচ্ছে, পবিত্র 'ক্বদর রাত', আর ক্বোরআনকে আল্লাহ্ তা'আলা এ রাতেই অবতীর্ণ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١)

তরজমা: নিশ্চয় আমি সেটা (ক্বোরআন) ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি।

[সূরা ক্বদর, আয়াত-১]

আর এ ক্বদর রাত্রির পরিচয় এবং ফযীলত গুরুত্ব বর্ণনা করে রাব্বুল 'আলামীন এরশাদ করেছেন-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣)

তরজমা: ক্বদরের রাত হলো হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। [সূরা ক্বদর, আয়াত-৩]

রমযান মাস প্রকৃত অর্থে ইহকালীন জীবনে তাক্বওয়া-পরহেযগারী এবং আল্লাহর অশেষ রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাত লাভের মাস। এ মাস অসংখ্য সাওয়াব অর্জনেরও উপযুক্ত সময়। শুধু ক্বদরের এক রাতেই ৮৩ বছর চার মাস ইবাদতের সাওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে দান করেন। তাছাড়া, ত্রিশটি রোযার সাওয়াব, ই'তিকাফের সাওয়াব এবং অন্যান্য দান-সাদ্ক্বার সাওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান করা হয়। তাই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের মাস রমযানের গুরুত্ব ইসলামে অত্যোধিক।

বহু বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র রমযান মাস এবং রোযার ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। আর রোযাদারের মর্যাদা এবং সাওয়াবও অপরিসীম।

মাহে রমযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

অর্থাৎ মহা মর্যাদাবান সাহাবী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যখন রমযান মাস আগমন করে, তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, অপর এক বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় আর শয়তানকে বন্দী করা হয়, অন্য এক বর্ণনায় আছে, রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। [বোখারী, মুসলিম ও মেশকাত শরীফ]

মূলত শয়তানকে বন্দী করার মধ্যে আল্লাহ্র মর্জি হলো বান্দা যেন তাঁর ইবাদত একাগ্রতার সাথে করতে পারে। অপর এক হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلِى حَوْلٍ قَابِلٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَيَقُلْنَ يَارَبِّ اِجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِمْ أَعْيُنُنَا وَتَقَرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا [رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ]

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বছরের প্রথম হতে পরের বছর পর্যন্ত মাহে রমযানের জন্য জান্নাতকে সাজানো হয়ে থাকে। অতঃপর যখন রমযান মাসের প্রথম দিন হয়, তখন আরশের নিচে জান্নাতের গাছের পাতা হতে আয়াতলোচনা হুরদের প্রতি এক (প্রকার) মনোরম হাওয়া প্রবাহিত হয়। তখন তারা (হুরগণ) বলে, "হে প্রতিপালক! তোমার বান্দাদের মধ্য হতে আমাদের জন্য এমন স্বামী নির্ধারণ করো, যাদেরকে দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হবে আর আমাদেরকে দেখে তাদের চক্ষু শীতল হবে। হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী তাঁর শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। [মিশকাত শরীফ]

আর রোযার প্রতিদান প্রদানেরও আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অন্যান্য ইবাদতের প্রতিদানের ভার ফেরেশতাদের উপর ন্যস্ত থাকে। রোযাই একমাত্র ইবাদত, যার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। হাদীসে পাকে প্রিয় নবী সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ... الحديث

অর্থাৎ আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশগুণ হতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'রোযা তার ব্যতিক্রম। কেননা, রোযা একমাত্র আমারই জন্য রাখা হয়, আর আমিই এর প্রতিদান দেবো। [মিশকাত শরীফ]

এ হাদীস শরীফ থেকে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য ইবাদতে রিয়া থাকলেও রোযাই একমাত্র ইবাদত যেখানে লোক দেখানোর কোন অবকাশ নেই। তাই এ ইবাদতে বান্দার প্রতি আল্লাহ খুশি হয়ে নিজেই তার প্রতিদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- لَيْسَ فِى الصَّوْمِ رِيَاءٌ অর্থাৎ রোযাতে কোন

প্রকার রিয়া নেই। অন্য দিকে রোযা মানুষকে যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে, যে কোন অপরাধ থেকে বিরত রাখে। তাই বলা হয়েছে- اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ অর্থাৎ রোযা ঢাল স্বরূপ।

আর এ রিয়ামুক্ত, একনিষ্ঠভাবে ইবাদতকারী তথা রোযাদারের সম্মান ও মর্যাদা ও অত্যোধিক। এ প্রসঙ্গে হাদীসে পাকে এসেছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ , وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَلَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

অর্থাৎ সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রমযানের রোযা পালন করে, তার পূর্বের সমূদয় গুনাহ্ (সগীরা) মাফ করে দেওয়া হবে, আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমযানের রাত ইবাদতে কাটাবে তারও পূর্ববর্তী গুনাহ্ মাফ করা হবে, আর যে ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত ইবাদতে কাটাবে তারও পূর্ববর্তী সমূদয় গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। [বোখারী, মুসলিম ও মেশকাত শরীফ]

আর ক্বোরআনে পাক ক্বদরের রাতে ইবাদত করাকে তিরাশি বছর চার মাস অপেক্ষা উত্তম বলেছেন। আর রোযাদারের মুখের গন্ধও রাব্বুল আলামীনের কাছে মিশ্‌কের সুগন্ধি হতে অধিক সুগন্ধময়। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ

অর্থাৎ রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মেশক আম্বরের সুগন্ধির চেয়েও উৎকৃষ্ট। (আল হাদীস) অর্থাৎ সুগন্ধিকে মানুষ যেভাবে কাছে টেনে নেয়, তেমনি রোযাদারকে আল্লাহ্ তা'আলা নৈকট্য দান করেন। এছাড়াও হাদীসে পাকে এসেছে রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশি-

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

অর্থাৎ রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছেঃ **এক.** তার ইফতারের সময়, **দুই.** (পরকালে) তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত লাভের সময়।

[আল হাদীস, মেশকাত শরীফ]

বেহেশতে এমন একটি দরজা আছে, যে দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারগণই প্রবেশাধিকার লাভ করবেন।

হাদীস শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ اِلاَّ الصَّائِمُوْنَ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

অর্থাৎ হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি দরজার নাম হলো 'রাইয়্যান'। আর ওই দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারগণই প্রবেশ করবেন। [বোখারী ও মুসলিম]

এভাবে অসংখ্য নি'মাতদানসহ রোযাদারগণকে পুরস্কৃত করা হবে এবং মর্যাদা প্রদান করা হবে।

ইসলামী শরীয়তে মাহে রমযানে রোযার বিধান প্রবর্তনের পেছনেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হিকমত বিদ্যমান। তন্মধ্যে- কয়েকটা নিম্নরূপ:

ক. বান্দার তাক্বওয়া অর্জন,
খ. রোযা শয়তানের প্ররোচনা প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।
গ. গুনাহ্‌সমূহ মাফ হয়ে যায়।
ঘ. রোযা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম।
ঙ. আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের উপায়।
চ. অবিরত রহমত লাভ করা।
ছ. ক্বোরআন নাযিল করার মাস এবং তার ফযীলত লাভ।
জ. বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হয়।
ঝ. দুঃখী মানুষের দুঃখ অনুভবের সুযোগ হয়।
ট. চরিত্র হননকারী কু-প্রবৃত্তির দমন হয় এবং বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক রোগ নিরাময় হয় এই মাসে রোযা পালনের মাধ্যমে।

---o---

ইসলামী অনুষ্ঠানাদি

মাওলানা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ*

।। এক ।।

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন

ميلاد (মীলাদ) শব্দটি আরবী। আরবী পরিভাষায় مصدر ميمى (মীম বিশিষ্ট মাসদার)। অন্য আরেকটি শব্দে مَوْلِدْ আছে। এর আভিধানিক অর্থ- জন্ম, জন্মস্থান। এ জন্য মক্কা শরীফে মারওয়া পাহাড়ের পার্শ্বে 'মাকতাবাতু মাক্কাহ্ আল- মুকার্‌রামা' সাইন বোর্ড সম্বলিত দালানটিকে مَوْلِدُ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (মাওলেদুন্নবিয়্যি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলা হয়। আহমদ মুহাম্মদ ইলিয়াস গনী তাঁর রচিত تاريخ مكة المصور গ্রন্থের مَكْتَبَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ (الْمَوْلِدِ) অংশে সচিত্র উল্লেখ করেন,

وَهِىَ دَارُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وُلِدَ فِيْهَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ এটা হচ্ছে খাজা আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বাড়ী। এখানে আমাদের সরদার সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন।

পরিভাষায়, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ জন্ম বৃত্তান্তকে مِيلاد (মীলাদ) বলা হয়।

আমাদের সঠিক ইসলাম, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ বলে আখ্যায়িত করেছেন, এ ইসলামের আলোকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে মীলাদ শরীফ পাঠ করা, ক্বায়েম করা এবং হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মীলাদে পাকের কথা স্মরণ করে তাঁর সম্মানার্থে ক্বিয়াম করে সালাম পেশ করা শুধু বৈধ নয়; বরং উত্তম ও সাওয়াবের কাজ। যেহেতু, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

* অধ্যাপক, ফিক্বহ্ বিভাগ- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

ওয়াসাল্লামকে মুহাব্বত করা এ উম্মতের উপর ফরয এবং সর্বাবস্থায় সম্মানের আক্বীদা রাখা, সম্মান প্রদর্শন করা ফরয; যেমন, ক্বোরআনুল করীমে নির্দেশ এসেছে- وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ তোমরা তাকে সাহায্য করবে এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে), সেহেতু মীলাদ-ক্বিয়ামের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্মান দেখানো উত্তম ও সাওয়াবের কাজ। এগুলোকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কর্মকান্ড হিসাবে আক্বীদা রাখা ফরয, যাকে ফিক্বহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায়, ফরযে এ'তেক্বাদী (فرض اعتقادى) বলা হয়।

বর্তমান মীলাদ শরীফ উদ্‌যাপন করার ব্যাপারে বাতিল মতবাদীরা বিভিন্ন অনেক আপত্তি উত্থাপন করে। যেমন- ক্বোরআন, হাদীস ও সলফে সালেহীনের মধ্যে নেই ইত্যাদি অথচ ক্বোরআনুল করীমের পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। পবিত্র ক্বোরআনে এ সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআনকে تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَىْءٍ (প্রত্যেক কিছুর বর্ণনাকারী) বলেছেন। আর ক্বোরআনে করীমে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তা'যীম, প্রশংসা, গুণগান ও উত্তম চরিত্র ইত্যাদি বর্ণনার্থেও নাযিল হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর আছেন। [সূরা ক্বলম: আয়াত: ৪] হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বর্ণনায় كَانَ خُلُقُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ الْقُرْاٰنُ (হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র হচ্ছে ক্বোরআন) এসেছে। তাই মীলাদ ও ক্বিয়াম শরীফও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তা'যীমরূপী কর্মকান্ডের বাইরে নয়; এর মাধ্যমে পবিত্র ক্বোরআন নাযিল হবার অন্যতম উদ্দেশ্যও বাস্তবায়িত হয়।

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' সম্পর্কে আমি একখানা পুস্তক রচনা করেছি। 'সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' নামক বইটিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আগমন তথা 'মীলাদ' প্রসঙ্গে অবতীর্ণ ক্বোরআনের বহু আয়াত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। ওইগুলো পবিত্র মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনের পক্ষে প্রনিধানযোগ্য। এ নিবন্ধে ক্বোরআনের কিছু আয়াতে কারীমা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি, যেগুলো দ্বারা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ শরীফ পালন

করা শুধু বৈধ বলে প্রমাণিত হয় না, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ আমল বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন-

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)

তরজমা: হে হাবীব, আপনি বলুন, আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া এবং সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিৎ; তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়। [সূরা ইয়ূনুস: আয়াত-৫৮, কানযুল ঈমান]

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

তরজমা: এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ছিলো, তিনি তোমাদের অন্তরগুলোতে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন...আল আয়াত। [সূরা আল-ই ইমরান: আয়াত-১০৩, কানযুল ঈমান]

وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ (٨١)

তরজমা: এবং স্মরণ করুন যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রসূল, যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে।' এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলে?' সবাই আরয করলো, "আমরা স্বীকার করলাম।" এরশাদ করলেন, 'তবে (তোমরা!) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।' [সূরা আল-ই ইমরান: আয়াত-৮১, কানযুল ঈমান]

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (١٥)

তরজমা: নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে এবং স্পষ্ট কিতাব। [সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত-১৫]

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨)

তরজমা: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে ওই রসূল, যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কাল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মু'মিনদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু। [সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত- ১২৮]

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (١٦٤)

তরজমা: নিশ্চয় আল্লাহর মহা অনুগ্রহ হয়েছে মু'মিনদের উপর যে, তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন; যিনি তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন এবং তারা নিশ্চয় এর পূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলো। [সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত- ১৬৪]

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন হুযূর-ই আক্‌রামের আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন,

أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

তরজমা: আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের। [সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত-৫৯, কানযুল ঈমান]

অর্থাৎ: যাদের হাতে ঈমান-ইসলামের ক্ষমতা রয়েছে (তথা ইমাম, মুজতাহিদ, শরীয়তের আইনজ্ঞ, মাযহাবের ইমামগণ, তরিক্বতের ইমামগণ) তাঁদের আনুগত্য করো।

মূলত, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মহান নি'মাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-,

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا

তরজমা: এবং যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নি'মাতগুলো বর্ণনা করো, তবে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। [সূরা ইব্রাহীম: আয়াত-৩৪, কানযুল ঈমান]

অত্র আয়াতে বর্ণিত নি'মাতের কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্য আল্লাহ অন্য আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন, যা পালন করা অন্যতম ফরয। মিলাদে পাক উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ওই নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং এটা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে মহান ইবাদতে পরিণত। অতএব, এটা ইবাদত, বিদ'আত নয়। আশ্চর্য! বাতিল ফিরক্বার লোকেরা এমন ইবাদতকে বলে বেড়ায়! তাদের এ কোন্ ধর্ম?

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হতে হযরত আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পর্যন্ত যুগে যুগে যাঁদের মাধ্যমে হুযূর-ই আক্‌রামের নূর মুবারক স্থানান্তরিত হয়েছিলো প্রত্যেকে ওই নূরে পাককে নিয়ে আপন পরিবেশে মিলাদ পালন করেছেন।

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-ই কেরাম কর্তৃক যুগে যুগে এ মীলাদ পালিত হয়ে আসছে। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মীলাদ বর্ণনাপূর্বক হাদীস বর্ণনা করেন,

خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ اَخْرُجْ مِنْ سَفَاحٍ مِنْ لَّدُنْ اٰدَمَ اِلٰى اَنْ وَلَدَنِىْ اَبِىْ وَاُمِّىْ

অর্থাৎ আমি ইসলামী নিকাহ'র তরীকা অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করেছি এবং হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হতে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত কারো নিকট কখনো ব্যভিচার পাওয়া যায় নি। [ত্বাবরানী, ইবনে আবী শায়বাহ্ দায়লামীর মুসনাদুল ফিরদাউস]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের মীলাদ শরীফ নিজেই উদ্‌যাপন পূর্বক বর্ণনা করেন,

اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَىٍّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مَرَّةَ بْنِ مَدْرَكَةَ بْنِ الْيَاسِ بْنِ مُضَرَ بْنِ يَزَارَ وَمَا افْتَرَقَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ اِلاَّ جَعَلَنِىَ اللهُ فِىْ خَيْرِهِمَا ـ فَاُخْرِجْتُ مِنْ بَيْنِ اَبَوَيْنِ فَلَمْ يُصِبْنِىْ شَىْءٌ مِّنْ مَهْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَخَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَّلَمْ اُخْرَجْ مِنْ سَفَاحٍ مِّنْ لَّدُنْ اٰدَمَ حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلٰى اَبِىْ وَاُمِّىْ فَاَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ اَبًا

[بَيْهَقِىُّ وَالْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ]

অর্থাৎ ...সমস্ত মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত, আল্লাহ্ আমাকে তাদের মধ্যে উত্তম ভাগে রেখেছেন। আমি মাতাপিতার গর্ভে ও ঔরশে জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু আমাকে জাহেলী যুগের কোন অশ্লীলতা স্পর্শ করেনি। আমি আমার মাতাপিতার বিবাহের ফসল। আমি কোন ব্যভিচারের ফসল নই। হযরত আদম থেকে বংশ পরম্পরায় আমার পিতামাতা পর্যন্ত আমি এসেছি। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে সত্তার দিক দিয়েও উত্তম এবং তোমাদের মধ্যে পিতার দিক দিয়েও উত্তম।

[বায়হাক্বী, আল বিদায়া, ওয়ান্নিহায়া]

হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের মীলাদ সম্পর্কে আরো বর্ণনা করেন,

اِنِّىْ عِنْدَ اللهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ وَسَاُنَبِّئُكُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِىْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسٰى وَرُؤْيَا اُمِّىَ الَّتِىْ رَاَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِىْ قَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ [اَلْبَيْهَقِىُّ وَمُسْنَدُ اَحْمَدَ]

অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট, শেষ নবী হিসেবে গোপন ছিলাম। তখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তাঁর দৈহিক উপাদানে মিশ্রিত ছিলেন আর আমি এখন আমার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বলব- আমি হযরত ইব্রাহীমের দো'আ, হযরত

ঈসার সুসংবাদ এবং আমার মায়ের ওই চাক্ষুষ দৃশ্য, যা তিনি আমার জন্মের সময় দেখেছিলেন, তাঁর সামনে একটি নূর উদ্ভাসিত হয়েছিলো, যার আলোয় তিনি সিরিয়ার প্রাসাদগুলো দেখতে পেয়েছিলেন। [বায়হাক্বী, মুসনাদে ইমাম আহমদ]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের মিলাদ বর্ণনাপূর্বক নিজ সৃষ্টির শুরু সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَئَلَ جِبْرَآئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ يَا جِبْرَائِيْلُ كَمْ عُمْرُكَ مِنَ السِّنِيْنَ؟ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ لَسْتُ اَعْلَمُ غَيْرَ اَنَّ فِىْ الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْمًا يَطْلَعُ فِىْ كُلِّ سَبْعِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً وَرَاَيْتُهٗ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ اَلْفَ مَرَّةٍ فَقَالَ يَا جِبْرَائِيْلُ وَعِزَّةِ رَبِّىْ جَلَّ جَلاَلُهٗ اَنَا ذَالِكَ الْكَوْكَبُ [السيرة الحلبية نقل عن كتاب تشريفات رواه البخارى]

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাঈল, তোমার বয়স কত? তিনি বললেন, আমি তো জানি না, তবে এতটুকু জানি যে, চতুর্থ পর্দায় একটি তারকা সত্তর হাজার বছরের মাথায় একবার উদিত হতো। আমি সেটাকে বাহাত্তর হাজার বার দেখেছি। অতঃপর হুযূর-ই আক্‌রাম বললেন, হে জিব্রাঈল আমার মহান রবের ইয্‌যাতের শপথ! আমি হলাম ওই তারকা। [সীরাতে হালবিয়া]

এভাবে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মীলাদ বর্ণনা পূর্বক অসংখ্য হাদীসে পাক রয়েছে। আমার রচিত 'সকল যুগের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' নামক কিতাবে আমি ১৩টি হাদীস উল্লেখ করেছি। প্রয়োজনে সংগ্রহ করে পড়ার পরামর্শ রইলো।

সাহাবা-ই কেরামের মধ্যেও ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনের বিবরণ অসংখ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত,

اِنَّه مَرَّ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِىِّ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وَلاَدَتِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ لِاَبْنَائِهٖ وَعَشِيْرَتِهٖ وَيَقُوْلُ هٰذَا لِيَوْمٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ اَنَّ اللهَ فَتَحَ لَكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكَ مَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجٰى نَجَاتَكَ ـ

[التنوير فى مولد البشير والنذير]

অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমির আনসারীর ঘরে গেলেন। তিনি তখন তার পুত্রদের ও গোত্রীয়

লোকদেরকে হুযূর-ই আক্রামের বেলাদত শরীফের বর্ণনাবলী শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আর বলছিলেন, 'আজকের এ দিন।' অতঃপর হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য রহমতের দরজাগুলো খুলে দিয়েছেন, ফেরেশতারা সবাই তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করছে। যে ব্যক্তি তোমার মতো কাজ করবে, সে তোমার মতো মুক্তি পাবে।"

[আত্তানভীর ফী মওলেদিল বশীরিন নাযীর]

মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে ইমামগণের অভিমত

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী 'হাসানুল মাক্বসাদ ফী আমলিল মাওলেদ' (حسن المقصد فى عمل المولد)-এর মধ্যে বর্ণনা করেন-

فَظَهَرَ لِىْ تَخْرِيْجُه عَلٰى اَصْلٍ اٰخَرَ وَهُوَ مَا اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِه بَعْدَ النَّبُوَّةَ مَعَ قَدْ وَرَدَ عَنْ جَدِّه عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَقَّ عَنْهُ فِىْ سَابِعِ وِلَادَتِهِ وَالْعَقِيْقَةُ لَا تُزَادُ مَرَّةً ثَانِيَةً فَيُحْمَلُ عَلٰى اَنَّ الَّذِىْ فَعَلَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِظْهَارُ الشُّكْرِ عَلٰى اِيْجَادِ اللهِ اِيَّاهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ وَتَشْرِيْعِ لِاُمَّتِه كَمَا كَانَ يُصَلِّىْ عَلٰى نَفْسِه لِذَالِكَ فَيَسْتَحِبُّ لَنَا اَيْضًا اِظْهَارُ الشُّكْرِ بِمَوْلِدِه بِالْاِجْتِمَاعِ وَاِطْعَامِ الطَّعَامِ وَنَحْوِ ذَالِكَ بِوُجُوْهِ الْقُرْبَاتِ وَاِظْهَارِ الْمُسَرَّاتِ

অর্থাৎ আমার নিকট এ হাদীসের বর্ণনার জন্য একটি সনদ প্রকাশ পেয়েছে। তা হচ্ছে ওই হাদীস, যা ইমাম বায়হাক্বী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের আক্বীক্বা নিজে করেছেন নুবূয়ত প্রকাশের পর। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর দাদা খাজা আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর বেলাদত শরীফের সপ্তম দিনে তাঁর পক্ষ থেকে আক্বীক্বা করেছেন অথচ আক্বীক্বা একবারের বেশী করা হয় না। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন, তার ব্যাখ্যা এটা দেওয়া হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে পয়দা করেছেন বিধায় সেটার শোকরিয়া প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তা করেছেন আর তেমন কাজ শরীয়তের বিধিভুক্ত করার জন্য, যেমন তিনি তজ্জন্য নিজে দুরূদ পড়েছেন। সুতরাং আমাদের জন্যও হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ শরীফের শোকরিয়া আদায় করা মুস্তাহাব; তাও মাহফিলের আয়োজন ও খানা খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও তাঁর নি'মাত প্রাপ্তিতে খুশী প্রকাশের নিমিত্তে।)

পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'মা-সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্' (ما ثبت بالسنة)-এর মধ্যে এভাবে বর্ণনা করেন-

لَايَزَالُ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلُوْنَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِىْ لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ فِى الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَاءَ ةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ (مَاثَبَتَ بِالسُّنَّةِ)

অর্থাৎ মুসলমানগণ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাসে মাহফিল করে আসছেন, খাবারের আয়োজন করেন, সেটার রাতগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সাদক্বাহ্-খায়রাত করেন এবং খুশী প্রকাশ করেন দান-খায়রাত ও মীলাদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে।

এভাবে মিশরও সিরিয়ার মধ্যে মীলাদ পালন প্রসঙ্গে فاكثر هم بذالك اهل مصر والشام অর্থাৎ সুতরাং মিশর ও সিরিয়াবাসীরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তা পালন করে থাকে।

দেওবন্দীদের অন্যতম মৌলভী আশরাফ আলী থানভী কর্তৃক রচিত 'মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' নামক কিতাবের ১৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন, 'ক্বোরআনের আয়াত- ذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللهِ (তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন আল্লাহর দিনগুলোকে)'-এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, "এ কথা সুস্পষ্ট হল যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত উপলক্ষে খুশি-আনন্দ করা বৈধ। শুধু তা নয়, বরং তা বরকত হাসিলেরও বড় উপায়।

রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর ওস্তাদ মীলাদ সম্পর্কে বলেন, এ কথা হক ও সত্য যে, হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ শরীফ পালন এবং ঈসালে সাওয়াবের আয়োজন করা মানবের পরিপূর্ণ কল্যাণের একটি সোপান। বাস্তব এ যে, হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মীলাদ পালন করার মধ্যে এবং ঈসালে সাওয়াব উপলক্ষে ফাতেহা পড়া আপন মীলাদের খুশি উদ্‌যাপন করেছেন পুরোটাই মানবের জন্য মঙ্গল।

[শেফাউল সায়ের, কৃত. শাহ্ আবদুল গণী দেহলভী]

উপরোক্ত দলীলাদির আলোকে সাব্যস্ত হল যে, ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালন করা এ উম্মতের জন্য সর্বোত্তম ইবাদত; যার মাধ্যমে আল্লাহর মহান নি'মাতের শোকর আদায় হয়। আর নি'মাতের শোকর আদায়ের জন্য স্বয়ং আল্লাহরই হুকুম বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা

এরশাদ করেন, وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَاتَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ "তোমরা আমার নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং নাফরমানী করো না।" সুতরাং যারা আল্লাহর মহান নি'মাতের শোকর আদায়ার্থে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালন করে, তারা আল্লাহর হুকুমই বাস্তবায়ন করে। আর আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন ও পালন তারাই করবে, যারা ঈমানদার। তাই ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালন করা ঈমানদারের কাজ ও পুণ্যময় আমল, যা করলে পুণ্য বা সাওয়াব পাওয়া যায়। আর যারা ঈমানদার নয়, তারা ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালন করার প্রশ্নই আসে না। অবশ্য যারা ঈমানদার নয়, তারা যদি ভক্তি সহকারে তা পালন করে, তবে তারা অবশ্যই সুফল পাবে। যেমন, হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবূ লাহাবকে হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বপ্নে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অবস্থা কি? সে উত্তরে বললো, "ঈমান ছাড়া মৃত্যুবরণের কারণে বর্তমানে আমার অবস্থান জাহান্নামে, কিন্তু প্রতি সোমবার রাতে আমার আযাব হালকা হয়ে যায় এবং আমি আমার এ দু'আঙ্গুল থেকে ঠান্ডা পানি পান করতে থাকি। আর এ আযাব হালকা হওয়া এবং ঠান্ডা পানি পাবার কারণ হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফের শুভ সংবাদ দিয়ে আমার দাসী সুয়াইবা আমাকে অবহিত করলে আমি তাকে আনন্দ চিত্তে এ দু' আঙ্গুলে ঈশারা করে মুক্ত করে দিয়েছিলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করানোর নির্দেশ দিয়েছিলাম। এ প্রসঙ্গে ইমাম শামসুদ্দীন যাযাবী (জন্ম ৬৬০ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'উরফুত তা'রীফ বিল মাওলিদিশ শরীফ'-এর মধ্যে এ মন্তব্য করেন-

فَاِذَا كَانَ اَبُوْ لَهَبٍ ن الْكَافِرُ الَّذِىْ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ لِذَمِّه جُوْزِىَ فِى النَّار بِفَرْحَةِ لَيْلَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِه فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ اُمَّةِ لنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُرُّ لِمَوْلِدِه وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ اِلَيْهِ قُدْرَتُه فِيْ مَحَبَّتِه لَعَمْرِىْ اِنَّمَا يَكُوْنُ جَزَائُه مِنَ اللهِ الْكَرِيْمِ اَنْ يُدْخِلَه بِفَضْلِه جَنَّاتِ النَّعِيْم (عُرْفُ التَّعْرِيْفِ بِالْمَوْلِدِ الشَّرِيْفِ لِلْجَزَرِىّ وَحَسَن الْمَقْصِدِ فِىْ عَمَل الْمَوْلِدِ لِلسُّيُوْطِىِّ)

অর্থাৎ আবূ লাহাব, যার মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে এবং যার দুর্নামের জন্য সূরা লাহাব ক্বোরআনে নাযিল হয়েছে, সে মৃত্যুর পর জাহান্নামের আগুনের মধ্যে রয়েছে; কিন্তু হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মীলাদে পাকের রজনীতে (৫৭০ খ্রি.) হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শুভাগমনের উপর খুশি উদ্‌যাপন করার কারণে প্রতি সোমবার আযাব থেকে মুক্তি এবং ঠান্ডা পানি পান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আর এ উম্মতের ঈমানদারের অবস্থা কিরূপ হবে, যে হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মীলাদের উপর খুশি উদ্‌যাপন করে এবং নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সার্মথ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে? আমার জীবনের শপথ! অবশ্যই এটার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতুন্ না'ঈমে প্রবেশ করাবেন।

[উরফুত্ তা'রীফ বিল মাওলিদিশ্ শরীফ, কৃত. শামসুদ্দীন জাযরী এবং হাসানুল মাক্বসাদ, কৃত. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী]

ক্বোরআন, সুন্নাহ্ ও আইম্ম্যা-ই মুজতাহিদীনের মতামতের ভিত্তিতে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালন করা শুধু বৈধই নয় বরং আল্লাহর নি'মাতের শোকর আদায়ার্থে উত্তম ইবাদতও। এ কাজ ইসলামেরই অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং এটা ইহুদী, খ্রিস্টান ও কাফেররা উদ্‌যাপন করার প্রশ্নই ওঠে না।

যারা একথা বলে, তারা ইসলাম ধর্মে তো নেই, এমনকি অন্য কোন ধর্মে তাদের অবস্থান আছে কি না, তা আমার জানা নেই। মুসলমান হয়ে নবীর উম্মত দাবী করে, নবীর মীলাদের বিপক্ষে অবস্থান নেবে এ ধরনের মুসলমানের স্থান এ উম্মতের মধ্যে নেই। হ্যাঁ, যে জনগোষ্ঠী খারেজী নাম নিয়ে বের হয়ে গিয়েছে, এরা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

খারেজী ছাড়া এ ধরনের কথা আর কেউ বলতে পারে না। খারেজী সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার অভিমত হচ্ছে 'মাখলুক্বাতের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ও নিকৃষ্ট সম্প্রদায় হচ্ছে খারেজী'।

[সহীহ্ বুখারী]

বর্তমানে যারা খারেজী দলের অন্তর্ভুক্ত, তারা যে মীলাদ শরীফ উদ্‌যাপনের বিপক্ষে উপরোক্ত মন্তব্য করে, ফাত্ওয়া জারী করে, তাদের এমন ফাত্ওয়া শুধু তাদের মতাবলম্বীদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। সঠিক ইসলামপন্থী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের জন্য হতে পারে না। সুতরাং তাদের খারেজী ধর্মে

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম না থাকতে পারে, তাই বলে তা আমাদের সঠিক ইসলামেও নেই এ কথা বলা যাবে না; বরং সঠিক ইসলামে মীলাদুন্নবী আছে, তাদের খারেজী ধর্মে নেই। আর খাজেরী ধর্মের কোন ফাত্ওয়া আমাদের ধর্মে গ্রহণযোগ্য নয়।

মীলাদে পাক-এ ক্বিয়াম

হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তাওয়াল্লুদ শরীফ পাঠের শেষান্তে দাঁড়িয়ে হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সালাম পেশ করাকে 'ক্বিয়াম' নামে অভিহিত করা হয়। আর এ ক্বিয়াম করা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানের জন্যই। সম্মান প্রদর্শনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। ক্বোরআন-সুন্নাহর মধ্যে সম্মান প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। যখন যে পরিবেশে যে জিনিষকে সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম ধরা হয়, সে পরিবেশে সে পদ্ধতিতে সম্মান প্রদর্শন করা ক্বোরআন-সুন্নাহ সমর্থিত। এর উদ্দেশ্য হল সম্মান প্রদর্শন করা। মীলাদ শরীফের ক্বিয়াম ক্বোরআন, হাদীস ও প্রখ্যাত ইমামগণের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। ক্বিয়ামের বিপক্ষে বিন্দুমাত্র দলীল ইসলামী শরীয়তে নেই; কিন্তু এক শ্রেণীর (ওহাবী) মোল্লারা বলে ও লিখে থাকে যে, কোন ইমাম, মুজতাহিদ, সাহাবী, তাবে'ঈ নাকি ক্বিয়াম করেননি। আমদের কথা হলো, যারা বলে সাহাবা-ই কেরাম, তাবে'ঈন, তব'ই তাবে'ঈন, সলফে সালেহীন, আ'ইম্যা-ই মুজতাহিদীন ক্বিয়াম করেননি, তাঁরা কি তাদের যুগে ছিলো? তারা কি তাঁদের সকল কর্মকান্ড স্বচক্ষে দেখেছে? নিশ্চয়ই তারা তখন ছিলো না। তাই তারা দেখেও নি। কিসের উপর ভিত্তি করে ইমামগণ ক্বিয়াম করেননি বলে তারা দাবি করে? মীলাদে ক্বিয়াম নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র তা'যীমের জন্য করা হয়। নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র তা'যীম সকল মু'মিনের উপর সদা সর্বদা অপরিহার্য। তাই সাহাবা-ই কেরাম, তাবে'ঈন, তব'ই তাবে'ঈন, আইম্মা-ই মুজতাহিদীনসহ তরীক্বতের সকল ইমামগণ সদাসর্বদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তা'যীমে সচেষ্ট ছিলেন। শরীয়ত ও তরীক্বতের প্রতিটি কাজ তাঁরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তা'যীমের আলোকে করেছেন। যুগে যুগে তা'যীম ও সম্মানের ধারা ও ধরন

পরিবর্তন-পরিমার্জন করা হয়। হুযূর-ই আক্রামের মীলাদে পাকের আয়োজন যেমন তাঁরই সম্মানের বহিঃপ্রকাশ, তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সালাম পেশ করাও তা'যীমেরই বহিঃপ্রকাশ। শরীয়তের পরিভাষায়, কোন কাজ এক দিক দিয়ে বৈধ হলে অন্য দিক দিয়ে অন্য কারণে তা অবৈধ হয়ে যায়। যেমন- নামায ভাল ইবাদত। এর মধ্যে ফরয, সুন্নাত, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব রয়েছে। আবার নামায অন্য কারণে হারামও হয়। যেমন, اوقات منهية বা নিষিদ্ধ সময়সমূহে- সূর্যোদয়, দ্বি-প্রহর ও সূর্যাস্ত এবং নাপাক অবস্থায় নামায পড়া হারাম।

'ক্বিয়াম'-এর প্রকারভেদ

জায়েয, ফরয, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরূহ ও হারাম-এ কয়েক প্রকারের কিয়াম রয়েছে। প্রত্যেক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নরূপ:

এক. ক্বিয়াম-ই জায়েয বা মুবাহ্: দুনিয়াবী কোন কাজের জন্য দাঁড়ানো 'জায়েয-ক্বিয়াম'। যেমন- দাঁড়িয়ে ঘর নির্মাণ করা, দাঁড়িয়ে চলাফেরা করা ইত্যাদি। ক্বোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا অর্থাৎ 'জুমু'আর নামায শেষে যমীনে ছড়িয়ে পড়ো।' [১১০:১০] আর এ ছড়িয়ে পড়া দন্ডায়মান হওয়া ব্যতীত হতে পারে না। সুতরাং এ ক্বিয়াম বৈধ বা মুবাহ্।

দুই. ক্বিয়াম-ই ফরয: পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ও ওয়াজিব নামাযের মধ্যে ক্বিয়াম করা ফরয। যেমন- ক্বোরআন-ই করীমের এরশাদ- وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহর সম্মুখে আনুগত্য সহকারে দাঁড়িয়ে যাও।' সুতরাং কেউ দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি বসে নামায পড়ে তাহলে তার নামায বাতিল।

তিন. ক্বিয়াম-ই নফল: নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়া মুস্তাহাব। বসে বসে পড়লেও শুদ্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু দাঁড়ানোর মধ্যে সাওয়াব দ্বিগুণ।

চার. ক্বিয়াম-ই সুন্নাত: ইসলাম ধর্মের কোন সম্মানিত বস্তুকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ানো সুন্নাত। যেমন- মক্কা শরীফের ঝমঝমের পানি পান করার সময় দাঁড়ানো। ওযূ করার পর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত।

হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা-ই পাকে হাযির হয়ে নামাযের মতো হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করা সুন্নাত। যেমন- 'ফতোয়া-ই আলমগীরী: ১ম খন্ড: কিতাবুল হজ্জঃ আদাবু যিয়ারাতি ক্বাবরিন নবীয়্যি' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِى الصَّلٰوةِ وَيُمَثِّلُ صُوْرَتَهُ الْكَرِيْمَةَ كَاَنَّه نَائِمٌ فِىْ لَحْدِهٖ يَعْلَمُ بِهٖ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ

অর্থাৎ রওযা-ই আক্বদাসের সামনে নামাযের মতো আদবের সাথে দাঁড়াবে এবং অন্তরে হুযূর-ই আক্রামের আকৃতি মুবারক কল্পনা করবে যেন হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর রওযা-ই আক্বদাসে আরাম করছেন এবং তার সম্পর্কে হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানেন ও তার কথা শুনেন।

ঈমানদার ব্যক্তিদের কবর যিয়ারতের সময় দাঁড়িয়ে কবরকে সামনে রেখে ফাতেহা পাঠ ও দো'আ করা সুন্নাত। যেমন, 'ফাত্ওয়া-ই আলমগীরী: বাবু যিয়ারাতি ক্বুবূরিল আম্বিয়া'য় আছে-

يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ ثُمَّ يَقِفُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلاً لِوَجْهِ الْمَيِّتِ

অর্থাৎ "(প্রথমে) যিয়ারতকারী তার পাদুকা দু'টি খুলবে, তারপর ক্বেবলাকে পিঠ দিয়ে এবং কবরস্থ ব্যক্তির চেহারাকে সামনে রেখে দাঁড়াবে।"

হুযূর-ই আকরামের রওযা-ই পাক যিয়ারত- ঝমঝমের পানি পান করা, ওযূর অবশিষ্ট পানি পান করা এবং ঈমানদারদের কবর যিয়ারত সবগুলোই ইসলামের দৃষ্টিতে বরকতময় কাজ। ফলে এগুলোর প্রতি সম্মান দেখিয়ে ক্বিয়াম করা বা দাঁড়ানো শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হলো।

যখন কোন ধর্মীয় পেশ্ওয়ার আগমন হয়, তখন তাঁর জন্য দাঁড়ানো সুন্নাত। এভাবে ওই দ্বীনী পেশ্ওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্নাত; বসে থাকা বেয়াদবী। যেমন হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-ই কেরামকে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আগমনে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়ে বলেন, قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ (তোমরা উঠো, তোমাদের সরদারের দিকে এগিয়ে যাও।) এ ক্বিয়ামটা তা'যীমি ক্বিয়াম। যেহেতু, এখানে سَيِّدِكُمْ (তোমাদের সরদার) বলে তা'যীমের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অন্য কোন ওযরের কারণে যদি দাঁড়ানোর কথা আসত তাহলে- سَيِّدِكُمْ বলতেন না; ঘোড়া থেকে তাকে নামিয়ে আনার জন্য দু'/একজন সাহাবী যথেষ্ট হতো। সবাইকে যখন হুকুম দিলেন দাঁড়ানোর জন্য এবং سَيِّدِكُمْও বলেছেন, তখন বুঝা গেল যে, এ ক্বিয়াম 'তা'যীমী ক্বিয়াম। সুতরাং এ ক্বিয়াম এমদাদ বা সাহায্য করার ক্বিয়াম নয়। আর যদি امداد বা সাহায্য করার জন্য ক্বিয়াম হতো তাহলে اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ -এর মধ্যে যে ক্বিয়ামটার কথা এরশাদ হয়েছে, তা নামাযের সাহায্যের

জন্য হতো; কিন্তু নামাযের সাহায্যের প্রয়োজন নেই; যেহেতু, নামায রোগী নয়; বরং নামাযের সম্মানের জন্য কথাটা বলা হয়েছে।

তাছাড়া, 'মিশকাত শরীফ, বাবুল ক্বিয়াম'-এ আছে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত-

فَاِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزْوَاجِهٖ

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন কোন মজলিসে দাঁড়াতেন, তখন আমরাও তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতাম, যতক্ষণ না তিনি কোন বিবি সাহেবার হুজুরায় প্রবেশ করতেন।

দুররে মুখতার ৫ম খন্ড, বাবুল ইসতেবরায় বর্ণিত আছে-

يَجُوْزُ بَلْ يُنْدَبُ الْقِيَامُ تَعْظِيْمًا لِلْقَادِمِ يَجُوْزُ الْقِيَامُ وَلَوْ لِلْقَارِئِ بَيْنَ يَدَى الْعَالِمِ

অর্থাৎ কোন আগমনকারীর সম্মানার্থে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। এমনকি কোন ক্বোরআন তেলওয়াতকারীর সম্মুখে কোন সঠিক সুন্নি আক্বিদাসম্পন্ন আলেমে দ্বীন আসলে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়েয তথা মুস্তাহাব।

'রদ্দুল মুহতার' (ফতাওয়া-ই শামী), ১ম খন্ড, বাবুল ইমামত-এ আছে, যদি কেউ মসজিদের প্রথম সারিতে বসে জামা'আতের অপেক্ষা করে, এমতাবস্থায় যদি কোন সুন্নী আলেম আসেন, তবে তাঁর জন্য স্থান ত্যাগ করে পেছনে চলে আসা মুস্তাহাব। কেননা, তাঁর জন্য প্রথম সারিতে নামায পড়ার চেয়ে এ সুন্নী আলিমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উত্তম। যেমন হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নামাযরত অবস্থায় জায়নামায হতে ইমামতি ত্যাগ করে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে পেছনে সরে আসেন।

'মুসলিম শরীফ, ২য় খন্ড' বাবূ হাদীসি তাওবাতি ইবনে মালেক'-এর মধ্যে আছে-

فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِىْ وَهَنَّاَنِىْ

অর্থাৎ হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ দাঁড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ দিলেন। ইমাম নববী বলেন,

فِيْهِ اِسْتِحْبَابُ مُصَافَحَةِ الْقَادِمِ وَالْقِيَامِ لَه اِكْرَامًا اِلٰى لِقَائِه

অর্থাৎ আগমনকারীর জন্য মুসাফাহা করা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ানো এবং সাক্ষাতের জন্য একটু দ্রুত যাওয়া মুস্তাহাব।

মিরক্বাত শরহে মিশকাত بَابُ الْمَشْىِ بِالْجَنَازَةِ -এর মধ্যে ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, وَفِيْهِ اِيْمَاءٌ اِلٰى نُدْبِ الْقِيَامِ لِتَعْظِيْمِ الْفُضَلَاءِ الْكُبَرَاءِ অর্থাৎ এতে

এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন সম্মানিত ব্যক্তির জন্য তা'যীমী ক্বিয়াম মুস্তাহাব।

সাহাবা-ই কেরাম তথা সলফে সালেহীন থেকে এ সুন্নাত বা প্রথা চালু আছে যে, কোন সুসংবাদ শুনলে তাঁরা দাঁড়িয়ে যেতেন। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আমাকে হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি সুসংবাদ শুনালেন, তখন- فَقُمْتُ اِلَيْهِ وَقُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَنْتَ اَحَقُّ بِهَا অর্থাৎ আমি তাঁর প্রতি দাঁড়িয়ে গিয়ে বললাম, "আপনার উপর আমার পিতামাতা ক্বোরবান! এ সুসংবাদের আপনিই উপযুক্ত।"

পাঁচ. ক্বিয়াম-ই মাকরূহ: তা হলো ঝমঝম শরীফের ও ওযূর অবশিষ্ট পানি ব্যতীত অন্য কোন পানি দাঁড়িয়ে পান করা এবং কোন দুনিয়াবী সম্মানের জন্য দন্ডায়মান হওয়া (দুনিয়ার লালসায় দাঁড়ানো) মাকরূহ। হ্যাঁ, যদি কোন ওযর থাকে তখন মাকরূহ হবে না। যেমন, ফাতাওয়া-ই আলমগীরী: كِتَابُ الْكَرَاهِيَّةِ (কিতাবুল কারাহিয়্যাহ)-এর মধ্যে আছে- وَاِنْ قَامَ لَه مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْوِىَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا اَوْ قَامَ طَمْعًا لِغِنَاهُ অর্থাৎ আর যদি কেউ আমাদের উল্লিখিত বিষয়াদি থেকে কোন একটার নিয়্যত করা ছাড়া অথবা তার ধনী হবার কারণে দাঁড়ানো মাকরূহ।

ছয়. ক্বিয়াম-ই হারাম: আর তা হলো- যে ব্যক্তি চায় যে, তাকে সম্মান করা হোক, তার জন্য দাঁড়ানো হারাম। তাছাড়া, মূর্তির তা'যীমের জন্য দন্ডায়মান হওয়াও হারাম।

পর্যালোচনা

উপরোল্লিখিত ক্বিয়ামসমূহের মধ্যে চতুর্থ প্রকারের ক্বিয়াম সাহাবা-ই কেরাম ও সলফে সালেহীনের সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত। অর্থাৎ কোন সুসংবাদ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দন্ডায়মান হওয়া সাহাবা-ই কেরাম ও সলফে সালেহীনের সুন্নাত সাব্যস্ত হয়েছে। সে অনুপাতে মিলাদ শরীফে হুযূর-ই আক্বরামের বেলাদতে পাকের আলোচনা করার পর এ সুসংবাদ শুনার সাথে সাথে ক্বিয়াম করা সাহাবা ও সলফে সালেহীনের সুন্নাত হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, হুযূর-ই আক্বরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বেলাদত শরীফের সুসংবাদ হতে বড় সুসংবাদ আর কি হতে পারে? পাশাপাশি কোন দ্বীনি সম্মানিত বস্তুর সম্মানের জন্য ক্বিয়াম করার কথাও উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঝমঝম শরীফের পানি, ওযূর অবশিষ্ট পানি পান করার সময় দন্ডায়মান হয়ে পান করা। অনুরূপ, হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদে পাকের

আলোচনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর চেয়ে বেশি খুশির খবর আর কি হতে পারে? আর খুশির সংবাদ শুনার সাথে সাথে ক্বিয়াম করা সুন্নাত। হুযূর-ই আক্বরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে মুসলমানের নিকট অধিকতর প্রিয় কি হতে পারে? তাঁর শুভ বেলাদতের সময় ফেরেশতারা দন্ডায়মান ছিলেন। সেই ফেরেশতাদের সম্মানসূচক ক্বিয়ামের মতো আমরাও বেলাদতে পাকের কথা স্মরণ করে ক্বিয়াম করি এবং ফেরেশতাদের সুন্নাতটুকু পালন করি। উপরন্তু হুযূর-ই আক্বরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের গুণাবলী ও বংশের বিবরণ (যা মীলাদ শরীফে বর্ণনা করা হয়), মিম্বর শরীফের উপর দাঁড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। [মিশকাত, বাবু ফাযা-ইলি সাইয়্যিদিল মুরসালীন]

ইসলামী শরীয়তের মধ্যেও এ ক্বিয়ামের বিপক্ষে কোন বর্ণনা নেই। পৃথিবীর সকল দেশের সুন্নী মুসলমানরা সাওয়াব মনে করে ক্বিয়াম করেন, হুযূর-ই আক্বরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে।

হাদীসে পাকে রয়েছে-

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَلاَ تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلاَلَةِ

অর্থাৎ (সুন্নী) মুসলমানেরা, যা উত্তম মনে করে তা আল্লাহর নিকটও উত্তম হিসেবে সাব্যস্ত এবং আমার উম্মত কোন গোমরাহীর উপর একমত হবে না।

[মিরক্বাত, বাবুল ই'তিসাম]

এখানে মুসলমান ও উম্মত বলতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর অনুসারী সুন্নী মুসলমানদের কথা বুঝানো হয়েছে। দুররুল মুখতার, ২য় খন্ড, কিতাবুল ওয়াক্বফ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

لِاَنَّ التَّعَامُلَ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ لِحَدِيْثِ مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

অর্থাৎ মুসলমানের কর্মকান্ড যদি শরীয়ত বিরোধী না হয়, তবে প্রচলনটা শরীয়তের অংশ হিসেবে গণ্য হবে এবং এটা দ্বারা قِيَاس (ক্বিয়াস)কে বর্জন করা যাবে উক্ত হাদীসের আলোকে। তাই সাধারণ সুন্নী মুসলমানরা যখন 'মীলাদের ক্বিয়াম'কে জায়েয এবং মুস্তাহাব মনে করছেন, তখন উক্ত হাদীসের আলোকে এটাও মুস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। আর হুযূর-ই আক্বরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তা'যীমের ব্যাপারে- تُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ বলে স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ আছে। যেখানে কোন সময় বা স্থানের নির্দিষ্টতা নেই, তখন সাধারণ ব্যাপকতার মাধ্যমে হুযূর-ই আক্বরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর তা'যীমের জন্য যত পদ্ধতি হতে পারে সব ক'টিই উক্ত

আয়াতাংশে শামিল আছে। এ অনুপাতে 'এ 'মীলাদের ক্বিয়াম' সম্পর্কে বিশ্বের বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরাম জায়েয এবং মুস্তাহ্সান হওয়ার ফাত্ওয়া দিয়েছেন।

এছাড়া, পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এর পিতা শাহ্ আবদুর রহিম দেহলভী (ওফাত ১২৮৮হি.) তাঁর কিতাব- رَوْضَةُ النَّعِيْم فِىْ ذِكْرِ النَّبِىِّ الْكَرِيْم (রাওদ্বাতিন না'ঈম ফী- যিক্রিন নাবিয়্যিল করীম)-এর মধ্যে মক্কা মুকাররমার ৪২ জন মুফতীর ফতোয়া, মদীনা মুনাওয়ারার ৩০ জন, জিদ্দার ২০ জন, হাদীদার ১২ জন মুফতীর ফতোয়াসমূহ উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হল যে, যারা মীলাদে পাক ও ক্বিয়াম-ই তা'যীমী অস্বীকার করবে তারা মূলত বদ-আক্বিদা তথা খারেজী। সেখানে শরীয়তের হাকিমদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেন এ ক্বিয়াম বিরোধী বিদ'আতীদের শাস্তি প্রদান করা হয় নবীর তা'যীমের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে। [আন্ওয়ার-ই আফতাবে সাদক্বাত, পৃ.৩৩৮]

উপরোল্লিখিত বিশ্ব বরেণ্য ওলামা-ই কেরামের ফাত্ওয়ার মাধ্যমে মীলাদে পাকের মধ্যে ক্বিয়াম 'মুস্তাহসান' ও 'মুস্তাহাব' সাব্যস্ত হল, বিদ'আত নয়। আর যদি বিদ'আত বলে ইনকার করে, তখন এ বিদ'আতীদের বিদ্'আতের খন্ডনে সুন্নী মুসলমানদের উপর 'মীলাদ-ক্বিয়াম' করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যেমন শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়াহ্ মুফতী হাম্বলী (মক্কা মুকাররমা) বলেন-

يَجِبُ الْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا اسْتَحْسَنَ عُلَمَاءُ الْعَالَمِ وَقُدْوَةُ الدِّيْنِ وَالْاِسْلَامِ فَنَكَرُوْا عِنْدَ وِلَادَتِهِ يَجِبُ الْقِيَامُ لِلتَّعْظِيْمِ

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করা ওয়াজিব, যখন বিশ্বের আলিমগণ, দ্বীন ইসলামের পেশওয়াগণ সেটাকে 'মুস্তাহ্সান' তথা উত্তম ও সাওয়াবের কাজ বলেছেন। সুতরাং হুযূর-ই আক্রামের মীলাদের আলোচনার সময় ক্বিয়াম করাকে তারা তা'যীমের জন্য ওয়াজিব বলে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং সাধারণত সুন্নী মুসলমানগণ মীলাদ পাঠান্তে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে ক্বিয়ামের মাধ্যমে সালাম পেশ করে। এটাই মুস্তাহ্সান। আর যখন ওই পরিবেশে ক্বিয়ামের কোন বিরুদ্ধাচরণকারী বিরোধিতা ও অস্বীকার করবে এবং বিদ্'আত বলে ফাত্ওয়া দেবে, তখনই ওই অবস্থায় সুন্নী মুসলমানের জন্য ক্বিয়াম করা ওয়াজিব। যেমন কোন মুস্তাহাব কাজকে যদি অস্বীকার করা হয়, তখন তা ওয়াজিবে পরিণত হয়। যথা উসূলে ফিক্বহ্র একটি নীতিমালা ও ধারা আছে যে, يَتَبَدَّلُ الْحُكْمُ بِتَبَدُّلِ الزَّمَانِ অর্থাৎ স্থান ও কালের পরিবর্তনের ফলে হুকুমের ধারারও পরিবর্তন হয়। ---০---

।।দুই।।

ইসলামে ফাতেহার গুরুত্ব

ইসলামের নামে বিভিন্ন বাতিল ফির্ক্বা সৃষ্টি হয়ে তারা অনেক সাওয়াবদায়ক, বৈধ ও নেক আমল নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছে। ক্বোরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা অনেক নেক আমলকে মন্দ বিদ্'আত বলে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পক্ষ থেকে যুগে যুগে ওই বাতিলপন্থীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদানের মাধ্যমে সঠিক মাসআলা উপস্থাপন করার প্রয়াসও চলমান আছে ও থাকবে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে ইসলামী অনুষ্ঠানাদির আরো কিছু মাসআলা ক্বোরআন, সুন্নাহ ও ইমামদের মতামতের মাধ্যমে পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি। এমন উপকারী অনুষ্ঠানাদির মধ্যে 'ফাতিহা' অন্যতম।

'ফাতিহা'-এর অর্থ হলো উম্মুক্ত করা। পরিভাষার মধ্যে 'ফাতিহা' ক্বোরআনের সূরা- ফাতিহাকে 'ফাতিহা' বলা হয়। অনুরূপ কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলেও তার দাফনের তিন দিন শোক পালনের পর খানা-পিনা ও ফলাহারের আয়োজন করে সেখানে সূরা ফাতিহাসহ ক্বোরআন মাজীদের আরো কিছু আয়াত ও সূরা তেলাওয়াত এবং যিক্র-আযকার ও মীলাদ পাঠ করে মুনাজাতের মাধ্যমে এগুলোর সাওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে পৌঁছিয়ে দেওয়াকে ফাতেহা বলা হয়। ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে দৈহিক ও আর্থিক এবাদতের সাওয়াব অন্য ঈমানদারকে বখশিশ করা জায়েয। ক্বোরআন মাজীদে ঈমানদারদের জন্য একে অপরের অনুকূলে দো'আ করার হুকুম রয়েছে। এমন কি জানাযার নামায মৃত ব্যক্তির দো'আর জন্য আদায় করা হয়।

ফাতিহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী অনুষ্ঠান

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম। এতে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের কর্ম বিধান রয়েছে। যে কর্মগুলো আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তথা ক্বোরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে এ উম্মতের জন্য প্রদান করা হয়েছে। বিনিময়ে পরকালে সাওয়াব প্রদানের সু সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এক কথায় আমলসমূহকে সালিহাত (صالحات) তথা সৎকর্মসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ নেক আমলসমূহের জন্য আমলকারীর ঈমানকে আবশ্যক ও পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করা

হয়েছে। ঈমান ব্যতীত কোন নেক আমল তথা ফরয, ওয়াজিব সুন্নাত, মুস্তাহাব, শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানবিহীন আমলের কোন সাওয়াব আল্লাহর পক্ষ থেকে না পাওয়া শরীয়তের সিদ্ধান্ত। ইসলামের নেক আমলসমূহের মধ্যে কিছু আমল সরাসরি ক্বোরআন-সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত। যেমনঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, জিহাদ বা পারিবারিক কার্যক্রম ইত্যাদি। আর কিছু আমল ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে শরীয়তের মৌলিক নিয়মাবলীর অনুসরণে সাব্যস্ত হয়েছে, মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদের মাধ্যমে নেক আমল বলে সাব্যস্ত করেছেন।

হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুপ খনন করে বলেন- هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ অর্থাৎ এটা উম্মে সা'দের কূপ। এ হাদীস শরীফের আলোকে ফক্বীহ্গণ ঈসালে সাওয়াব করা (সাওয়াব পৌঁছানো)-এর পক্ষে অভিমত দিয়েছেন; কিন্তু শারীরিক ইবাদতগুলোর মধ্যে নামায, রোযা ইত্যাদির বদলা অর্থাৎ অন্য কেউ আদায় করলে হবে না; কিন্তু হজ্জ্বের মধ্যে স্থলাভিষিক্ত বা বদলী করা জায়েয- ইবাদতে মালীও (আর্থিক ইবাদত) সামিল থাকার কারণে। যা হোক নামায রোযা সম্পন্ন করার মধ্যে বদলী জায়েয না হলেও এর সাওয়াব অন্য কাউকে দেওয়া যাবে। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

مَنْ يَضْمَنُ لِىْ مِنْكُمْ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُوْلُ هٰذِه لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কে আমার জন্য আশ্শার মসজিদে দু'রাক্'আত নামায পড়ে বলবে এটা আবূ হুরায়ার জন্য, এ আমলের কে জিম্মাদার হবে?" এটা দ্বারা বুঝা গেলো যে, ঈসালে সাওয়াব করা শরীয়ত মতে জায়েয।

এ ঈসালে সাওয়াবের শাখাসমূহের মধ্যে ফাতিহা দেয়া, যেমন, কারো মৃত্যুর পর চার দিনের ফাতিহা, দশ দিনের ফাতিহা, চেহলাম বা চল্লিশা এবং বার্ষিক ফাতিহা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আর ফাতিহার মধ্যে ক্বোরআন তিলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ, যিক্র-আয্কার করা, সাথে সাথে সদক্বাহ্-খয়রাত এবং খানা-পিনার ব্যবস্থার মাধ্যমে সবগুলোর সওয়াব সমস্ত নবী, ওলী, মু'মিন-মু'মিনাত, বিশেষত মৃত ব্যক্তি, যার উপলক্ষে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, তার রূহে বখ্শিশ করা হয়।

ফাতিহার দলীলঃ 'সূরা আন্'আম- وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে-

عَنْ حُمَيْدِ نِ الْاَعْرَجِ قَالَ مَنْ قَرَءَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ دَعَا اَمَّنَ عَلٰى دُعَآئِه اَرْبَعَةُ الاٰفِ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَزَالُوْنَ يَدْعُوْنَ لَه وَيَسْتَغْفِرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ اِلَى الْمَسَاءِ اَوْاِلَى الصَّبَاحِ

অর্থাৎ: হযরত হুমাইদুল আ'রাজ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ক্বোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করে ও খতম দিয়ে দো'আ করবে, তার ওই দো'আর সাথে চার হাজার নূরানী ফেরেশতা আমীন বলে। এরপর ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত অথবা সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই ব্যক্তির জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দো'আ করতে থাকে।

প্রতীয়মান হল যে, খতমে ক্বোরআনের সময় দো'আ ক্ববূল হয়। আর ঈসালে সাওয়াবই দো'আ। তাই সেখানে খতমে ক্বোরআন পড়া উত্তম।

দুররে মুখতার- بَابُ الدَّفْن -এ- قِرَاةٌ لِّلْمَيِّتِ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَفِى الْحَدِيْثِ مَنْ قَرَءَ الْاِخْلاَصَ اَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهَا لِلْاَمْوَاتِ اُعْطِىَ مِنَ الْاَجْرِ بِعَدَدِ الْاَمْوَاتِ

অর্থাৎ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি ১১ বার সূরা ইখলাস পাঠ করে এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের রূহে পৌঁছাবে তাকে মৃতদের সংখ্যানুপাতে সাওয়াব দেয়া হবে।

উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে-

وَيُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاتَيَسَّرَلَه مِنَ الْفَاتِحَةِ وَاَوَّلُ سُوْرَةِ الْبَقْرَةِ اِلَى الْمُفْلِحُوْنَ وَاٰيَةُ الْكُرْسِىِّ وَاٰمَنَ الرَّسُوْلُ وَسُوْرَةُ يٰس وَتَبَارَكَ الَّذِىْ وَسُوْرَةُ التَّكَاثُرِ اِثْنَىْ عَشَرَةَ مَرَّةً اَوْاِحْدٰى عَشَرَةَ اَوْ سَبْعًا اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَوْصِلْ ثَوَابَ مَاقَرَأْنَا اِلٰى فُلاَنٍ اَوْ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ এবং ক্বোরআন মজীদ থেকে পড়া হবে যা পড়া তার জন্য সহজ হবে; যেমন- সূরা ফাতিহা, সূরা বাক্বারার শুরুর আয়াতগুলো। 'আল মুফলিহূন' পর্যন্ত, আয়াতুর কুরসি, আ-মানার রসূলু..., সূরা ইয়া-সীন, তাবা-রাকাল্লাযী, সূরা তাকাসূর, ১২ বার, অথবা এগারবার, অথবা সাতবার অথবা তিনবার, অতঃপর বলবে, 'আল্লা-হুম্মা..., 'অর্থাৎ হে আল্লাহ্, আমরা যা পড়লাম তার সাওয়াব অমুক অথবা অমুকের প্রতি পৌঁছিয়ে দাও!

তথা শরীয়তের এসব বিধানের গ্রন্থাবলীর ইবারতের মধ্যে প্রচলিত ফাতিহার নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে।

এভাবে হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফক্বীহ্ শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী বর্ণনা করেন, যে খাবার হযরত ইমাম হাসান ও হযরত হুসাইনের ফাতিহা-নিয়াযের নিয়্যতে হাযির করা হয় এবং সেখানে চার ক্বুল, সূরা ফাতিহা, ও দুরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, তা অধিক বরকতময়। তিনি আরো উল্লেখ করেন, কোন বুযুর্গ ওলীউল্লাহ্র ফাতেহা উপলক্ষে দুধ, শিরনী ইত্যাদি তৈরী করে খাওয়ানো শরীয়ত মতে জায়েয।

শাহ্ অলিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী ইন্তিক্বালের ৩য় দিনে ফাতিহা প্রদান প্রসঙ্গে শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী বর্ণনা করেন যে, ৩য় দিনে এত লোকের সমাগম হল, যা গণনার বাইরে ছিল। সেখানে ৮১ বার-এর অধিক খতমে ক্বোরআন এবং অসংখ্য তাহলীল পাঠ করা হয়েছে।

ফাতিহার আরেকটি নিয়ম, খাবার সামনে রেখে কিছু সূরা-ক্বির্'আত, দুরূদ শরীফ পাঠ করে হাত উঠিয়ে দো'আ করা এবং ওইগুলোর সাওয়াব নবী, ওলী ও মু'মিনগণকে বখশিশ করা। এই প্রচলিত নিয়মটি বিভিন্ন হাদীসে পাকের মাধ্যমে সাব্যস্ত। ফলে এটা শরীয়ত মতে এ সুন্নাতের পর্যায়ে পড়ে।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কিছু খেজুর হুযূর-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিয়ে আসলাম এবং এর বরকতের জন্য দো'আ করতে আরয করলাম, তখন- فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَالِىْ فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ খেজুরগুলো নিয়ে মিশালেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করছেন।

তাবূকের যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের রসদ ফুরিয়ে এলো। তখন হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, যার কাছে যা অল্প-স্বল্প রসদ আছে, তা নিয়ে এসো। দস্তরখানা বিছানো হলো। সেখানে সকলেই কিছু কিছু রসদ রাখলেন-

فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِىْ اَوْعِيَتِكُمْ

অর্থাৎ ওই উপস্থিত রসদের উপর বরকতের দো'আ করলেন এবং বললেন, "এখান থেকে তোমরা তোমাদের পাত্রে নিয়ে যাও।"

হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শাদীর প্রাক্কালে উম্মে সুলায়ম (হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাতা) ওয়ালীমা হিসাবে কিছু খাবার তৈরী করলেন, অনেক লোকজনকে দাওয়াত করা হল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

وَضَعَ يَدَه عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَاشَآءَ اللهُ

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই খাবারের উপর হাত রেখে কিছু পড়লেন।

এভাবে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সামান্য খাবার তৈরী করে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলেন। হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-ই কেরামকে নিয়ে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাড়ীতে তাশরীফ আনলেন। فَاَخْرَجَتْ لَه عَجِيْنًا فَبَصَقَ فِيْهِ وَبَارَكَ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সামনে খামিরা পেশ করা হলো। সেখানে হুযূর-ই আক্রাম 'লু'আব মুবারক' অর্থাৎ থুথু শরীফ দিলেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করলেন।

এভাবে আরো ফাতিহার অনেক দলীল রয়েছে, যেগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফাতেহা দেয়া শুধু বৈধ নয়; বরং তা অনেক বরকত হাসিলের ওসীলাও।

আর আমরা মুসলমান সদা-সর্বদা বরকতের মুখাপেক্ষী। তাছাড়া ফাতিহার মধ্যে দু'ধরনের ইবাদতের সংমিশ্রণ হয়ঃ তিলাওয়াতে ক্বোরআন ও যিক্র এবং সদক্বা-খয়রাত। এ উভয় কাজ পৃথকভাবেও সাওয়াবের হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ফাতিহার মধ্যে এ দুই ইবাদতকে একত্রিত করা হয়। তাই এটা কিভাবে হারাম হয়? কোন ঈমানদার ব্যক্তি এটাকে হারাম ও অবৈধ বলতে পারে না। আর যদি বলে, তবে শরীয়তে হালাল বস্তুকে হারাম বললে যে অপরাধ হয়, সে অপরাধে অপরাধী হবে। এমনকি তার ঈমানের ব্যাপারেও সন্দেহ থাকবে। বিরানী খাওয়া ক্বোরআনের ও হাদীসের সরাসরি দলীল দ্বারা সাব্যস্ত নয়; কিন্তু তা হালাল হলো এ কারণে যে, বিরানী তো চাউল, গোশত এবং ঘি-মসল্লা ইত্যাদি দিয়ে পাকানো হয়। এসব ক'টি বস্তুই হালাল খাবার। এভাবে ফাতিহায়ও হালাল খাবার তৈরী করা হয়; তারপর ক্বোরআন তেলাওয়াত ও যিক্র-আযকার করা হয়। পরিশেষে, দো'আ ও ঈসালে সাওয়াব করা হয়। যেহেতু এ সব বস্তু পৃথক পৃথকভাবে জায়েয, সুতরাং সম্মিলিতভাবেও জায়েয।

ফাতেহার খাবারকে সামনে রেখে দো'আ করা সুন্নাত। (উপরে উল্লেখিত বর্ণনাদি দ্বারা সাব্যস্ত;) যেমনিভাবে জানাযার নামাযে মৃতকে সামনে রেখে নামায ও দো'আ করা হয়, অনুরূপভাবে কবরকে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে যিয়ারত ও দো'আ

করা হয়; যা হাদীসে পাক দ্বারা সাব্যস্ত। হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বোরবানীর ছাগল জবেহ করার পর সামনে- اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলে দো'আ করেছেন।

ফাতিহার মধ্যে যদি খাবার সামনে রেখে ঈসালে সাওয়াব করা হয়, তাহলে শরীয়তের পক্ষ থেকে বাধা কিসের? কোন ঈমানদার নিষেধের পক্ষে যাবে না। আর যদি বলা হয় 'বিসমিল্লাহ্' বলে খাবার শুরু করলে ফাতিহা হয়ে যায়, প্রচলিত ফাতিহার প্রয়োজন নেই, তখন বলা যাবে 'বিসমিল্লাহ্'ও ক্বোরআন শরীফের আয়াত। খাবারের সামনে ক্বোরআন পাঠ করে ফাতিহা দেয়া যদি নিষেধ হয়, তাহলে খাবারের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্' পড়াও নিষেধ হবে। সম্ভবত ফাতিহার বিরোধিরা বিস্মিল্লাহ পড়াও বাদ দেয়, তাদের সঙ্গী শয়তানকে শরীক করার জন্য।'

মোটকথা, ফাতেহা ইসলামী অনুষ্ঠানাবলীর অন্যতম অনুষ্ঠান, যা ১৪০০ বছরাধিকাল যাবৎ ঈমানদাররা পালন করে আসছেন। সুতরাং এটা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো।

এ ফাতেহা বিভিন্ন নামে প্রচলিত যথা- ৪ দিনের ফাতেহা, ১০ দিনের ফাতেহা, ৪০ দিনের ফাতিহা, বাৎসরিক ফাতেহা, নতুন নতুন ফলাদির ফাতেহা ইত্যাদি। এ সব ফাতেহাও বরকতের ওসীলা হয়।[◆]

---o---

◆ ১. মিশকাত, বাবু ফদ্বলিস সাদকাহ্, ২. মিশকাত, বাবুল মোলাহেম, ২য় অধ্যায়, ৩. তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৭ম খন্ড, ৪. দুররে মুখতার, ৫. দুররে মুখতার, ৬. ফতোয়া-ই আজিজিয়া, পৃ. ৪১ ও ৭৫, ৭. মালফুযাতে শাহ্ আবদুল আজিজ, পৃ. ৮০, ৮. মিশকাত, মু'জিযা অধ্যায়, ৯. মিশকাত, মু'জিযা অধ্যায়, ১০. মিশকাত, মু'জিযা অধ্যায়, ১১. মিশকাত, মু'জিযা অধ্যায়।

।। তিন ।।

সালাত ও সালাম প্রসঙ্গে

সালাত ও সালামের প্রচলিত অর্থ দুরূদ শরীফ পাঠ করা। ক্বোরআন মাজীদে দুরূদ শরীফের আয়াতে صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا এর মাধ্যমে দুরূদ শরীফ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য সালাত ও সালাম এক সাথে হওয়ার বিধানও স্পষ্ট। এ জন্য মুহাক্বক্বিক্বগণ দুরূদ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে সালাত ও সালাম দু'টাকেই একত্রিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম বদর উদ্দীন 'আইনী শুধু সালাত উল্লেখ করে দুরূদ শরীফ পড়াকে মাকরূহ বলেছেন; বরং বলেছেন, "সালাতের সাথে সালামকেও উল্লেখ করতে হবে।"

ইমাম সাভী বলেন, "সালাত ও সালাম উভয় উল্লেখ করতে হবে।"

ইমাম নাওয়াভী ও সালাম ছাড়া শুধু সালাত দিয়ে দুরূদ শরীফ পড়া মাকরূহ বলেছেন। এভাবে আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী 'জাযবুল ক্বুলূব'-এর মধ্যে অধিকাংশ আলিমের মতে সালাম ছাড়া সালাত দিয়ে দুরূদ পড়াকে মাকরূহ বলেছেন। নামাযে দুরূদে ইব্রাহীমীর মধ্যে সালাম না থাকলেও তাশাহ্হুদের সালামের সাথে মিলিত হবার কারণে পূর্ণ দুরূদে পরিণত হয়েছে। এ জন্য নামাযের বাইরে দুরূদে ইব্রাহীমী সালাম ব্যতীত পড়াকে ফক্বীহ্গণ মাকরূহ বলেছেন। তাফসীর-ই ইবনে কাসীরে ইমাম নাওয়াভীর বর্ণনার উপর আলোকপাত করে এবং ক্বোরআনে পাকের আয়াতের হুকুমের প্রতি নযর রেখে বলেন, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا

ইমাম শাযলী বেশি পরিমাণে দুরূদে ইব্রাহীমী পড়তেন। স্বপ্নে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পূর্ণ দুরূদ শরীফ পড়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। ওই দুরূদ শরীফ হল দুরূদে ইব্রাহীমী এবং এর সাথে এটা সংযোজন করার জন্য নির্দেশ দিলেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه তাই দুরূদে ইব্রাহীমী সালাম সহকারে পড়লে পূর্ণ দুরূদ শরীফ হবে। পাশাপাশি দুরূদ শরীফের মধ্যে নবী করীমের বংশধরদেরকেও উল্লেখ করার তাকীদ এসেছে। যেমন বর্ণিত আছে- হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لُوْا عَلَى الصَّلَاةَ الْبَتْرَاءَ فَقَالُوْا وَمَا الصَّلَاةُ الْبَتْرَاءُ قَالَ تَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَتُمْسِكُوْنَ بَلْ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَ لَى ال مُحَمَّدٍ

অর্থাৎ তোমরা আমার উপর অসম্পূর্ণ দুরূদ শরীফ পড়ো না। সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, ''হুযূর, অসম্পূর্ণ দুরূদ কি রকম?'' উত্তরে হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''তোমরা- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিন) বলে শেষ করে দাও আর আমার বংশধরদেরকে উল্লেখ করছ না; বরং দুরূদ শরীফ পড়ার সাথে সাথে আমার বংশধরদেরকেও উল্লেখ করবে।

আমাদের পাক ভারত উপমহাদেশে সালাত ও সালাম পাঠ করার অর্থ মীলাদ শরীফ পাঠ করাকে বুঝায়। মীলাদ শরীফ-এর মর্মার্থ হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফ সম্বলিত দুরূদ শরীফের মাধ্যমে পাঠ করা।

পরিশেষে, ক্বিয়ামের মাধ্যমে সালাত ও সালাম পেশ করা, প্রত্যেক শুভ কাজের জন্য এ সালাত ও সালামের ব্যবস্থা করা অতি উত্তম কাজ এবং অধিক বরকতময়। সে হিসেবে এ উপমহাদেশে তা নিয়মিতভাবে সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আসছে। এ হিসাবে এ নিয়মে সালাত ও সালাম পাঠ করাও ইসলামী অনুষ্ঠানাদির অন্যতম কাজ বা অনুষ্ঠান।

---o---

।। চার ।।

মুনাজাত ও দো'আ

'মুনাজাত'-এর অর্থ চুপে চুপে মনের কথা আপন প্রিয়ের নিকট পেশ করা। শরীয়তের পরিভাষায়, কোন প্রয়োজন কিংবা সমস্যা নিয়ে নিজ মুনিব আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করাকে মুনাজাত বা দো'আ বলা হয়। এ মুনাজাত বা দো'আ এক পর্যায়ে এবাদতই। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ...

তরজমা: ''এবং তোমাদের রব এরশাদ করেন, আমার নিকট দো'আ-মুনাজাত করো, আমি ক্ববূল করব। যারা আমার ইবাদত তথা দো'আ-মুনাজাত থেকে বিরত থাকে, অহংকারবশত, তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে যাবে। আর হে! আমার হাবীব! আমার বান্দারা আপনাকে আমার অবস্থানের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছে, তাদেরকে বলে দিন, 'আমি তাদের নিকটেই। আমাকে আহবানকারীর আহ্বানে (তা ক্ববূলের মাধ্যমে) সাড়া দিই। তারা যেন (আপনার মাধ্যমে) আমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং আমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। নিশ্চয়ই তখন তারা সঠিক পথ পাবে।''

এ আয়াত দ্বারা দো'আ ও মুনাজাত আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য এবাদাত হওয়াই সাব্যস্ত হল।

হাদীসে পাকে উল্লেখ আছে-

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ الخـ

অর্থাৎ হযরত নো'মান ইবনে বশীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, ''দো'আ এবাদতই।'' এরপর তিনি 'সূরা গাফির'-এর ৬০ নম্বর (উপরোল্লিখিত) আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।

আরো বর্ণিত আছে- قَالَ لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে দো'আ ও মুনাজাতের চেয়ে আর কোন বস্তু অধিক সম্মানিত নেই।

হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ سَرَّه اَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللهُ لَه عِنْدَ الشَّدَآئِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَآءَ فِى الرَّخَآءِ

অর্থাৎ দুঃখ ও দুর্দশার অবস্থায় দো'আ আল্লাহর দরবারে ক্ববূল হোক-এটা যে ব্যক্তি আশা রাখে, সে যেন স্বাভাবিক বা সচ্ছল অবস্থায় অধিকহারে দো'আ-মুনাজাত করে।

হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন- اَلدُّعَآءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দো'আ-মুনাজাতই ইবাদতের মগজ বা সারবস্তু। হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন- لاَ يَرُدُّ الْقَضَآءَ اِلاَّ الدُّعَآءُ الخ অর্থাৎ দো'আর দ্বারাই তাক্বদীর বদল হয়।

এভাবে দো'আ ও মুনাজাতের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীসে পাক রয়েছে। সুতরাং দো'আই আল্লাহর দরবারে গ্রহণীয় ইবাদত।

দো'আর মধ্যে হাত উঠানো প্রসঙ্গেও অনেক হাদীসে পাক বর্ণিত আছে। যেমন হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত-

دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَاَيْتُ بَيَاضَ اِبِطَيْهِ

অর্থাৎ হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দো'আ করার সময় হাত মোবারক উত্তোলন করেন। তখন তাঁর দু'বগল শরীফের শুভ্রতা দেখার আমার সৌভাগ্য হয়েছে।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ وَلَمْ يَحُطَّهُمَا حَتّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَه

অর্থাৎ হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন দো'আর জন্য হাত মুবারক উত্তোলন করতেন, তা চেহারা মুবারককে বুলিয়ে নেয়ার পূর্বে নামিয়ে নিতেন না।

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَبَّكُمْ حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْىِ اَنْ يَرْفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا لاَ خَيْرَ فِيْهِمَا الخ

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় তোমাদের রব অত্যন্ত লজ্জাশীল দয়াময়। তিনি লজ্জাবোধ করেন যে,

তাঁর কোন বান্দা (দো'আর জন্য) দু'খানি হাত উত্তোলন করবে আর তিনি তা খালি ফিরিয়ে দেবেন।

ইমাম যুহ্‌রীর বর্ণনা-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِه فِى الدُّعَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَه

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দো'আ করার সময় উভয় হাত মুবারক পবিত্র বক্ষ মুবারক পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। দো'আ শেষে হাত দু'টি নিজ চেহারা মুবারকে বুলিয়ে নিতেন।

দো'আ করার অনেক নিয়ম-কানূন রয়েছে। ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির পিতা আল্লামা নক্বী আলী খাঁন তাঁর প্রসিদ্ধ লিখনী-اَحْسَنُ الْوِعَاءِ لِاٰدَابِ الدُّعَآءِ নামক কিতাবে দো'আর ৬০টি নিয়ম বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ২৪তম নিয়ম হল অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আপন দু'টি হাত আসমানের দিকে বক্ষ বা কাঁধ বরাবর অথবা চেহারা বরাবর উত্তোলন করা অথবা পুর্ণহাত উত্তোলন করা, যাতে বগল যুগল প্রকাশ পায়। ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি উক্ত কথার টীকায় বর্ণনা করেন, বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নি'মাত চেয়ে দো'আর সময় হাত দু'টি আকাশের দিকে করবে। বালা-মুসীবত দূরীভূত করার জন্য দো'আর সময় হাতের পিঠ দিয়ে দো'আ করবে। কখনো কখনো শুধু শাহাদাত আঙ্গুলের ইঙ্গিত দিয়ে দো'আ করার কথা বর্ণনায় এসেছে।

মুহাম্মদ ইবনে হানীফা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির মতে দো'আ চার প্রকারঃ

১. আশা আকাঙ্ক্ষার দো'আ। সেখানে হাত দু'টি আসমানের দিকে করবে।

২. ভয়ের দো'আ। এখানে হাতের পিঠ নিজ চেহারার দিকে রাখবে।

৩. আহাজারীর দো'আ। এখানে হাতের অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দু'টি বন্ধ রাখবে। আর মাধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে বৃত্ত করবে এবং শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে থাকা।

৪. গোপনে দো'আ। এখানে মনে মনে ফরিয়াদ করা ও মুখে কিছু না বলা।

দো'আ-মুনাজাতের আরো অনেক নিয়ম-কানূন রয়েছেঃ যেমন- আসমা-ই হুস্না, নবীগণের ওসীলা, ওলীগণের ওসীলা, মাতা-পিতার ওসীলা নিয়ে দো'আ করলে তা ক্ববূল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

সুতরাং দো'আ করার ব্যাপারে উপরোল্লেখিত নিয়ম-কানূন পালন করাই শ্রেয়। আর কিছু দো'আ আছে সেখানে হাত উঠানো নেই। যেমন নামাযে দো'আ-ই মা'সূরাহ্ বা শেষ বৈঠকের দো'আ, হাম্মাম তথা বাথরুমে যাওয়া আসার দো'আ, খোৎবার দো'আ ইত্যাদি।

নামায শেষে যে দো'আ করা হয়, সেখানে হাতে উঠানোর বিধান ও নিয়ম আমাদের শরীয়তে প্রচলিত আছে।

হযরত আস্ওয়াদ আমেরী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন-

صَلَّيْتُمَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفَجْرَ سَلَّمَ اِنْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমি ফজরের নামায পড়েছি। সালাম ফেরানোর পর মুসল্লীদের দিকে ফিরে গেলেন এবং হাত মুবারক উঠিয়ে দো'আ করলেন।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, দো'আর মধ্যে হাত উঠানোর ব্যাপারে ১০০টির মত হাদীস আছে। সবগুলোকে আমি فَضُّ الْوِعَاءِ فِىْ اَحَادِيْثِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ নামক কিতাবে সংকলন করেছি। সব ক'টির মধ্যে এ কথার উল্লেখ আছে যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দো'আ করার সময় হাত মুবারক উঠিয়েছেন। এ সব দো'আ বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে; কিন্তু সব ক'টিতে হাত উঠানোর কথা উল্লেখ আছে। তাই এ বিষয়টি সর্বোত্তমরূপে متواتر (মুতাওয়াতির) হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হল এবং দো'আর মধ্যে হাত উঠানো সুন্নাত প্রমাণিত হল। *

---o--

* ১. সূরা গাফির, আয়াত-৬০, ২. সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৮৬, ৩. তিরমিযী, আবূ দাউদ, হাকেম, ৪. তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, হাকেম, সূত্র. হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৫. তিরমিযী, হাকেম, সূত্র. হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৬. তিরমিযী, দায়লামি, সূত্র. হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৭. তিরমিযী, সূত্র. হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৮. বুখারী শরীফ, ৫ম খন্ড, ৯. ইবনে হাব্বান, ১০. তিরমিযী, হাকেম, বায্যার, ১১. ইবনে হাব্বান, ১২. আহসানুল ভি'আ-ই লিআদাবিদ্দো'আ-ই এবং ১৩. মুসান্নাফ-ই ইবনে আবী শায়বা। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমা'ঈন)

।। পাঁচ ।।

উচ্চস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করা

দুরূদ শরীফ-এর মর্মার্থ হচ্ছে- আল্লাহ্ কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ আল্লাহর হাবীবের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেন। আল্লাহ্ কর্তৃক দুরূদ পড়ার অর্থ আল্লাহর নবীর মর্যাদা মুহূর্তে মুহূর্তে বৃদ্ধিকরণ। আর ফেরেশতা কর্তৃক পাঠ করার অর্থ হলো- আল্লাহর নিকট আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা বৃদ্ধিকরণের জন্য আল্লাহ্র দরবারে সালাত ও সালাম সম্বলিত বাক্য দিয়ে ফরিয়াদ করা। ঈমানদারের উপর নির্দেশ হল সালাত ও সালামের বাক্য দিয়ে আল্লাহর দরবারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান মান বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা। এটাকে দুরূদ পাঠ বলা হয়। মূলত দুরূদ শরীফ আল্লাহ্, ফেরেশতাগণ ও বান্দাদের কাজ; যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান, মান, মর্যাদা বৃদ্ধি করার মর্ম রয়েছে।

এ দুরূদ শরীফ যেমনিভাবে চুপে চুপে পাঠ করা জায়েয, তেমনি উচ্চস্বরেও জায়েয। যেমন ক্বোরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে- فَاذْكُرُوْا اللهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآئَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا অর্থাৎ তোমরা এভাবে আল্লাহর যিক্র করো, যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাকে স্মরণ করো; বরং এর চেয়ে আরও বেশি। এটা থেকে বুঝা গেলো, আল্লাহর যিক্র চুপে চুপে হোক কিংবা উচ্চস্বরে হোক, উভয় অবস্থায় জায়েয ও বৈধ।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে সালাম ফেরানোর পর উচ্চস্বরে- لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ (লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা- শরীকা লাহু) পর্যন্ত পড়তেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

كُنْتُ اَعْرِفُ اِنْقِضَاءَ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ

অর্থাৎ তাকবীরের আওয়াজ উচ্চস্বরে শুনে আমি বুঝতে পারতাম রাসূলুল্লাহর নামায শেষ হওয়ার কথা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস তখন সাবালক ছিলেন না বিধায় মাঝে মধ্যে জামা'আতে হাযির হতেন না।

আরো বর্ণিত আছে হাদীসে ক্বুদসীতে, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ - وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَأٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَأٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ

অর্থাৎ বান্দা যদি আমাকে জামা'আত বা মজলিসে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে তদপেক্ষা উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।

তাই দুরূদ শরীফ অন্যতম যিক্র। শুধু তা নয়, তা আল্লাহর যিক্রও। এ জন্য প্রত্যেক দো'আ ক্ববূলের ব্যাপারে দুরূদ শরীফ অন্যতম ওসীলা; বরং এটা ছাড়া দো'আ ক্ববুলও হবে না বলে হাদীস

শরীফে এরশাদ হয়েছে। আরো উল্লেখ আছে হাদীসে কুদ্সীতে جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِّنِّىْ فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِىْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "ওহে! আমার হাবীব, আপনাকে আমার পক্ষ থেকে যিক্র সাব্যস্ত করলাম। অতএব, আপনাকে যে যিক্র করলো, সে আমার যিক্র করলো।"

ফতওয়া-ই শামীতে উল্লেখ আছে-

فَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِنَّ الْجَهْرَ اَفْضَلُ لِاَنَّه اَكْثَرُ عَمَلاً وَلِتَعَدِّىْ فَائِدَتِه اِلَى السَّامِعِيْنَ وَيُوْقِظُ قَلْبَ الْغَافِلِيْنَ فَيَجْمَعُ هَمَّه اِلَى الذِّكْرِ وَيَصْرِفُ سَمْعَه اِلَيْهِ وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَيَزِيْدُ النَّشَاطَ

অর্থাৎ কোন কোন ফক্বীহ্ উচ্চস্বরে যিক্র ও দুরূদ শরীফ পড়াকে উত্তম বলেছেন। এর মধ্যে কর্ম বেশি। শ্রবণকারীর নিকট এর ফায়দা পৌঁছে, অলস ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত করে দেয় এবং তাদের ধ্যান-ধারণাকে আল্লাহ্ ও রসূলের পথে নিয়ে আসে এবং নিদ্রা দূরীভূত করে সজীবতা সৃষ্টি করে দেয়।

তাই উচ্চস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করা উত্তম কাজ। এর মধ্যে অন্যান্য শ্রোতারা এটা শ্রবণে উপকৃত হবে। পাশাপাশি অন্যান্য সৃষ্টি এ দুরূদ শরীফে যোগ দেবে এবং তারা ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষী হবে। সুতরাং এটা ইসলামের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। তাই, দুরূদ শরীফ আল্লাহর যিক্র। আল্লামা ইসমাঈল হক্বক্বী তাফসীর-ই রুহুল বয়ানে উল্লেখ করেছেন:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا الذِّكْرُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ جَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبٌّ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ رِّيَاءٍ لِيَغْتَنِمَ النَّاسُ بِاِظْهَارِ الدِّيْنِ وَوُصُوْلِ بَرْكَةِ الذِّكْرِ اِلَى السَّامِعِيْنَ فِى الدُّوْرِ وَالْبُيُوْتِ وَيُوَافِقُ الذِّكْرَ مَنْ سَمِعَ صَوْتَه وَيَشْهَدَلَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ رَطَبٍ وَّيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَه

অর্থাৎ উচ্চস্বরে যিক্র করা শুধু জায়েয নয়; বরং মুস্তাহাব; কিন্তু রিয়া মুক্ত হতে হবে। আর এ উচ্চস্বরে যিক্র দ্বারা ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য হয়। এ যিক্রের বরকত ঘরে অবস্থানকারীদের মধ্যে যেন পৌঁছে এবং যিক্রের মধ্যে যেন মশগুল হয়ে যায়। ক্বিয়ামতের দিন এ যিক্রের সাক্ষী প্রত্যেক কিছুই হবে, যাদের কানে এ যিক্রের আওয়ায পৌঁছেছে।

ফাতাওয়া-ই আলমগীরীতে আছে- قَاضٍ عِنْدَه جَمْعٌ عَظِيْمٌ يَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ جُمْلَةً لاَ بَأْسَ بِه অর্থাৎ কোন বিচারকের নিকট লোক সমাগম হয়ে উঁচু আওয়াজে যিক্র-আযকার করছে। তা শরীয়ত মতে অসুবিধা নেই। আরো উল্লেখ আছে- اَلْاَفْضَلُ فِىْ قِرَاَءَةِ الْقُرْاٰنِ خَارِجَ الصَّلٰوةِ الْجَهْرُ

অর্থাৎ নামাযের বাইরে বড় আওয়াজে ক্বোরআন শরীফ পাঠ করা উত্তম।✦

---o---

✦ ১. মিশকাত, বাবুয্ যিক্রি বা'দাস সালাত, ২. মিশকাত শরীফ, ৩. মিশকাত শরীফ, ৪. শিফা, কৃত. ক্বাযী আয়ায, ৫. ফাতওয়া-ই শামী, ১ম খন্ড, মাতলবুন্ ফী আহ্কামিল মসজিদ, ৬. তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৪র্থ পারা এবং ৭. আলমগিরী, কিতাবুল কারাহিয়্যাহ।

। ছয় ।।

ওরস শরীফ

'ওরস' (عرس)-এর আভিধানিক অর্থ বিবাহ। বর ও কনে উভয়কে আরবীতে 'আরূস' (عروس) বলা হয়। বাসর, প্রীতিভোজ, ওলীমাহ্ (وليمه - طعام -زفاف)কেও ওরস বলা হয়। এর বহুবচন হয় 'আ'রাস' ও 'উরূসাত' (اعراس وعروسات)। [আল-মুনজিদ]

পরিভাষায়, বুযুর্গগানে দ্বীন-এর ওফাত দিবসকে 'ওরস' বলা হয়। এর ভিত্তি হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, মুন্কার ও নাকীর যখন মৃত ব্যক্তির কবরে এসে প্রশ্ন করবে, তখন ওই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে সক্ষম হলে মৃত ব্যক্তিকে বলা হয়- نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لاَ يُوْقِظُه اِلاَّ اَحَبُّ اَهْلِه اِلَيْهِ অর্থাৎ ওই দুলহানের মত ঘুমিয়ে পড়, যাকে পরিবারে তার প্রিয়তম ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ জাগাবে না। ওই দিন মুন্কার ও নাকীর ফিরিশ্তাদ্বয় তাকে 'আরূস' (عَرُوْس) নামে আখ্যায়িত করে। এ জন্য ওই ওফাত দিবসকে 'ওরস' (عُرْس) বলা হয়।

অথবা মৃত ব্যক্তি নেক্কার হওয়ার কারণে বিশেষ করে বুযুর্গ হওয়াতে কবরের মধ্যে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্য হবে, যখন মুনকার ও নাকীর জিজ্ঞাসা করবেন- مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ حَقِّ هٰذَا الرَّجُلِ অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ইশারা করে বলেন, এ নূরানী সত্তা সম্পর্কে তুমি কি আক্বীদা পোষণ করতে? তখন ওই ব্যক্তি দীদারে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পেয়ে আত্মহারা হয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসামূলক উত্তর দেবে। উভয় জাহানের সরদারের দীদার লাভ করে ধন্য হওয়াতে ওই সময় ওই ব্যক্তির জন্য অনেক আনন্দের মুহূর্ত হয়। তাই ওই দিনকে 'ওরস' (عُرْس)-এর দিন বলা হয়।

'ওরস' পালনের শর'ঈ ভিত্তি বা দলীল

প্রতি বছর ওফাত দিবসে মৃত ব্যক্তি কবর বা আউলিয়া-ই কেরামের মাযার যিয়ারত করা, ক্বোরআন তিলাওয়াত, সাদ্ক্বা-খায়রাত, হালাল পশু যবেহ করে তাবাররুকের ব্যবস্থা করা হয়। এ সমস্ত কাজ 'ওরস' '(عرس) উপলক্ষে করা হয়। শরীয়ত মতে এসব কর্মসূচি শুধু বৈধ নয়, বরং অনেক সাওয়াবের কাজও।

২. ইবনে আবী শায়বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা-

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِىْ شُهَدَآءَ اُحُدٍ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ

অর্থাৎ নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বছরের মাথায় উহুদের শহীদগণের কবরগুলোর নিকট তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

৩.

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اَنَّه كَانَ يَأْتِىْ قُبُوْرَ شُهَدَآءِ اُحُدٍ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَآءُ الْاَرْبَعَةُ هٰكَذَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট তারিখে উহুদের শোহাদা-ই কেরামের মাযারে হাযির হতেন এবং তাদেরকে সালাম পেশ করে দো'আ করতেন। খোলাফা-ই রাশেদীনও এ আমল করতেন।

শায়খ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করেন,

دوم آنکہ بہیئت اجتماعی مردماں کثیر جمع شوند و ختم کلام اللہ فاتحہ بر شیرینی وطعام نمودہ تقسیم درمیاں حاضراں کنند ایں قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین نہ بود اگر کسے ایں طور کند باک نیست بلکہ فائدہ احیاء اموات را حاصل می شود

অর্থাৎ **দ্বিতীয়ত** অনেক লোক একত্রিত হয়ে খতমে ক্বোরআন করবে, খাবার ও শিরনী পাক করে ফাতেহার মাধ্যমে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করবে। যদিও এ কাজ হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফা-ই রাশেদীনের যুগে ছিলোনা; কিন্তু এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই; বরং এতে জীবিত ও মৃত সকলেরই উপকার সাধিত হয়।

মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী বর্ণনা করেন যে-

کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی از شیخ خود نقل می سازد کہ فرمود کہ ایں عرس در زماں سلف نبود از مستحسنات متأخرین است

অর্থাৎ শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি নিজ ওস্তাদের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, প্রচলিত ওরস শরীফ সালফ-ই সালেহীনের যুগে না থাকলেও পরবর্তী ওলামা-ই কেরামের মতে মুস্তাহাসান, ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে সাব্যস্ত আমল।

হযরত গাযী-ই দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা আযীযুল হক্ব শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর ফাতাওয়া-ই আযীযিয়াতে উল্লেখ করেন-

وَفِىْ حَاشِيَةِ سِرَاجِ الْهِدَايَةِ لِمَوْلَانَا جَلَالُ الدِّيْنِ الْبُخَارِىِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِىْ حَاشِيَةِ الْمَظْهَرِىِّ وَتُحْتَاطُ فِى السَّاعَةِ الَّتِىْ نُقِلَ رُوْحُه فِيْهَا فَاِذَا اَرْوَاحُ الْاَمْوَاتِ تَأْتُوْنَ فِىْ اَيَّامِ الْاَعْرَاسِ فِىْ كُلِّ عَامٍ فِىْ ذَالِكَ الْمَوْضِعِ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ وَيَنْبَغِىْ يُطْعَمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَاِنَّ ذَالِك يُفْرَحُ اَرْوَاحَهُمْ وَاِنَّ فِيْهِ تَأْثِيْرًا بَلِيْغًا (هدية الحرمين)

অর্থাৎ মাওলানা জালালুদ্দীন বোখারী হাশিয়া-ই মাযহারীতে 'সিরাজুল হেদায়া'য় বর্ণনা করেন, ওই সময়কে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে, যখন বুযুর্গ বা মৃত ব্যক্তির রূহ কব্জ হয়েছে; কেননা। মৃতদের রূহ প্রত্যেক বছর ওরস চলাকালীন ওই সময়ে ওই স্থানে হাযির হয়। অতএব, সে সময় খাবার-তাবাররুকাত পরিবেশন করা দরকার। এতে তাদের রূহ আনন্দিত হয়।

হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (দেওবন্দী আলিমদের পীর) 'ফয়সালা-ই হাফতে মাসয়ালা'য় ওরস বৈধ বলে জোর দিয়ে বলেন-

ফক্বীর (নিজ)-এর এ বিষয়ে তরীক্বা এযে, আমি প্রত্যেক বছর আমার পীর-মুরশিদের এর জন্য ঈসালে সাওয়াবের ব্যবস্থা এভাবে করি যে, প্রথমে ক্বোরআন পাক তিলাওয়াত করা হয়। আর মাঝে মধ্যে সময়ানুপাতে মীলাদ শরীফও পাঠ করা হয়। এরপর উপস্থিত সবাইকে খাবার তাবাররুক হিসাবে বিতরণ করা হয়।

উপরোল্লিখিত দলীলাদির আলোকে সাব্যস্ত হল যে, ওরস শরীফ পালন করা ইসলামী অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত। এটা শুধু জায়েয নয়; বরং সাওয়াবের কাজ ও ওই অনুষ্ঠানে প্রথমে যিয়ারত করা হয়। আর যিয়ারত করা ক্বোরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীস-ই পাকে রাসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْا فَاِنَّهَا تُزْهِدُ فِى الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ (ابن ماجة)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে প্রথমে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যিয়ারত কর। কেননা, এটা দুনিয়া বিমুখতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়, সেখানে ক্বোরআন খতম ও অন্যান্য যিক্র-আযকার করা হয়। তা ক্বোরআন-সুন্নাহ মতে সম্পূর্ণ নেক আমল।

তৃতীয়ত, সেখানে বুযুর্গ ও মৃত ব্যক্তির স্মারক আলোচনা করা হয়, যার হাদীসে পাকে আমাদের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ (ابوا داؤد- ترمذى - حاكم - بيهقى - الجامع الصغير)

অর্থাৎ: হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল-ই পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের ঈমানদার মৃত ব্যক্তিদের ভাল দিকগুলো তুলে ধরো এবং তাদের মন্দ বিষয়সমূহের চর্চা থেকে বিরত থাক।

এছাড়া হাদীস-ই পাকে আরো উল্লেখ আছে-

ذِكْرُ الْاَنْبِيَآءِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَذِكْرُ الصَّالِحِيْنَ كَفَّارَةٌ وَذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ وَذِكْرُ الْقَبْرِ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ নবীগণের আলোচনা ইবাদত, নেককার বান্দাদের আলোচনা কাফ্ফারা, মৃত্যুকে স্মরণ করা, সদক্বাহ্ এবং কবরের আলোচনা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটস্থ করে দেয়।

চতুর্থ, সেখানে খাবার হিসাবে তাবাররুক বিতরণ করা হয়। অপরকে খাবার পরিবেশন সম্পর্কে হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে-

اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ - وَقَالَ اَيْضًا اَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاَفْشُوْا السَّلَامَ تُوَرِّثُوْا الْجِنَانَ

অর্থাৎ ইসলামের উত্তম কাজ খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে অধিক হারে সালাম দেয়া এটাও এরশাদ করেছেন- তোমরা খানা খাওয়াও, বেশি পরিমাণে সালাম দাও, তাহলে বেহেশতের মালিক হয়ে যাবে। (ঈমানদারদের জন্য)।

পঞ্চমত, ওরসে পাকে উপস্থিত ব্যক্তিরাই হলো মেহমান, আর মেহমানদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করা ঈমানের পরিপূর্ণতা। যেমন হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে-

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَه

অর্থাৎ যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সমাদর করে।

উপরোক্ত আমলসমূহের সমন্বয়ে ওরসে পাক উদ্‌যাপিত হয়, তাই ওরস পালন ইসলামের অনুষ্ঠানাদি পালনের মধ্যে অন্যতম এবং সাওয়াবের কাজ।*

* ১. باب اثبات عذاب القبر - مشكواة ২. ফাতাওয়া-ই শামী ১ম খন্ড, বাবু যিয়ারতিল কুবূর, ৩. তাফসীর-ই কবীর, তাফসীর-ই দুররে মনসূর, ইবনে মুনযের ইবনে মার দিওয়াইহ্ বর্ণনা সূত্রে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ৪. ফাতাওয়া-ই আযীযিয়্যাহ্, কৃত. গাযী শেরে বাংলা (রহ.), পৃ. ৩৬ (পুরাতন ছাপা), ৭. মেশকাত শরীফ বাবু যিয়ারাতিল কুবূর, ৮. আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকিম, বায়হাক্বী, আল জামে'উস সগীর, ইমাম সুয়ূত্বী, ৯. মুসনাদে ফেরদাউস আল জামেউস সগীর, ইমাম সুয়ূত্বী: ২য় খন্ড, পৃ. ১৯, ১০. সহীহ্ বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃ. ৬, ১১. ত্বাবরানী, আল-জামেউস সগীর, ইমাম সুয়ূত্বী, পৃ. ৪৪ এবং ১২. মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, বোখারী, মুসলিম ও আল-জামে'উস সগীর, ইমাম সুয়ূত্বী।

ইমাম-ই আ'যম আলায়হির রাহমাহ্ ও হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান*

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তাঁরই একমাত্র পছন্দনীয় ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন-ইসলাম দুনিয়াবাসীকে দান করেছেন। আর এ দ্বীন-ই ইসলামের বিরুদ্ধে যখনই কোনভাবে চক্রান্ত হয়েছে এবং সেটার স্বচ্ছ অবয়বের উপর কলঙ্ক লেপনের জন্য ষড়যন্ত্র হয়েছে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা সেটার সত্যতা ও স্বচ্ছতাকে অক্ষুণ্ন-অম্লান রাখারও ব্যবস্থা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

উদাহরণ স্বরূপ, হুযূর-ই আক্রামের বরকতময় হাতে ইসলামের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠা লাভের পর, তাঁর ওফাত শরীফের সাথে সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে বহুবিধ হামলা পরিচালিত হয়েছিলো। তখন হুযূর-ই আক্রামের যোগ্যতম উত্তরসূরী ও শ্রেষ্ঠতম অনুসারী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এগিয়ে এসে সব ক'টি চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের ভিতকে পুনরায় মজবুত ও সুদৃঢ় করে দিয়েছেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাত্র একশ' বছরের মাথায় ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর 'মাযহার-ই আতাম্ম' (পূর্ণতম প্রকাশস্থল) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ইসলামের অনন্য ও যুগোপযোগী খিদমত আঞ্জাম দেন। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আক্ব্বার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যথাসময়ে উম্মত-ই মোস্তফার সাহায্যে এগিয়ে এসে তাদেরকে

* **সাবেক উপাধ্যক্ষ-** গহিরা আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, **সাবেক মুহাদ্দিস-** ছোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম। **অনুবাদক-**কান্যুল ঈমান এবং খাযাইনুল ইরফান ও মিরআত শরহে মিশকাত, বাহ্যাতুল আসরার ইত্যাদি। **মহাপরিচালক-** আনজুমান গবেষনা কেন্দ্র। আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

'ইখতিলাফ' (মতবিরোধ) থেকে রক্ষা করেছেন, তাদের ইস্পাত কঠিন ভিতকে নড়বড়ে হতে দেননি। অনুরূপ ইমাম-ই আ'যম আলায়হির রাহমাহ্ গোটা মুসলিম জাতির এত বড় সাহায্য করেছেন যে, তাঁদেরকে কুফর, যিন্দীক্বী ও ইলহাদ (যথাক্রমে, কুফর, মুনাফিক্বী ও মুসলমান নামধারীদের কপটতা)-এর চক্রান্তরূপী ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করেছেন। আজ তাঁর ইল্‌মী ইজতিহাদের বরকতে মুসলিম উম্মাহ্, কাফির-মুরতাদ্দদের ফিৎনাদি থেকে মুক্ত হতে পারছে। হিজরী পঞ্চম শতাব্দির শেষভাগে দ্বীন-ই ইসলামকে পুনর্জীবিত করেছিলেন শাহানশাহে বাগদাদ হুযূর গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। সুতরাং এটা মুসলিম জাতির জন্য সৌভাগ্য যে, ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসে হযরত সিদ্দীক্ব-ই আক্বার 'খলীফা-ই আ'যম', হযরত আবূ হানীফা 'ইমাম-ই আ'যম, আর হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী 'গাউসে আ'যম' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। আমি এ নিবন্ধে পরিসরের স্বল্পতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথমে ইমাম-ই আ'যম হযরত আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনী তারপর প্রাসঙ্গিকভাবে হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করবো। ইনশা-আল্লাহ্।

ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা এখন যুগের অন্যতম প্রধান দাবী। কারণ, গোটা দুনিয়ার সব মুসলমান ইমাম-ই আ'যমের প্রশংসাকারী এবং বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়া যেমন সুখের বিষয়, তেমনি একশ্রেণীর অকৃতজ্ঞ ও মুর্খ লোকের ইসলামের মুখোশ পরে, সলফে সালেহীনের তথাকথিত অনুসারী ও ইমাম বোখারীর কপট ভক্ত সেজে ইমাম-ই আ'যম ও হানাফী মাযহাব এমনকি সব ইমাম ও মাযহাব-এর বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালানোও অতীব দুঃখের কারণ। এ শেষোক্ত অশুভ তৎপরতা বেশ কিছুদিন আগে থেকে পরিলক্ষিত হলেও ইদানিং এটা আশঙ্কাজনকভাবে দেখা যাচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, গায়র-মুক্বাল্লিদ ওহাবী সম্প্রদায়টি ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঘোর শত্রু। তারা তাঁর মাসআলাগুলো থেকে খুঁত বের করার অপপ্রয়াস চালায় এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-মজাক করার ধৃষ্টতা দেখায়। তাদের ধৃষ্টতা এতটুকুতে গিয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের কোন কোন হতভাগা লোক ইমাম-ই আ'যমের জন্ম তারিখ (৮০ হি.) থেকে আবজাদের হিসাবানুসারে سگ (কুকুর) এবং ওফাতের তারিখ (১৫০হি.) থেকে بوكم جهان پاك (বূ-কমে

জাহানে পাক) লিখেছে। না'ঊযুবিল্লাহ্। অবশ্য, হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণও এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, وهابى (ওহাবী) শব্দের সংখ্যা হয় ২৪। আর 'كَـ' বা (শকুন) শব্দের সংখ্যাও দাঁড়ায় ২৪। এর তাদের উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যও রয়েছে। যেমন- 'শকুন' মৃত খায়। আর এসব লা-মাযহাবী ওহাবীও ইমাম-ই আ'যমসহ পূর্ববর্তী বুযুর্গদের বদনাম (গীবৎ) করে। এমন লোকদের এ অপকর্মকে ক্বোরআন-ই পাকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার নামান্তর সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, وهابى (ওহাবী)'র সংখ্যাও ২৪, چوها (ইদুঁর)-এর সংখ্যাও ২৪। ওহাবীরা ইঁদুদের মতো দ্বীনে কাটছাঁট করতে সবসময় সচেষ্ট থাকে। মোটকথা, লা-মাযহাবী ওহাবীদের অশালীন মন্তব্য ও অপপ্রচারের ফলে প্রত্যেক হানাফী তথা সত্যিকারের মুসলমানের অন্তরে দুঃখ পায়। সুতরাং ইমাম-ই আ'যম ও তাঁর প্রবর্তিত হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারলে এসব অকৃতজ্ঞ ও হতভাগার ওই মুখোশ উম্মোচিত হবে। আর সঠিক পথটি বেছে নিতে পারবেন সরলপ্রাণ মুসলিম সমাজ। সুতরাং দেখুন আমাদের মহানতম ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত ও শ্রেষ্ঠত্ব।

নাম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইমাম-ই আ'যমের নাম শরীফ নো'মান ইবনে সাবিত ইবনে যাওত্বী। হযরত যাওত্বী অর্থাৎ ইমাম-ই আ'যমের দাদা পারস্যে এক অভিজাত বংশের লোক। তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অকৃত্রিম আশেক্ব ছিলেন এবং তাঁর দরবারের খাস ও নৈকট্যধন্য ছিলেন। তাঁরই ভালবাসার কারণে তিনি কূফায় বসবাস করতে থাকেন, যা হযরত আলী মুরতাদ্বার রাজধানী ছিলো। হযরত যাওত্বী তাঁর সন্তান হযরত সাবিতকে, তাঁর শৈশবে হযরত আলী মুরতাদ্বার নিকট দো'আর জন্য নিয়ে এসেছিলেন। হযরত আলী মুরতাদ্বা সাবিতের জন্য দো'আ করলেন এবং অনেক বরকত বা কল্যাণের সুসংবাদ দিলেন। হযরত ইমাম-ই আ'যম হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুরই কারামত ও সুসংবাদের বাস্তবরূপ। আলহামদু লিল্লাহ্!

হযরত ইমাম আবূ হানীফা ৮০ (আশি) হিজরীতে কূফায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে বাগদাদে ওফাত পান। আর এখানে 'খায়যুরান' কবরস্থানে দাফন হন। তাঁর মাযার শরীফ অগণিত আম ও খাস লোকের যিয়ারতস্থল। তিনি সত্তর বছর হায়াত পান।

হযরত ইমাম-ই আ'যম অনেক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হন। তন্মধ্যে তিনি চারজন সাহাবীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরা হলেনঃ **এক.** হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), যিনি বসরায় ছিলেন, **দুই.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, যিনি কূফায় বসবাস করতেন, **তিন.** হযরত সুহায়ল ইবনে সা'দ সা-'ইদী, যিনি মদীনা মুনাওয়ারায় থাকতেন এবং **চার.** হযরত আবূ ত্বোফাইল 'আমির ইবনে ওয়া-সিলাহ্, যিনি মক্কা-ই মুকার্‌রমায় থাকতেন। এটাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও প্রণিধানযোগ্য বর্ণনা।

ইমাম-ই আ'যম হযরত হাম্মাদের যোগ্যতম ছাত্র এবং ইমাম জা'ফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খাস শাগরিদ ছিলেন। দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ তিনি হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর একান্ত সান্নিধ্যে ছিলেন। হযরত ইমাম-ই আ'যমকে বাদশাহ্ মানসূর কূফা থেকে বাগদাদে নিয়ে আসেন। অতঃপর তাঁকে প্রধান বিচারপতি (ক্বা-দ্বিউল ক্বুদ্বাত)-এর পদ অলংকৃত করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এজন্য বাদশাহ্ তাঁকে বন্দি করে জেলে পাঠিয়েছিলেন। এ বন্দিদশায়ই এ মহান ইমাম শাহাদত বরণ করেন। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

ইমাম-ই আ'যমের গুণাবলী

বাস্তবিক পক্ষে ইমামে আ'যমের ফযীলত বা গুণাবলী গণনা করে লিপিবদ্ধ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। হযরত ইমাম-ই আ'যম হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন্ত মু'জিযা এবং হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অম্লাণ কারামত। তিনি হলেন উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর চেরাগ (প্রদীপ) ও দ্বীনী সমস্যাবলীর সমাধানদাতা। আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। সুন্নী হানাফীরা অতিমাত্রায় সৌভাগ্যবান। আমাদের রসূল হলেন 'রসূল-ই আ'যম'। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম), আমাদের পীর-মুর্শিদ হলেন 'গাউস-ই আ'যম, (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আর আমাদের ইমাম হলেন 'ইমাম-ই আ'যম' (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। 'আযমত ও ইয্‌যাত' (মহত্ব ও সম্মান) আমাদের ভাগ্যেই রয়েছে। বরকত হাসিলের জন্য আমি ইমাম-ই আ'যমের কয়েকটা গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। হানাফীরা পড়ুন, দেখুন, আর খুশী ও আনন্দে পুলকিত হোন!

এক. আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম-ই আ'যম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তাঁর গুণাবলী অতি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে, ইমাম ত্বাবরানী হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে আর আবূ নু'আয়ম শীরাযী ত্বাবরানী হযরত ক্বায়স ইবনে সাবিত ইবনে ওবাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

لَوْكَانَ الاِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَه رِجَالٌ مِّنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىِّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَوْكَانَ الدِّيْنُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَه رَجُلٌ مِّنْ فَارِسَ

অর্থাৎ "যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটও থাকে, তবে পারস্যের সন্তানদের কিছুলোক তা সেখান থেকে নিয়ে আসবে।" বোখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, "ওই মহান সত্ত্বার শপথ, যাঁর ক্বুদরতের হাতে আমার প্রাণ, যদি দ্বীন-ই ইসলাম সুরাইয়্যা নক্ষত্রের সাথে ঝুলন্ত থাকে, তাহলে পারস্যের এক ব্যক্তি তা নিয়ে আসবে।"

বলুন, পারস্য-বংশোদ্ভূতদের মধ্যে ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা নো'মান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এ শান বা মর্যাদার আর কে আছে? গোটা পারস্যে তাঁর মতো আর কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। সুতরাং এ ভবিষদ্বাণী তাঁরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দুই. আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হযরত ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রশংসায় একটি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখেছেন। সেটার নাম 'খায়রাতুল হিসান ফী তরজমাতি আবী হানীফাতান্ নো'মান।' তাতে তিনি একটি হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করেছেন। ওই হাদীস শরীফে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

تُرْفَعُ زِيْنَةُ الدُّنْيَا سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ

অর্থাৎ "দেড়শ' হিজরীতে দুনিয়ার সৌন্দর্য তুলে ফেলা হবে।" ১৫০ হিজরীতে ইমাম-ই আ'যমের ওফাত শরীফ।

বুঝা গেলো যে, ইমাম-ই আ'যম হলেন দুনিয়ার শোভা, শরীয়তের আলো এবং ইল্‌ম ও আমলের সৌন্দর্য (সাজসজ্জা)। ইমাম কারদারী বলেছেন, "এ হাদীস শরীফ দ্বারা ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।"

তিন. হযরত ইমাম-ই আ'যম ইসলামী দুনিয়ার ওই প্রথম আলিম-ই দ্বীন, যিনি ফিক্বহ্ ও ইজতিহাদের বুনিয়াদ রেখেছেন এবং এর মাধ্যমে রসূলে পাকের উম্মতের উপর বড় ইহসান করেছেন। অন্য সব ইমাম, যেমন- ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম এ ভিতের উপর ইমারত প্রতিষ্ঠা করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''ইসলামে যে ব্যক্তি উত্তম পন্থা আবিস্কার করবে সে নিজেরও সাওয়াব পাবে এবং তদনুযায়ী সব আমলকারীর সাওয়াবও পাবে।''

চার. হযরত ইমাম-ই আ'যম সমস্ত ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিসের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ওস্তাদ। এসব হযরত ইমাম-ই আ'যমের শাগরিদ (শীষ্য)। সুতরাং ইমাম শাফে'ঈ হলেন ইমাম মুহাম্মদ (আলায়হিমার রাহমাহ)'র সৎপুত্র ও তাঁর ছাত্র। অনুরূপ, ইমাম মালিক ইমাম-ই আ'যমের লিখিত কিতাবাদি পাঠ-পর্যালোচনা করে উপকৃত হয়েছেন। অনুরূপ ইমাম বোখারী মুহাদ্দিসগণের ওস্তাদ একথা সত্য; কিন্তু ইমাম বোখারীর বহু ওস্তাদ ও শায়খ হলেন হানাফী। জ্ঞানাকাশের সূর্য যেন ইমাম-ই আ'যম, আর অবশিষ্ট ইমাম ও আলিমগণ হলেন তারকারাজি।

পাঁচ. ইমাম-ই আ'যমের প্রত্যক্ষ শাগরিদ এক লক্ষেরও বেশী। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ হলেন মুজতাহিদ। যেমন-ইমাম আবূ ইয়ূসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যোফর, ইমাম ইবনে মুবারক, যাঁরা হলেন জ্ঞান-জগতের উজ্জ্বল তারকারাজি। হযরত ইমাম মুহাম্মদ নয়শ' নব্বইটি দ্বীনী শানদার কিতাব প্রণয়ন করেছেন; ওইগুলোর মধ্যে ছয়টি কিতাব অতি উঁচু মানের। ওইগুলোকে 'যা-হিরুর রেওয়াত কিতাবাদি' বলা হয়। আর এগুলোকে ফিক্বহ শাস্ত্রের মূল কিতাব হিসেবে মানা হয়।

ছয়. সমস্ত নবীর সরদার হলেন চারজন নবী, আসমানী কিতাবগুলোর সরদার হচ্ছে চারটি কিতাব, ফেরেশতাদের সরদার হলেন চারজন, সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে উত্তম ও উচুঁতম পর্যায়ের হলেন চার ইয়ার, মুজতাহিদ আলিমদের মধ্যে উত্তম হলেন চার ইমাম। বস্তুতঃ ওই চারজন নবীর মধ্যে হুযূর-ই আক্রাম হলেন সর্বাধিক মর্যাদাবান, চারটি কিতাবের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ক্বোরআন-ই মজীদ, চার ফেরেশতার মধ্যে হযরত জিব্রাঈল উত্তম, চার ইয়ারের মধ্যে হযরত আবূ বকর উত্তম আর চারজন ইমামের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন ইমাম-ই আ'যম। এ কারণে ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন, 'ফক্বীহগণ হলেন ইমাম আ'যম-এর বংশধর'। আর তিনি হলেন সবার পিতা।

সাত. ইমাম-ই আ'যম যেমন ইল্‌ম বা জ্ঞানাকাশের সূর্য, তেমনি আমলের ময়দানের প্রধান ঘোড়-সাওয়ারও। তা হবেনও না কেন? তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ এশার ওযূর দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর এমন গোপনভাবে রোযা রেখেছেন যে, সে সম্পর্কে কেউ জানতো না। ঘর থেকে খাবার আনতেন। বের হয়ে ছাত্রদেরকে খাইয়ে দিতেন। ঘরের লোকেরা মনে করতেন তিনি বাইরে কোথাও খেয়েছেন। আর বাইরের লোকেরা মনে করতেন যে, তিনি ঘর থেকে খেয়ে এসেছেন। নিয়মিতভাবে রমযান মাসে একষট্টি খতম ক্বোরআন পড়তেন-এক খতম দিনে, এক খতম রাতে আর এক খতম পূর্ণ মাসে তারাবীহর নামাযে, মুক্বতাদীদের সাথে নিয়ে। তিনি পঞ্চান্ন বার হজ্ব করেছেন।

আট. ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাযার শরীফ দো'আ কবূল হবার জন্য কষ্টি পাথরতুল্য। সুতরাং ইমাম শাফে'ঈ ক্বুদ্দিসা সির্‌রুহু বলেন, ''যখনই আমার সামনে কোন সমস্যা আসতো, তখন আমি ইরাক শরীফে ইমাম-ই আ'যমের মাযার শরীফে হাযির হতাম। সেখানে দু' রাক'আত নফল নামায পড়ে ইমাম-ই আ'যমের মাযার শরীফের বরকতকে ওসীলা করে দো'আ করতাম। ফলে অতি শীঘ্রই দো'আ কবূল হতো, সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো, চাহিদা পূরণ হতো। ইমাম শাফে'ঈ যখন ইমাম-ই আ'যমের কবর-ই আন্‌ওয়ার-এ হাযির হতেন, তখন হানাফী মাযহাবানুসারে নামায পড়তেন, ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্ পড়তেন না। কেউ জিজ্ঞাসা করলেন- এর কারণ কি? তদুত্তরে তিনি বলেন, ''আমি এ মাযার শরীফে যিনি তাশরীফ রাখছেন তাঁর প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন করছি।'' [ফাতাওয়া-ই শামী]

স্মর্তব্য যে, এর অর্থ এ নয় যে, ইমাম শাফে'ঈ ইরাকে এসে ইমাম-ই আ'যমের প্রতি আদব প্রদর্শন করতে গিয়ে সুন্নাত বর্জন করতেন; বরং অর্থ এ যে, কোন ইমাম কিংবা তাঁর অনুসারী নিশ্চয়তার সাথে এ দাবী করেন না যে, আমরাই একমাত্র সত্য ও সঠিক, অন্য ইমাম ও তাঁর মুক্বতাদীগণ ভুলের উপর আছেন; বরং প্রত্যেকের এ ধারণা রয়েছে যে, অন্য ইমামগণও সঠিক পথে আছেন। আক্বাইদের ব্যাপারে প্রত্যেকের ধারণা নিশ্চিত, আর ফিক্বহী মাসআসায় প্রত্যেকের ধারণার বেশীর ভাগ সঠিক হবার পক্ষে। সুতরাং ইমাম শাফে'ঈও এখানে হাযির হয়ে এ ধারণা মতে আমল করেছেন। অর্থাৎ তিনি যেন একথা অবশ্যই মনে করেছেন যে, তাঁর ইজতিহাদ অনুসারে কোন সুন্নাত বর্জন করলেও

ইমাম-ই আ'যমের ইজতিহাদ অনুযায়ী যা সুন্নাত, তা অনুসারে তো আমল হচ্ছে। সুতরাং এখানে আপত্তির অবকাশ নেই।

নয়. ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একশ' বার মহামহিম রবকে স্বপ্নে দেখেছেন। সর্বশেষ বারে তিনি যে দো'আটা মহান রবের দরবারে করেছিলেন, আর মহান রবও যে জবাব দিয়েছিলেন তা 'রাদ্দুল মুহতার' (শামী) কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দশ. উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বড় বড় ওলী, গাউস, কুতব, আবদাল, আওতাদ হযরত ইমাম-ই আ'যম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র দামনের সাথে সম্পৃক্ত, তাঁর মুক্বাল্লিদ। আল্লাহর যত সংখ্যক ওলী হানাফী মাযহাবে রয়েছেন, ততজন অন্য কোন মাযহাবে নেই। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম, শাক্বীক্ব-ই বলখী, মা'রূফ-ই করখী, হযরত বায়েযীদ বোস্তামী, ফুদ্বায়ল ইবনে আয়াদ্ব খোরাসানী, দাঊদ ইবনে নাসর, ইবনে নাসীর ইবনে সুলায়মান তাঈ, আবূ 'আমিদ লাফ্ফাফ খাযরাদী বলখী, খালাফ ইবনে আইয়্যুব, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক ওলী, ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিস, হযরত ওয়াকী' ইবনে জাররাহ্ এবং শায়খুল ইসলাম আবূ বকর ইবনে ওয়ার্‌রাক্ব তিরমিযীর মতো ওলীকুলের সরদারগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী; হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত। মোটকথা, হানাফী মাযহাব তো ওলীগণের মাযহাব। এখনো প্রায় সব ওলীয়ুল্লাহ্ হানাফী। পাক-ভারত উপমহাদেশের গর্ব হযরত দাতা গঞ্জে বখশ্ হাজভীরী, যাঁর আস্তানা শরীফ সৃষ্টির মিলনকেন্দ্র, হানাফী ছিলেন। আপন কিতাব 'কাশ্ফুল মাহ্জূব'-এ তিনি ইমাম-ই আ'যমের বহু ফযীলত (গুণাবলী) কাশ্ফের মাধ্যমে উদ্ঘাটন করে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ, সমস্ত চিশতী, ক্বাদেরী, নক্বশ্বন্দী সোহ্রাওয়ার্দী মাশাইখ হানাফী।

এগার. হযরত ইমাম-ই আ'যমের মাযহাব-ই হানাফী বিশ্বে এত বেশী প্রসার লাভ করেছে যে, যেখানে ইসলাম আছে সেখানে হানাফী মাযহাব রয়েছে। বিশ্বের বেশীরভাগ মুসলমান হানাফী মাযহাবেরই অনুসারী, অন্য মাযহাবগুলো সম্পর্কে অনেক দেশের সাধারণ লোকেরা জানে না বললেও অত্যুক্তি হবে না। যেমন- বলখ, বোখারা, কাবুল, কান্দাহার, প্রায় গোটা ভারত ও পাকিস্তান এবং আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এসব দেশে ও শহরে শাফে'ঈ, হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের অনুসারী দেখাই যায়না। কিছু সংখ্যক গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবী,

যারা কোন দিকেরই নয়; 'না ঘর কা, না ঘাট কা', হয়তো কোথাও কোথাও দেখা যায়। তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, তাদের থাকা না থাকার মতোই। ইমাম-ই আ'যমের এমন গ্রহণযোগ্যতা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারেও মাক্ববূল এবং তাঁর প্রবর্বিত হানাফী মাযহাবও আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত প্রিয়।

বার. ইমাম-ই আ'যমের মাযহাবের অনুসারী নয় এমন অনেকেও ইমাম-ই আ'যমের প্রশংসায় অনেক বড় বড় কিতাব লিখেছেন। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী 'খায়রাতুল হিসান ফী তারজামাতি আবী হানীফাতান্ নু'মান' লিখেছেন, সিব্ত্ব-ই ইবনে জাওযী 'কিতাবুল ইন্তিসার লি ইমামি আইম্যাতিল আমসার' দু' খণ্ডে লিখেছেন, ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী শাফে'ঈ 'তাব্য়ীদ্বুস্ সহীফাহ্ ফী মানাক্বিবি আবী হানীফাহ্' লিখেছেন, আল্লামা ইয়ূসুফ ইবনে আবদিল হাদী হাম্বলী, 'তানভীরুস্ সহীফাহ্ ফী তারজামাতি আবী হানীফাহ্' লিখেছেন, যাতে তিনি ইবনে আবদুল্লাহ্‌র অভিমতও উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফার মতো আলিম, ফক্বীহ্, মুত্তাক্বী আর দেখিনি। মোটকথা, আল্লাহর দয়াপ্রাপ্ত উম্মত হযরত ইমাম আবূ হানীফা ক্বুদ্দিসা সিররুহুর ফযীলত ও কামাল (গুণ ও পূর্ণতা)'র পক্ষে সাক্ষী রয়েছেন। সুতরাং যদি মুষ্ঠি পরিমাণ লা-মাযহাবী ওহাবী তাঁর শানে প্রলাপ বকে, তাহলে তার কী গুরুত্ব থাকতে পারে? মোটেই না। যদি পেঁচক-বাদুড় সূর্যকে মন্দ বলে, তাহলে সূর্য কালো-অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে না। যেমন আজকাল রাফেযী (শিয়াগণ) সাহাবা-ই কেরামের বিরুদ্ধে তিরস্কার-বিষোদ্গার করে থাকে, তেমনিভাবে গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা ইমাম-ই আ'যমের প্রতি বিষোদ্গার করার ধৃষ্ঠতা দেখায় বৈ-কি।

তের. সমস্ত মুজতাহিদ ইমামের মধ্যে হযরত ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যুগ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকতর নিকটবর্তী। যেমন- তাঁর জন্ম হয় ৮০ হিজরীতে। তিনি 'তাবে'ঈ'। চারজন সাহাবী-ই রসূলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে ও রেওয়ায়ত নিয়েছেন (হাদীস বর্ণনা করেছেন)। সুতরাং যাঁরা তাঁর তাবে'ঈ হবার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে, তারা নিছক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই করেছে। এটা কিভাবে হতে পারে যে, সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফার মতো সাহাবী ইমাম-ই আ'যমের যুগে কূফায় তাশরীফ রাখছেন, আর হযরত ইমাম-ই আ'যম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেননি? আজকাল তো বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাধারণ মুসলমানগণ পর্যন্ত দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়, সাহাবী-ই রসূলের শান যে আরো অনেক উচুঁ, তা বলার অপেক্ষা

রাখে না। মোটকথা, তিনি তাবে'ঈই। তিনি সহীহ্ হাদীসসমূহ হুযূর-ই আক্রাম থেকে সাহাবীর মাধ্যমেও পেয়েছেন। তিনি ইসলামের প্রথম তিন উত্তম যুগেরই।

প্রসঙ্গত, চার ইমামের জন্ম ও ওফাতের তারিখ ও বয়স নিম্নরূপঃ

ইমামের নাম	জন্ম সাল	ওফাতের সাল	বয়স	মাযার শরীফ
ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাহিমাতুল্লাহি আলায়হি	৮০ হি.	১৫০ হি.	৭০ বছর	বাগদাদ শরীফ
ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি	৯০ হি.	১৭৯হি.	৮৯ বছর	মদীনা শরীফ
ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি	১৫০হি.	২০৪হি.	৫৪ বছর	মিশর
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি	১৬৪ হি.	২৪১হি.	৭৭ বছর	বাগদাদ শরীফ

চৌদ্দ. হযরত ইমাম-ই আ'যম আলায়হির রাহমাহ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বায়ত থেকে খাস ফুয়ূয ও বরকত হাসিল করেন, যা অন্য কোন ইমাম অর্জন করতে পারেন নি। কেননা, ইমাম-ই আ'যম হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মজলিস শরীফে দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ হাযির থাকেন। তিনি নিজেই বলেন, لَوْلَا السَّنَتَانِ لَهَلَكَ النُّعْمَانُ অর্থাৎ "যদি ওই দু'টি বছর পাওয়া না যেতো, তাহলে নু'মান অর্থাৎ আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।"

পনর. হযরত ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পূর্ণ প্রকাশস্থল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম খলীফা, আর ইমাম-ই আ'যম হুযূর-ই আক্রামের উম্মতের প্রথম মুজতাহিদ। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আক্বার ক্বোরআনের জামি' বা সংকলনকারী, আর ইমাম-ই আ'যম হলেন 'জামি'ই মাসাইল-ই ফিক্বহ্ ও ক্বাওয়া'ইদ-ই দ্বীনিয়্যাহ্' (ফিক্বহ্ শাস্ত্রের মাসআলাদি ও দ্বীনের মৌলিক নিয়মাবলীর সংকলনকারী)। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবার হুযূর-ই আক্রামের পর সর্বপ্রথম ন্যায় বিচারের নিয়মাবলী ও খিলাফতের বুনিয়াদ স্থাপন করেছেন, আর ইমাম-ই আ'যম ইজতিহাদ ও ফিক্বহর বুনিয়াদ স্থাপন করেছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব হুযূর-ই আক্রামের উম্মতকে যথাসময়ে সাহায্য করেছেন,

তাদেরকে মতভেদ ও বিক্ষিপ্ততার হাত থেকে রক্ষা করেছেন, আর ইমাম-ই আ'যম মুসলমানদের এত বড় সাহায্য করেছেন যে, তাদেরকে কুফর, ইলহাদ ও যান্দাক্বাহ্ (যথাক্রমে, কুফরী, ইসলামের মুখোশ পরে ইসলামের বিরোধিতা ও মুনাফিক্বী)-এর ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করেছেন। আজ তাঁরই জ্ঞানগত ইজতিহাদের বরকতে মুসলিম উম্মাহ্ কাফির ও মুরতাদ্দদের ফিৎনাদি থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ষোল. হুযূর গাউসে আ'যম হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যেমন আল্লাহর সমস্ত ওলীর সরদার, সবার গর্দানের উপর তাঁর কদম শরীফ রয়েছে, সুতরাং তিনি ত্বরীক্বতের প্রধান ইমাম, তেমনি ইমাম-ই আ'যম সমস্ত আলিমের সরদার। এজন্য তরীক্বতের 'প্রধান ইমাম'-এর উপাধি যেমন 'গাউসে আ'যম' তেমনি শরীয়তের প্রধান ইমামের উপাধি 'ইমাম-ই আ'যম'। সুবহা-নাল্লাহ্।

অতএব, এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র গুণাবলীর কারণে হযরত আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। ইমাম-ই আ'যম যেমন শ্রেষ্ঠ, তাঁর মাযহাব (হানাফী মাযহাব)ও শ্রেষ্ঠতম। এর বহুবিধ কারণও রয়েছে। বস্তুতঃ আমাদের হানাফী মাযহাবের একেকটি মাস্আলার উপর একেকটা স্বতন্ত্র বড় পরিসরের কিতাব লেখা যায়, যার পক্ষে দলীলাদিও প্রচুর। মাযহাবের প্রত্যেক ইমামের উদ্দেশ্যও হচ্ছে, শরীয়তকে জীবন্ত রাখা; প্রত্যেক ইমাম নিজ নিজ ইল্ম, বুঝশক্তি ও গবেষণা অনুসারে মাসআলা-মাসাইল লিখেছেন। তবে বাস্তবিক পক্ষে ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দলীলাদি প্রথম কাতারে পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিটি বিষয়ে তিনিই অগ্রগামী বলে প্রমাণিত। তাঁর জ্ঞান তাঁদের মধ্যে ব্যাপকতম বলে সাব্যস্ত হয়। তাঁর বর্ণিত মাসআলাগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ, দ্বীনী ইল্মকে যদি 'দেহ্' কল্পনা করা হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা আলায়হির রাহমাহ্র ইল্মকে বলতে হয় পূর্ণাঙ্গ দেহ, আর অন্যান্য ইমামের ইল্ম হবে দেহের কোন না কোন অঙ্গ মাত্র। অন্য সব ইমামকে যদি চোখের সাথে তুলনা করা হয়, তবে ইমাম-ই আ'যমকে বলতে হবে ওই চোখের মণি। যদি শরীয়তের সমস্ত ইমামকে হাতের পাঞ্জার সাথে তুলনা করা হয়, তবে ইমাম-ই আ'যমকে বলতে হয় ওই পাঞ্জার বৃদ্ধাঙ্গুলী। তাঁরা যদি শরীয়তের জিহবা (রসনা) হন, তাহলে ইমাম-ই আ'যম হবেন ওই রসনার বাক্শক্তি। অন্য ইমামগণ যদি হৃদয় (ক্বলব) হন, তবে ইমাম-ই আ'যম হবেন ওই হৃদয়ের

স্পন্দন। অন্য সব ইমাম যদি ফুলের মালা হন, তবে আমাদের ইমাম-ই আ'যম হবেন ওই মালার সুতা। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওয়া আনহুম।

এটাই নিয়ম যে, প্রত্যেক বিষয়ে একজন প্রধান হন। আর দ্বীনী ইলম তথা ফিক্বহ্ শাস্ত্রের 'প্রধান' হলেন ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা। তিনি হলেন সমস্ত ইলমে দ্বীনের মোহনা, ফিক্বহ শাস্ত্রের মূল ব্যক্তি। তা হবেনও না কেন? তিনি তো ইল্‌মের কোলে লালিত, ইলমের দোলনায় দোল খেয়েছেন, ইলমের দুধ পান করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত অসংখ্য নি'মাত পেয়ে ধন্য হয়েছেন, যুবক হয়েছেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের অসাধারণ জ্ঞানরূপ খাদ্য আহার করে। সমস্ত ইমাম ইমাম-ই আ'যম থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

[মাক্বামাতে ইমাম-ই আ'যম, কৃত. ইমাম হাফেয উদ্দীন ক্বাদেরী আলায়হির রাহমাহ্ ও 'জা-আল হক্ব' দ্বিতীয় খণ্ড ইত্যাদি]

হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য

হানাফী ফিক্বহর প্রাধান্যসূচক বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নরূপ-

এক. হানাফী ফিক্বহ্ ও হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি এ ছিলো যে, এটা শুধু সমসাময়িক সমস্যার সমাধান স্থির করবে না; বরং যেসব সমস্যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আসতে পারে ওইগুলোর সমাধানও বের করবে। পক্ষান্তরে, ওই যুগের অন্যান্য ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিভঙ্গি এ ছিলো যে, তাঁরা শুধু ওই সমস্ত মাসাইল বা সমস্যার সমাধান বের করবেন, যা সামনে এসে গেছে। হানাফী মাযহাবের এটা এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

দুই. হানাফী ফিক্বহ্ প্রবর্তনের জন্য ইমাম-ই আ'যম নিজের সাথে ফক্বীহ্গণের এক বিরাট দলকেও সামিল করে নিয়েছেন। এর প্রাথমিক রূপরেখা প্রণয়নে এমন চল্লিশজন বিজ্ঞ আলিমের নাম রয়েছে, যাঁরা তাঁদের যুগের বড় বড় মুহাদ্দিস, বরং মুজতাহিদ ছিলেন এবং ইমাম আহমদ, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম এবং অন্যান্য শায়খগণের শায়খ এবং উস্তাদগণের ওস্তাদ ছিলেন। এজন্যই কথিত আছে যে, যদি সিহাহ্ সিত্তাহ্ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস শরীফের কিতাবাদি থেকে ইমাম-ই আ'যমের শাগরিদদের সনদের হাদীসসমূহ পৃথক করে ফেলা হয়, তবে বাকী অংশ শূন্যের কোঠায় রয়ে যাবে।

তিন. হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ শাখা-মাসাইল হাদীস শরীফের অধীনে উদ্ভাবিত হয়; অথচ অন্যান্য মাযহাবে অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এজন্য হানাফী মাযহাব বেশী গতিশীল ও অধিক সমাদৃত। এজন্যই শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিসগণ তাঁদেরই মতামতের আলোকে ফাত্ওয়া প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁদের ফিক্বহ্র সত্যায়ন করেছেন। আল্লামা কারদারী তাঁর 'মানাক্বিব' নামক গ্রন্থে আল্লামা ইবনে জুরাইজের বাণী উল্লেখ করেছেন- مَا اَفْتَى الاِمَامُ اِلاَّ مِنْ اَصْلٍ مُحْكَمٍ (অর্থাৎ ইমামে আ'যমের প্রত্যেকটা মাস্'আলা তথা ফাত্ওয়া একেকটা শক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত)।

চার. হানাফী ফিক্বহ্ থেকে অন্যান্য মাযহাবের ফিক্বহ্ সাহায্য নিয়েছে। 'বুলূগুল আমানী'তে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম শাফে'ঈর বাণীগুলোতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

পাঁচ. হানাফী ফিক্বহ্ আলিম-ওলামা, ইসলামী সুলতানগণ এবং সাধারণ মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য; কারণ এটা পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত। তদনুযায়ী আমল করাও সহজতর। এতে মূল নীতিমালার সাথে সাথে শাখা-মাস্আলাগুলোর বিবরণ সর্বাপেক্ষা বেশী। হানাফী ফিক্বহে যুগের চাহিদাগুলোর সমাধান যেমন বিদ্যমান, তেমনি নিত্য-নতুন আবিষ্কারগুলোর ব্যাপারেও শরীয়তের ফয়সালাদি স্থান পেয়েছে। এসব কারণে সূচনালগ্ন থেকেই এ ফিক্বহ্ বিশ্বের প্রায়সব দেশে কার্যকর হয়েছে ও বিস্তার লাভ করেছে।

পরিশেষে, পবিত্র ক্বোরআনের তাফসীর, হাদীস-ই রসূল সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান, দ্বীন ও শরীয়তের যাবতীয় বিষয়ে খোদাপ্রদত্ত নির্ভুল ও অনন্য 'তাফাক্কুহ্' (অনুধাবন-ক্ষমতা), শরীয়তের সমসাময়িক ও ভবিষ্যতে উদ্ভূত সমস্যাদির নির্ভুল ও সহজ সমাধান প্রদানের সুদূর প্রসারী দিকনির্দেশনা ও ব্যবস্থাপনা এবং ব্যক্তিগতভাবে অকৃত্রিম ও অসাধারণ তাক্বওয়া-পরহেযগারী ইত্যাদি কারণে হযরত আবূ ইমাম হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যেমন 'ইমাম-ই আ'যম', তেমনি তাঁর ফিক্বহ্ ও মাযহাব (হানাফী মাযহাব) হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব। বিশ্বের বেশীর ভাগ মুসলমান তাই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। সর্বোপরি, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সুদক্ষ আলিম-ওলামা এবং পীর-মাশাইখও হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়া একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হানাফী মাযহাবই শ্রেষ্ঠতম। এতদ্সত্ত্বেও যদি কোন অবিবেচক, মূর্খ, অকৃতজ্ঞ, বাতিলপন্থী ও ফিৎনাবাজ লোক কিংবা দল

ইমাম-ই আ'যম ও হানাফী মাযহাবের বিপক্ষে কথা বলে, তবে তা হবে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

কারণ, এ ক্ষেত্রে সুখের বিষয় যে, একদিকে শরীয়তে ইমাম আবূ হানীফা ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ইমামদের ফয়সালা দলীলগত ও যুক্তিগত দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও মজবুত বলে প্রমাণিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি যে কোন বাতিলপন্থী যে কোন অপবাদই ইমাম-ই আ'যম ও হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে দিয়েছে সব ক'টির দাতভাঙ্গা জবাবও দেওয়া হয়েছে হানাফী মাযহাবের দক্ষ অনুসারীদের পক্ষ থেকে। এ ক্ষুদ্র পরিসরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবুও উদাহরণ স্বরূপ সংক্ষেপে বলা যায়ঃ যেমন- তাকবীর-ই তাহরীমাহ্র সময় কান পর্যন্ত হাত তুলে নাভীর নিচে হাত বাঁধার পক্ষে ইমাম আ'যম মত দিয়েছেন। হানাফীরা তা-ই করে থাকেন। কিন্তু যারা কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলে নাভীর উপরে বুকের উপর মেয়েদের মতো হাত বাঁধার কথা বলে, তাদের দলীল-যুক্তি ইমাম-ই আ'যমের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করলে হানাফী মাযহাবের দলীলগুলো বেশী মজবুত ও গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। এ ধরনের অন্যান্য মাসআলাগুলোতেও হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য 'তাহাভী শরীফ', আইনী শরহে বোখারী ইত্যাদি হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাবগুলো পাঠ-পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। এগুলো হলো ফিক্বহী মাসআলা-মাসাইলের বিষয়।

বাকী রইলো, বাতিলপন্থীদের নানা অপবাদ। যেমন- তিনি তাবে'ঈ ছিলেন কিনা, তিনি দ্ব'ইফ হাদীস ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন কিনা? ইমাম-ই আ'যম থেকে সহীহ্ হাদীসগুলো ইমাম বোখারী নেন নি কেন? ইত্যাদি। বস্তুতঃ তাদের এসব আপত্তিকে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রমাণ করা হয়েছে। যেমন, ইমাম-ই আ'যম যে তাবে'ঈ ছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। ইমাম-ই আ'যম যেহেতু তাবে'ঈ ছিলেন, সেহেতু শুধু একজন বা দু'জন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে (সূত্রে) হুযূর-ই আক্রামের অগণিত সহীহ্ হাদীস তিনি সংগ্রহ করেছেন। তাঁর উপস্থাপিত কোন সহীহ্ হাদীস পরবর্তী যুগগুলোতে দুর্বল (দ্ব'ঈফ) হলে তাতো তাঁর পরবর্তী যুগের কোন 'রাভী' বা বর্ণনাকারীর কারণে হয়েছে। তজ্জন্য ইমাম-ই আ'যম দায়ী নন। তাছাড়া, বোখারী ও মুসলিম ব্যতীত সহীহ্ হাদীসের কিতাবাদিও বিশ্বে কম নয়। ইমাম বোখারী ইমাম-ই আ'যম থেকে হাদীস গ্রহণ না করলে, তাও ছিলো বিভিন্ন কারণে। যেমন- ইমাম বোখারী

নিজেই লিখেছেন, ''আমি আমার কিতাব 'সহীহ্'তে হাদীসসমূহ শুধু ওইসব হযরত থেকে নিয়েছি, যাঁদের জ্ঞানগত অভিমত হলো-'ঈমান হচ্ছে মুখের স্বীকৃতি ও আমলের সংমিশ্রমণ (মুরাক্কাব)-এর নাম।' আর ইমাম-ই আ'যম বলেন, ''ঈমান হচ্ছে 'বসীত্ব' মুরাককাব নয়। ঈমানের মূল হচ্ছে- 'অন্তরের বিশ্বাস ও সত্যায়ন', 'মুখের ঘোষণা' হচ্ছে মু'মিনের বাহ্যিক পরিচয় এবং 'আমল' হচ্ছে ঈমানের শোভা ও অধিক প্রতিদান পাবার উপায়।'' সুতরাং এ ইজতিহাদগত মতবিরোধের কারণে হয়তো ইমাম বোখারী ইমাম-ই আ'যমের রেওয়ায়ত নেননি, ইত্যাদি। এটা যেমন ইমামে আ'যমের হাদীসের নির্ভুল ও অসাধারণ জ্ঞানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, তেমনি কেউ কারো নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ না করলে কোন মুহাদ্দিস বা হাদীস গ্রহণের মর্যাদাও হ্রাস পাবার কথা নয়। যেমন-ইমাম মুসলিমও ইমাম বোখারী থেকে কোন হাদীস নেননি। তাই বলে বোখারী শরীফের বিরুদ্ধে অগ্রহণযোগ্যতার অপবাদ দেওয়া যাবে না। এভাবে ইমাম বোখারী ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহ্ থেকেও হাদীস নেন নি। তাই বলে কি ওই দু'মহান ইমামের বিপক্ষে কোন আপত্তি করা যাবে? মোটেই না। আর ইমাম-ই আ'যমের বিপক্ষে 'তিনি ক্বিয়াস বা যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন' মর্মে দেয় অপবাদও ভিত্তিহীন। বস্তুতঃ তিনি কোন সহীহ্ হাদীসকে বাদ দিয়ে কিংবা সহীহ্ হাদীসের উপর ক্বিয়াসকে প্রাধান্য দিয়ে মাসআলা বের করেন নি; বরং শরীয়তে 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈ' (শরীয়ত সমর্থিত ক্বিয়াস)-এর গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এর পক্ষে যেমন যথেষ্ট পরিমাণ দলীল-প্রমাণ দিয়েছেন, তেমনি প্রয়োজনে ক্বিয়াস-ই শর'ঈর ভিত্তিতে মাসআলাও অনুমান করেছেন। তিনি এর পক্ষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, ক্বিয়াস-ই শর'ঈতো খোদ্ পবিত্র ক্বোরআনসম্মত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- فَاعْتَبِرُوْا يَآاُولِى الْاَبْصَارِ (হে বিবেকবানগণ, শিক্ষা গ্রহণ করো!) এখানে اعتبار (فاعتبروا) মানে ক্বিয়াস-ই শর'ঈ। এভাবে বহু আয়াত ও বহু সহীহ্ হাদীস (যেমন হাদীস-ই মু'আয ইবনে জাবাল)ও এর পক্ষে প্রমাণ বহন করে। অতএব, ইমাম-ই আ'যম যেমনিভাবে আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং বিশ্ব মুসলিমের নিকট মাক্ববূল, তেমনি হানাফীরাও অত্যন্ত ভাগ্যবান।

[সূত্র. মাক্বামাত-ই ইমাম-ই আ'যম, জা-আল হক্ব, ২য় খন্ড, ইমাম আবূ হানীফা আওর উনকে নাক্বিদীন ইত্যাদি]

---o---

আক্বীদার বিশুদ্ধতার সাথে আমল ও সচ্চরিত্রের গুরুত্ব

হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান *

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় বিনম্র হই, যিনি আমাদের বিশুদ্ধ আক্বীদা, গ্রহণযোগ্য নেক আমল ও প্রশংসনীয় চরিত্র শেখানোর জন্য তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম, যিনি আমাদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাসের স্বরূপ ও আমল-আখলাক্বের তা'লীম দিয়েছেন। তাঁর অযুত সাহাবা ও তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী অসংখ্য ওলি-আওতাদ, সর্বোপরি তাঁর আহ্‌লে বায়ত ও পূণ্যাত্মা আওলাদের প্রতি সকৃতজ্ঞ সালাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি, যাঁরা নক্ষত্রের জ্যোতি হয়ে, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর মুক্তির তরণীর মত অবলম্বন হয়ে ধ্বংসের হাত থেকে এ উম্মতকে রক্ষা করেছেন। বিশেষতঃ 'কাশ্‌তিয়ে নূহ' জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা ক্বুত্বুল আউলিয়া, আল-ই রাসূল হাফেয ক্বারী আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, তাঁর যোগ্য সন্তান গাউসিয়া কমিটির মহান প্রতিষ্ঠাতা, জশনে জুলূস-এ ঈদ-এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবক্তা, গাউসে যমান হাফেয ক্বারী আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এবং বর্তমান সাজ্জাদানশীন আল্লামা শাহ্‌সুফী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মুদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র চরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। সর্বোপরি পীরে বাঙ্গাল আল-ই রসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মুদ্দাযিল্লুহুল আলী)'র খেদমতে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অশেষ কৃতজ্ঞতা, যিনি গাউসিয়া কমিটিসহ সকল পীরভাইদের জন্য গাউসিয়া তরবিয়াতী নিসাব প্রণয়ন, বাস্তব ও যুগোপযোগী ব্যবহারিক প্রয়োগের লক্ষ্যে 'দাওরাহ-ই দাওয়াত-ই খায়র'র মত মহান কর্মসূচীর

* **আরবী প্রভাষক-** জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম। **খতীব-** হযরত গরীব উল্লাহ্ শাহ্ মাযার শরীফ জামে মসজিদ, বিশিষ্ট গবেষক, লেখক, সাহিত্যিক, কবি ও ইসলামী বক্তা।

বলিষ্ঠ নির্দেশনা দিয়ে সংশ্লিষ্ট ভাইদের মহান কাজে সম্পৃক্ত করে অপরিমেয় করুণায় ঋণী করেছেন।

গাউসিয়া কমিটির এ মহান কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ'র প্রথম প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী ভাইদের জন্য প্রণীত সিলেবাসে নির্ধারিত একটি বিষয় প্রস্তাবিত শিরোণমটি। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র ক্বোরআনের শরুতে মানব জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি তাক্বওয়ার স্বরূপ বর্ণনায় এরশাদ করেছেন,

الم (١) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)

অর্থাৎ "সেই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব (ক্বোরআন), যাতে নেই সন্দেহের কোন অবকাশ মাত্র, (এটি) তাক্বওয়াবানদের জন্য হিদায়ত; যাঁরা না দেখেও বিশ্বাস করে, নামায ক্বায়েম রাখে, আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি, তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে আর যারা ঈমান আনে সেই কিতাবের প্রতি, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা আপনার আগে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা বিশেষ ইয়াক্বীন (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখে। তারা নিজ পালনকর্তার পক্ষ থেকে হিদায়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর তারাই তো (উভয় জগতে) সফলকাম।[১]

এখানে লক্ষণীয় যে, তিন বিষয়ের অবতারণা হয়েছে এ আয়াতগুলোতে, যা আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। যথা- ১. ঈমান (আক্বীদার বিশুদ্ধতা), ২. নামায প্রতিষ্ঠা (আমলের গুরুত্ব) এবং ৩. তাক্বওয়া (যা ইমান আমল ও আখলাক্বের সমন্বিতরূপ)। আয়াতে উল্লিখিত 'ঈমান' প্রসঙ্গে 'কান্‌যুল ঈমান'র হাশিয়া (পাদটীকা)'য় আছে, 'যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে হিদায়ত ও ইয়াক্বীন সহকারে চূড়ান্তভাবে একথা সাব্যস্ত হয় যে, সেগুলো 'দ্বীন-এ মুহাম্মদী'র অন্তর্ভুক্ত, যে সমস্ত বিষয়কে মেনে নেয়া, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করার নামই প্রকৃত ঈমান। আমল ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ জন্যই

১. সূরা বাক্বারা: আয়াত-২-৫

ঈমান'র পরেই সালাত'র কথা এরশাদ হয়েছে।[১] আরো লক্ষণীয় যে, আক্বীদা-বিশ্বাস, আমল ও আখলাক্ব'র নির্দেশনা সম্বলিত হিদায়তের কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের স্থান নেই। 'লা-রায়বা ফী-হি' বলে কিতাবের প্রতি আক্বীদা-বিশ্বাসকে মজবুত করে নেয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যাত ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (١٣٦)

তরজমা: "হে ঈমানদারগণ, ঈমান রাখো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর এবং ওই কিতাবের ওপর, যা তিনি স্বীয় রাসূলের ওপর, অবতীর্ণ করেছেন আর ওই কিতাবের উপরও, যা এর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণও আখিরাতের দিনকে অমান্য করে, সে দূরবর্তী ভ্রষ্টতায় দিকভ্রষ্ট হয়েছে।[২]

শান-এ নুযূল

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, এ আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, আসাদ, উসাইদ, সা'লাবাহ্ ইবনে ক্বায়স, সালাম, সালমাহ্ এবং ইয়ামীনের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা ছিলেন আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ঈমানদার। একদিন তাঁরা রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, 'আমরা আপনার ওপর এবং আপনার কিতাবের ওপর, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর তাওরীতের ওপর এবং ওযায়র আলায়হিস্ সালাম-এর ওপর ঈমান আনছি; কিন্তু এগুলো ছাড়া অন্যান্য কিতাব ও রসূলগণের ওপর ইমান আনতে পারব না।' তখন আল্লাহ্র রসূল তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা আল্লাহ্র ওপর ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র ওপর, তাঁর গ্রন্থ ক্বোরআন মজীদ ও তৎপরবর্তী প্রত্যেক কিতাবের ওপর ঈমান আনো।" তখন তাঁর এ আহ্বানের সমর্থনে উক্ত আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।[৩]

[১]. তাফসীর-ই খাযাইনুল ইরফান, সদরুল আফাদ্বিল সাইয়্যেদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী, রহমাতুল্লাহি আলায়হি।
[২]. সূরা নিসা: আয়াত- ১৩৬
[৩]. খাযা-ইনুল ইরফান

এ সম্বোধনে যদি ঈমানদার সাহাবীগণকে নির্দেশ করা হয়, তবে অর্থ হবে, "তোমরা এ বিশুদ্ধ আক্বীদার ওপর অটল ও মজবুত থাকো।" যদি আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে বলা হয়, তবে অর্থ হবে, "তোমরা কোন বিশেষ রসূল বা বিশেষ কিতাব নয়; বরং সকল নবী ও রসূল এবং সকল আসমানী কিতাবকে সত্য বলে মেনে নাও। (নচেৎ তোমাদের আক্বীদা বিশুদ্ধ হবে না।)" আর যদি মুনাফিক্বদেরকে সম্বোধন করা হয়, তবে অর্থ হবে, "বাহ্যিক বা মৌখিক দাবী নয়, তোমরা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে আক্বীদা বিশুদ্ধ করে নাও।" এখানে এ পর্যন্ত স্পষ্ট করা হয়েছে যে, 'কোন একজন রসূল এবং একটি মাত্র কিতাবকে অমান্য করাও সব ক'টিকে অমান্য করার শামিল।' [প্রাগুক্ত]

এ আয়াতের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হল যে, সামগ্রিক আমল গ্রহণযোগ্য হবার পূর্বে আক্বীদা-বিশ্বাসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। 'আক্বীদা' শব্দের আভিধানিক অর্থ-এমন কথা, যাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যায়, যাকে মানুষ নিজের ধর্ম-বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করে এবং যার ওপর নিশ্চিতভাবে আস্থা রাখে।[১] এটি ঈমান, ইয়াক্বীন ও তাসদীক্ব প্রভৃতি শব্দের সমার্থক। মোটকথা, ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিশব্দ 'আক্বীদা'-এর বহুবচন 'আক্বা-ঈদ'। 'ঈমান'র আভিধানিক অর্থ التصديق بالقلب অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা।[২]

শরয়ীতের পরিভাষায়, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যা কিছু নিয়ে তাশরীফ এনেছেন, সবকিছুর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস করা, সবকিছু সত্য বলে মেনে নেয়ার নাম ঈমান। ক্বোরআন মজীদে যে সব আয়াতে আমলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলোতে আমলের সাথে বিশুদ্ধ আক্বীদা তথা ঈমানের অপরিহার্যতা পূর্বশর্তের মত সংযোজিত রয়েছে। তেমন কয়েকটি আয়াত প্রামাণ্য রূপে স্বর্তব্য। ঈমান ও নেক আমলবিহীন মানবজীবন ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে,

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

[১]. মিসবাহুল লুগাত, মু'জামুল ওয়াসীত্ব
[২]. মুফতী সায়্যিদ আমীমুল ইহসান: কাওয়াইদুল ফিক্বহ্, পৃ. ২০০

তরজমা: "ওই মাহবুবের যুগের শপথ, নিঃসন্দেহে মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, কিন্তু (তারা ছাড়া), যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আর পরস্পরের হকের সহায়তা করেছে এবং একে অপরকে ধৈর্যের সদুপদেশ দিয়েছে।[১]

ইরশাদ হয়েছে-

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٢٤)

তরজমা: "পুরুষ বা নারী যা কিছু নেক আমল (সৎ কাজ) করবে, যদি ঈমানদার হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদেরকে অণু পরিমাণও প্রতিদান বঞ্চিত করা হবে না।[২]

এখানে নেক কাজের প্রতিদানের জন্য বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস অপরিহার্য করা হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

তরজমা: "যে ব্যক্তি নেক আমল করে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, সে ঈমানদার হলে অবশ্যই আমি তাকে এক পবিত্র জীবন দানে ধন্য করবো। আর আমি তাদেরকে প্রতিদান দেবো তাদের আমলের চেয়েও অধিকতর সুন্দর।"[৩]

পরকালের উত্তম জীবন লাভের মত আমলের পূর্বশর্ত বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস। ঈমানদারের নেক আমল ও প্রচেষ্টা বিফল হয় না। আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্যই সংরক্ষণ করেন। এ মর্মে এরশাদ হয়েছে-

فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (٩٤)

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন নেক আমল ওই অবস্থায় সম্পাদন করে যে, তার প্রচেষ্টার অস্বীকৃতি নেই আর নিশ্চিতভাবে আমি অবশ্যই তা লিপিবদ্ধকারী।[৪]

মানুষের কর্মফল বিনষ্ট না হয়ে সংরক্ষিত থাকার জন্য বিশুদ্ধ আক্বীদার ভিত্তিতে করা জরুরী, অন্যথায় তার প্রতিদান বিফলে যাবে। বদ-আক্বীদা সম্পন্ন ব্যক্তির আমল পরকালে কোন কাজে আসবে না।

১. সূরা আসর: আয়াত-২-৪
২. সূরা নিসা: আয়াত-১২৪
৩. সূরা নাহল: আয়াত-৯৭
৪. সূরা আম্বিয়া: আয়াত-৯৪

ঈমান-আক্বীদা বিশুদ্ধ না হলে যত মহৎ কাজই মানুষ করুক না কেন আল্লাহ্ ও রসূল তা পুণ্য কাজ হিসাবে গণ্য করেন না, শরীয়তে তা নেক আমল হিসাবে বিবেচিত হয় না। এমনকি পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণ তার মুক্তিপণ স্বরূপ দেয়া হলেও তা গ্রহণ করা হবে না। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (٩١)

অর্থাৎ ওইসব লোক, যারা কুফরী করেছে এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছে কাফির অবস্থায় তাদের মধ্যে কারো পক্ষ থেকে পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণও কখনো কবুল করা হবে না, যদিও তারা তা নিজেদের মুক্তির জন্য ফিদ্ইয়া (মুক্তিপণ) দেয়। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি, তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।[১]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَلَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمِنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

অর্থাৎ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে প্রতিদান প্রত্যাশায় মাহে রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বেকার গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি রমযান মাসে ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যাশায় (তারাভীহর) নামাযে দাঁড়ায়, তার অতীতের পাপসমূহ মার্জনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি পুণ্যের আশায় ক্বদরের রাতে নামাযে দাঁড়ায়, (রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত বন্দেগী করে) তার অতীতের পাপরাশি ক্ষমা করা হয়।[২]

এখানে রোযা ও নামাযের প্রতিদান পেতে ঈমান-বিশ্বাসের শর্ত আরোপিত হয়েছে।

ইসলামের দাওয়াত বা প্রচারের ক্ষেত্রেও দেখা যায় আমলের পূর্বে আক্বীদা বিশ্বাসের বিষয়টি উত্থাপিত হয়, কারণ বিশ্বাসের ভিত রচিত না হলে আমলের ক্ষেত্র তৈরী হয় না। যার আক্বীদা বিশুদ্ধ হয়নি, তার কাছে আমলের কথা অবান্তর। যেমন কিতাবুয্ যাকাতের হাদীসে রয়েছে-

১.সূরা আল-ই ইমরান, আয়াত-৯১
২. বুখারী ও মুসলিম শরীফের বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃ. ১৭৩

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا اَهْلَ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلَى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَآءِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

অর্থাৎ হযরত সায়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে যখন ইয়ামনে প্রেরণ করছিলেন, তখন তাঁকে নসীহত করে বলেন, নিশ্চয় তুমি যাচ্ছ আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এক জনগোষ্ঠির কাছে। সুতরাং তুমি তাদেরকে (প্রথমতঃ) আহ্বান করো এ কথার স্বাক্ষ্য দিতে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ আক্বীদা মেনে নেয়, তখন তাদের জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি তাও মেনে নেয়, তখন তাদেরকে জানিয়ে দিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের ওপর মালের সদক্বাহ্ (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে আহরণ করে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। যদি তারা এ নির্দেশনা মেনে নেয়, তবে তাদের উত্তম সম্পদ (আদায় করা) থেকে নিবৃত্ত থেকো। মযলূমের ফরিয়াদকে ভয় করো। কারণ সেটা ও আল্লাহ্র মধ্যখানে কোন পর্দা থাকে না।[১]

নামায দৈহিক ইবাদতের মধ্যে প্রধান এবং যাকাত আর্থিক ইবাদতের মধ্যে প্রধান। এ দু'টি ইবাদতের নির্দেশনার সাথে প্রথমেই যে বাণীর আনুগত্য করার শর্ত আরোপ হয়েছে সেটা ঈমান-আক্বীদার মূল বাণী। তাই নিঃসন্দেহে এ দাবী প্রতিষ্ঠিত হয় যে, শরীয়তের আমল প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আক্বীদার বিশুদ্ধতা অলংঘনীয় ও জরুরী।

আক্বীদার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার এ বিশেষণ যুক্ত হওয়াই প্রমাণ করছে যে, ঈমান-আক্বীদার মধ্যে ইসলামের মৌলিক রূপরেখার বিপরীতে অশুদ্ধ ও বাতিল

[১]. বুখারী ও মুসলিম

আক্বীদা বিশ্বাসের প্রচলন বর্তমান সমাজে ব্যাপকহারে দেখা দিয়েছে। অথচ সাহাবা-ই কেরাম থেকে এ পর্যন্ত ইসলামের শাশ্বত বিশুদ্ধ আক্বীদা দর্শনের ধারক-বাহক হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।

সাহাবা-ই কেরামের অনুসৃত পথ ও মত একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। এটা একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল। এ উম্মতের সঠিক পথের ভ্রান্ত দাবীদার বাকীসব পথ ও মত গোরাহীতে নিমজ্জিত, বাতিল ফির্কা ও জাহান্নামী। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেছেন। তিনি এরশাদ করেন-

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اُمَّتِىْ كَمَا اَتَى عَلَى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَالنَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتَى اُمَّه عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّصْنَعُ ذَالِكَ وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلَى ثَلاَثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ فِى رِوَايَةِ اَحْمَدَ وَاَبِىْ دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ

অনুবাদ: আমার উম্মতের কাছে বনী ইসরাঈলের মত হুবহু সময় আসবে, যেভাবে জুতো জোড়া একটি অপরটির অনুরূপ হয়। এমনকি তাদের মধ্যেও কেউ প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে অনাচারে লিপ্ত হলে, আমার উম্মতের মধ্যেও সে রকম আচরণ করার মত লোকও পাওয়া যাবে। নিশ্চয় বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তেয়াত্তর দলে। একটি মাত্র দল ছাড়া তাদের বাকী সবাই হবে দোযখী। তখন উপস্থিত লোকেরা আরয করলো, তারা কারা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (অর্থাৎ কারা হক পন্থী?) তখন তিনি এরশাদ করলেন, যে আক্বীদা ও আদর্শে আমি এবং আমার সাহাবীরা আছি। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী সংকলন করেছেন। হযরত মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে আহমদ ও আবূ দাঊদ'র এক রেওয়ায়তে আছে, (তাদের) বাহাত্তর দল

যাবে দোযখে, আর শুধু একটি দল যাবে জান্নাতে। সেটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।[১]

প্রতি যুগে সাহাবা-এ কেরামের আক্বীদার সাথে সঙ্গতি ও মিল পাওয়া যায় শুধু আহলে সুন্নাতের সাথে। বুঝা যায়, বাদ বাকী দল-উপদলের আক্বীদা বিশুদ্ধ নয়।

পবিত্র হাদীসের পরিভাষায় 'আল জামা'আহ্' 'আস্সাওয়াদুল আ'যম', 'সাবীনুল্লাহ্', 'সিরাতে মুস্তাকীম'-এসব শব্দগত ভিন্নতায় মৌলিক আক্বীদায় অভিন্ন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতেরই নাম। হানাফী, শাফে'ঈ, মালেকী, হাম্বলী, কাদেরী, চিশতী প্রভৃতি আমলগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন সাধন প্রক্রিয়ায় মৌলিক আক্বীদায় এক ও অভিন্ন দল সুন্নী জামাত।

আক্বীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের পরিপন্থী যত ভ্রান্ত দল, সবাই বাতিল ফির্কা। বর্ণিত হাদীসে 'আমার উম্মত' বলে কাদের বুঝানো হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় হাদীসবেত্তাগণ বলেন, উম্মত দু'প্রকার, ১. উম্মতে দাওয়াত। যাদের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত প্রদত্ত হয়েছে; কিন্তু তারা গ্রহণ করেনি। যেমন কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারা প্রভৃতি। ২. উম্মতে ইজাবত, যারা দাওয়াত কবুল করেছে। এ হাদীসে দ্বিতীয় প্রকার উম্মতকেই বুঝানো হয়েছে। পরবর্তীতে 'নবীর উম্মত পরিচয়েই' যারা বিভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করবে (যেমন, আল্লাহ্র জন্য দেহাকৃতি সাব্যস্ত করা, মিথ্যাচারের সম্ভাবনা রাখা, রাসূল আমাদের মত দোষে গুণে সাধারণ, মূর্খ, নিরক্ষর, অক্ষম, মৃত নবী, মাটির নবী, শ্রেষ্ঠ হলেও সর্বশেষ নন ইত্যাদি, অনুরূপ তাক্বদীর অস্বীকার করাসহ, যা সাহাবীগণের আক্বীদার বিপরীত) এরাই বাহাত্তর জাহান্নামী দল বলে গণ্য। পক্ষান্তরে, সঠিক আক্বীদায় আছেন সাহাবা, তাবে'ঈ, তাব'ঈ তাবে'ঈন, খোলাফায়ে রাশেদীন, গাউস, কুত্বব, আবদাল, আওতাদ, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদগণ, যাঁরা নেয়ামতপ্রাপ্ত, যাঁদের অনুঃসৃত পথ ও মতই সিরাতে মুস্তাক্বীম। আবহমানকাল ধরে তাঁদের আক্বীদা পোষণকারী দলই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

[১]. মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃ. ৩০, (মিরক্বাত প্রণেতা মোল্লা আলী ক্বারী রহ. তাঁর গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন)। এবং ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা, পৃ. ২০, কৃত. আল্লামা কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফী।

خَطَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوْطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هٰذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوْ اِلَيْهِ وَقَرَأَ ((وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ)) الاية (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

অর্থাৎ একবার আল্লাহর রাসূল আমাদের সামনে একটি রেখা আঁকলেন। অতঃপর বললেন, এটি আল্লাহর রাস্তা। অতঃপর রেখাটির ডানে ও বামে আরো কিছু রেখা আঁকলেন এবং বললেন, এগুলো ভিন্ন রাস্তা, প্রতিটির ওপর বসা আছে শয়তান, যে মানুষকে নিজের দিকে ডাকতে থাকবে। এরপর তিনি ক্বোরআনের আয়াত- ''ওয়া আন্না হা-যা সিরাত্বী মুস্তাকীমান ফাত্তাবি'ঊ-হু'' তেলাওয়াত করলেন।[১]

এভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعا لِمَا جِئْتُ بِهِ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমি যা (নির্দেশনা) নিয়ে এসেছি, তার অনুবর্তী হবে না।[২]

মোটকথা, যে সমস্ত বিষয় আক্বীদা সংক্রান্ত, তাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য নয়, এমন কিছু সম্পর্কিত করা যাবে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা বিষয়ক গ্রন্থাবলি অধ্যয়নপূর্বক কিংবা নির্ভরযোগ্য ওলামা-ই আহলে সুন্নাতের কাছ থেকে ভালভাবে জেনে নিয়ে মৌলিক আক্বীদার মাসা-ইল নিশ্চিত হওয়া জরুরী।

ওপরে ধোঁয়া দেখে যেমন নিশ্চিত বলা যায় যে, ভেতরে আগুন আছে, বৃক্ষের জীবন থাকলে যেমন তার শাখা-প্রশাখা, ফুল-ফল অবশ্যম্ভাবী, তেমনি ঈমান সজীব থাকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেক আমলগুলোও এর ফুল ফল হয়ে বিকশিত হবে। আমাদের মনে রাখা উচিৎ, নেক আমল তো ঈমানেরই অলঙ্কার, ঈমানদারই নেক আমলের হক্বদার, ঈমান বুকে ধারণ করে ঈমানদার

[১]. আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী মিশকাত গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৩০

[২]. শরহুস সুন্নাহ্ গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণিত। দ্র. প্রাগুক্ত।

আমলবিহীন থাকতে পারেনা। পৃথিবীর এ জীবন আমলেরই ক্ষেত্র। পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً

অর্থাৎ তিনিই (ওই মহান সত্তা), যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যাচাই করে দেখবেন যে, তোমাদের মধ্যে কার আমল সুন্দরতম।[১] মানব সৃষ্টির তাৎপর্য উপলব্ধি করলে ঈমানদার আমল থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারেনা। তাক্বদীরে মানুষের শেষ পরিণতি যাই থাকুক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দৃষ্টিতে আমল আমাদের করতেই হবে। অদৃষ্টের পরিণতিই চূড়ান্ত বলে আমল ছেড়ে দেওয়া চলবে না। এ প্রসঙ্গে শেরে খোদা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَده مِنَ النَّارِ وَمَقْعَده مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَندع الْعَمَل ـ قَالَ اِعْمَلُوْا كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهٗ اما مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الاخـ ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থাৎ আল্লাহর রসূল এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার জাহান্নামের ঠিকানা ও যার জান্নাতের ঠিকানা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। উপস্থিত লোকেরা আরয করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ্, তবে কি আমরা আমাদের অদৃষ্ট লিপির ওপরই ভরসা করবেনা না এবং 'আমল' ছেড়ে দেব না? তিনি এরশাদ করলেন, আমল করতে থাকো। প্রত্যেকের জন্য ওই আমল সহজ করে দেয়া হবে, যার (পরিণতির) জন্য সে সৃষ্ট হয়েছে। যদি কেউ সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সৌভাগ্যবানদের আমল তার জন্য সহজ করা হবে। আর যদি কেউ হতভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে হতভাগাদের আমল তার জন্য সহজ করা হবে। অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'ফা আম্মা মান আ'তা ওয়াত্তাকা ওয়া সাদ্দাক্বা বিল হুসনা'- আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।[২]

[১]. সূরা মূলক: আয়াত-২

[২]. متفق عليه (মুত্তাফাক আলাইহি) যে হাদীস অভিন্ন শব্দমালায় বুখারী ও মুসলিম উভয় সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ তা হাদীস শাস্ত্রে 'মুত্তাফাক্ব আলাইহি' বলা হয়। গ্রন্থদ্বয় হতে মিশকাত (পৃ.২০) গ্রন্থে সংকলিত।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নেক আমলকে ক্ষুদ্র করে দেখতে নেই, বর্জন করতে নেই। ইখলাস (নিষ্ঠা)'র সাথে করা সামান্য আমলে যদি আল্লাহ্ ও রসূল সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে তার চেয়ে বড় আমল কী? এ জন্যই হাদীস শরীফে এসেছে وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْأً مِّنَ الْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ নেক আমলের কোন কিছুকেই মা'মূলী ভেবো না।

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার জন্য হায়াত সৃষ্টি করে দেখতে চান, তাদের মধ্যে কে সুন্দর আমলকারী। ভাল আমলকারী কে, এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হারাম থেকে বাঁচবার এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের আনুগত্য করার অধিকতর আগ্রহী ব্যক্তিই ভাল আমলকারী।[১]

মহান রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ O

অর্থাৎ হে মাহবূব, আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো, তবে আমার আনুগত্য কর। তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।[২]

আরো এরশাদ হয়েছে- مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।[৩]

হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূলের নির্দেশনাই সর্বোত্তম হেদায়ত। যেমন-

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অর্থাৎ হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হামদ ও সালাতের পর, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাব ও সর্বোত্তম তরীকা (পথ নির্দেশনা) হলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

[১]. তাফসীরে কুরত্ববী

[২]. সূরা আল-ই ইমরান: আয়াত-৩১

[৩]. সূরা নিসা: আয়াত-৮০

ওয়াসাল্লাম)'র তরীক্বা। আর সর্বনিকৃষ্ট বস্তু হল দ্বীনের বিদ'আতসমূহ এবং প্রত্যেক বিদ্'আতই গোমরাহী (পথভ্রষ্টতা)[১]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করলে সাধারণ মু'মিনও আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। তাহলে তাঁর মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চলা-ফেরা, উঠা-বসা, চাল-চলনসমূহ আল্লাহর কাছে যে কত পছন্দের তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন, তাই হবে সুন্দর আমল।

পবিত্র ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র অনুসরণই উত্তম, তারই জন্য যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।[২]

সোজা কথায় রাসূলুল্লাহর পবিত্র সুন্নাতগুলোই আমাদের জন্য উসওয়া-ই হাসানা, যার অনুসরণ পরকাল প্রত্যাশীদের জন্য পাথেয় স্বরূপ। মহান রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী বান্দামাত্রই নেক আমল'র পুঁজি সঞ্চয় করবেন। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)

সুতরাং, যার নিজ পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করার আশা আছে, সে যেন নেক আমল সম্পাদন করে, আর সে যেন আপন প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।[৩]

বিশুদ্ধ আক্বীদাসহ যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করবে, তার প্রতিদান কমপক্ষে দশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে-

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ

অর্থাৎ যে কেউ একটা সৎকাজ করবে, তবে তার জন্য তদনুরূপ দশগুণ রয়েছে।[৪]

[১].মুসলিম শরীফের বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃ. ২৭
[২]. সূরা আহযাব: আয়াত-২১
[৩]. সূরা কাহ্ফ: আয়াত-১১০
[৪]. সূরা আনআম: আয়াত-১৬০

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় আছে, ''যে একটা সৎকাজ করবে, তাকে দশটা সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে এবং এটাও চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসারে নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যত চান ততই তার সৎকর্মসমূহের প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন, একটার প্রতিদান সাতশ' গুণও করবেন, কিংবা অগণিত দান করবেন। মূলকথা হচ্ছে এ যে, সৎকর্মসমূহের প্রতিদান নিরেট অনুগ্রহই। এটা হচ্ছে 'আহলে সুন্নাত'-এর অভিমত। আর অপকর্মের এতটুকু শাস্তিও তাঁরই ইনসাফ।[১]

দৈনিক পাঁচবার কোন মানুষ যদি বাড়ীর সম্মুখস্থ পুষ্করিনী মুখ হাত পা ধৌত করে, তবে তার শরীরের যেমন কোন ময়লা আবর্জনা থাকতে পারেনা, তেমনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত পাঁচ বার নামায আদায় করলে ওই ব্যক্তির কোন গুনাহর ময়লা থাকতে পারে না- এ উদাহরণ টেনে আল্লাহর রাসূল সাহাবা-ই কেরামের নিকট নামাযের গুরুত্ব ও মহিমা বর্ণনা করেছেন। রোযা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার জন্য মু'মিনের ঢাল স্বরূপ। মু'মিন বান্দা আল্লাহর রাস্তায় অর্থ সম্পদ ব্যয় করলে তার উদাহরণ বপন করার শস্য বীজের মত, যা একটি হতে সাতটি শীষ গজিয়ে প্রতিটি শীষে একশ' করে একটি দানা সাতশ' হয়ে ফিরে আসে- ক্বোরআন-ই করীমে এ উদাহরণ সম্পদের মাধ্যমে নেক আমলের দিকে উৎসাহ্ প্রদত্ত হয়েছে। যাতে বান্দা কোন প্রকার নেক আমল তরক না করে এবং কোন উত্তম প্রতিদান থেকেও বঞ্চিত না হয়। ফাযা-ইলের কিতাবসমূহে নেক আমলের প্রতিদান ও ফযীলত ব্যাপকহারে বর্ণিত হয়েছে, কলেবর বৃদ্ধির সম্ভাবনা এড়াতে বিশদ আলোচনা করা হল না।

আমরা, প্রতিটি মু'মিন বান্দার এ উপলব্ধি অবশ্যই আছে যে, সঠিক ও বিশুদ্ধ আক্বীদার ধারক প্রকৃত একজন মু'মিন অবশ্যই সচ্চরিত্রে চরিত্রবান। সচ্চরিত্রের বিশেষায়ন দুশ্চরিত্রের অস্তিত্বকে বর্জনের পরোক্ষ বক্তব্য বহন করে। কারণ দুশ্চরিত্র হওয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। আর সচ্চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া সত্যিকার মু'মিনের পরিচায়ক।

সচ্চরিত্রের আরবী প্রতিরূপ আখলাক্বে হাসানা আখলাক্ব শব্দটি 'খুলুক্ব'-এর বহুবচন। এর সাথে ক্বোরআনে বর্ণিত বিশেষণ আযীম। যেমন পবিত্র ক্বোরআনের সূরা ক্বালাম-এ এসেছে إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (অর্থাৎ হে মাহবুব,

[১]. খাযা-ইনুল ইরফান, (কৃত. মূল: সদরুল আফাযিল আল্লামা সায়্যিদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রহ. অনুবাদ, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান)

নিঃসন্দেহে আপনি 'খুলুক্বে আযীম' তথা সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত আছেন। এ ছাড়া ক্বোরআন-সুন্নাহ'র সাথে সংযোজিত বিশেষণ দেখা যায়, مَكَارِمُ الْاَخْلَاقِ (মাকারিমে আখলাক্ব), مَحَاسِنِ اَخْلَاقِ (মাহাসিনে আখলাক্ব) ইত্যাদি শব্দমালা। সবগুলো বর্ণিত সচ্চরিত্রেরই অর্থবোধক শব্দ।

উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে আখলাক্বে নবভী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, প্রিয় নবীর অনুপম চরিত্র-মাধূর্যের স্বরূপ ছিল মূর্ত ক্বোরআন। অর্থাৎ পবিত্র ক্বোরআনের বাস্তব নমুনা হল তাঁর পবিত্র আখলাক্ব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে শুধু ক্বোরআনে বর্ণিত 'উস্ওয়া-ই হাসানা' ও 'খুলুক্বে আযীম'র জীবন্ত নমুনাই ছিলেন, তা নয় বরং মানব জগতে তাঁর প্রেরিত হওয়ারও এক মহান উদ্দেশ্য ছিল উম্মতের মধ্যে সচ্চরিত্রের বিকাশ সাধন। সেই মহান লক্ষ্যের কথা তাঁর পবিত্র বাণীতেই নিহিত।

عَنْ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ بَلَغَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِاُ تَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ رَوَاهُ فِى الْمُؤَطَّا وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ-

অর্থাৎ হযরত মালেক ইবনে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট (সংবাদ) পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি চরিত্র সৌন্দর্যের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরিত হয়েছি। তিনি (বর্ণনাকারী) এ হাদীস শরীফ তাঁর 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমদ এটি আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।[১]

এ হাদীস মুবারকের ব্যাখ্যায় শাইখে মুহাক্কিক হযরত আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, "বর্ণনান্তরে حُسْنَ الْاَخْلَاقِ (হুসনাল আখলাক্ব) এ শব্দের স্থলে مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ (মাকারিমাল আখলাক) শব্দ রয়েছে। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, আরব জনগোষ্ঠীদের মধ্যে যতদিন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের শরীয়তের সুন্দর নমুনাগুলো অবশিষ্ট ছিল, ততদিন তারা সুন্দরতম চরিত্রে সমৃদ্ধ ছিল। এর অধিকাংশই প্রত্যাখ্যান করে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং সেখানে জাহেলী যুগের

[১]. মুওয়াত্তার বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃ. ৪৩২

আহকামগুলোর সংমিশ্রণ ঘটায়। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুন্দরতম চরিত্র সুষমার পূর্ণতা বিধানের মহান লক্ষ্যে প্রেরিত হন।[১]

সরকার-ই দোআলম আরো এরশাদ করেন, সচ্চরিত্র ব্যক্তিই উত্তম ব্যক্তি। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।[২]

সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র উভয় প্রকার অবস্থায় মানুষের মাঝেই বিদ্যমান। নন্দিত-নিন্দিত উভয় প্রকারের মানুষ নিয়েই আমাদের সমাজ। তাই এর স্বরূপ কী? আমরা এ মানদন্ডে কীভাবে নিজেকে যাচাই করবো। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে রাসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন, যেহেতু বিষয়টি মনঃস্তত্ত্ব সম্পর্কিত ও আপেক্ষিক, তাই আমাদের জন্য তাঁরই নির্দেশনা আত্মবিশ্লেষণের সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে। হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'পূণ্য' আর 'পাপ'-এর স্বরূপ সম্পর্কে আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিকট জানতে চাইলাম। তিনি এরশাদ করলেন, সচ্চরিত্রই পুণ্য এবং যা তোমার অন্তরে খটকা জাগায়, যা মানুষের গোচরীভূত হওয়াকে তুমি অপছন্দ কর, তা-ই পাপ।[৩]

নিজেরা আমরা যা-ই হই না কেন, মানুষের কাছে নিজেকে সুন্দর, নান্দনিক ও প্রশংসার পাত্র হিসেবে দেখাতে চাই, প্রমাণ করতে চাই। তা ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান যাকে সুন্দর হিসাবে দেখে, আল্লাহর কাছেও তা সুন্দর। কারণ মানুষ আল্লাহর কাছে একে অপরের স্বাক্ষী হিসাবে বিবেচিত। তাই মানুষের দৃষ্টিতে যা গর্হিত, অনৈতিক, অপছন্দের, তা সচ্চরিত্রের পরিপন্থী। যা অপরের কাছে আমি দেখতে পছন্দ করি না, যে আচরণের প্রশংসা করা যায় না, তার সবটাই সচ্চরিত্রের বিপরীত। মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সচ্চরিত্রের বিশ্লেষিত সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

[১]. প্রাগুক্ত হাদীসের হাশিয়া (প্রান্ত টীকা)
[২]. বুখারী ও মুসলিম থেকে প্রাগুক্ত গ্রন্থে সংকলিত
[৩]. মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃ. ৪৩১

هُوَ الْاِنْصَافُ فِى الْمُعَامَلَةِ وَبَذْلُ الْاِحْسَانِ وَالْعَدْلِ فِى الْاَحْكَامِ وَالْاَظْهَرُ اَنَّهُ الْاِتِّبَاعُ بِمَا اَتَى بِهِ النَّبِىُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ وَاٰدَابِ الطَّرِيْقَةِ وَاَحْوَالِ الْحَقِيْقَةِ ـ

অর্থাৎ তা হলো লেনদেনে ইনসাফ রক্ষা করা, সৌজন্য ব্যয় করা, আহকামের মধ্যে মধপন্থিতা। সর্বোপরি ব্যাখ্যার সারকথা হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের নীতিমালা তরীক্বতের বিধি-বিধান, হাক্বীক্বতের অবস্থাদির যে বিবরণ দিয়েছেন, তার পরিপূর্ণ ইত্তেবা' বা আনুগত্যে সমর্পিত হওয়ার মানসিকতাই সচ্চরিত্র।[১]

সচ্চরিত্রের প্রকৃত উৎস অন্তর। এখান থেকে মার্জিত রূপ আচরণে প্রকাশিত হয়। যেমন খনি থেকে সম্পদ উৎসরিত হয়, আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা। তাই এই আখলাক্বের ও আত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার সৌন্দর্যই বাঞ্ছনীয়।

ইমাম গায্যালী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, ''আল্লাহ্ তা'আলা ইনসানকে দু'টি বস্তুর সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। একটি দেহ ও অপরটি রূহ। দেহ বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয়, আর রূহকে 'আক্বল বা প্রজ্ঞা দিয়ে। একটির সৌন্দর্য خُلْق (খালক্ব বা) দৈহিক সৌন্দর্য, অপরটির সৌন্দর্যকে حُسْن خُلق (হুসনে খুল্ক্ব) বা আত্মিক সৌন্দর্য বলে অভিহিত করা হয়।[২]

যাহির-বাত্বিন উভয় প্রকার সৌন্দর্যে ধন্য হলে একজন মানুষ হয় পরিপূর্ণ সুন্দর। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উভয়বিধ সৌন্দর্যের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা করতেন। মু'মিন জননী সায়্যিদা আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রায়শঃ (প্রার্থনায়) বলতেন, হে আল্লাহ্, তুমি আমার বাহ্যিক আকৃতিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছ, অতএব, আমার প্রকৃতিগত আচরণগুলো (স্বভাব-চরিত্র)ও সৌন্দর্যমন্ডিত রেখো।[৩]

মানুষের কথা-বার্তা, চাল-চলন সবকিছুতে বিনম্র হওয়া, শালীন ও মধুর আচরণ সচ্চরিত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এভাবে আমানতদারী, ওয়াদা রক্ষা, কথা ও কাজে সততা ও সামঞ্জস্য রাখা অন্যের বিপদে সমবেদনা, সহানুভূতিসহ সাধ্যমত

১. মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কৃত. মিরকাত শরহে মিশকাত
২. কিমিয়া-এ সা'আদাত, (১ম পরিচ্ছেদ, ৩য় রুকন,) কৃত. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, ওফাত-৫০৫হি.
৩. মিশকাতুল মাসাবীহ্, পৃ.

সহায়তা প্রদান করা, সহিষ্ণুতা, অল্পে তুষ্টি, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ ইত্যাদি সচ্চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক। ইমাম গাযযালী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস চয়ন করেছেন যে, এক ব্যক্তি হুযূর-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম), দ্বীন কী? তিনি এরশাদ করলেন, সচ্চরিত্র। লোকটি ডানে-বামে ঘুরে ঘুরে একই প্রশ্ন করতে লাগল, আর প্রিয়নবীও বারবার একই উত্তর দিলেন। শেষে তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, তুমি জান না, দ্বীন তো এটিই (অর্থাৎ সচ্চরিত্র)।[১]

---o---

১. কিমিয়া-ই সা'আদাত।

দা'ওয়াত

ক্বোরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফের আলোকে

রিসালত ও দ্বীন-প্রচার

ড. মাওলানা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী*

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি মানব জাতির হেদায়াতের জন্য পৃথিবীতে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। রাহ্মাতুললিল্ আলামীন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দুরূদ ও সালাম। আহ্লে বায়ত, সাহাবী, তাবি'ঈন, তব'ই তাবি'ঈন, মুজ্তাহিদীন, সাল্ফ-ই সালিহীন ও বুযর্গানে দ্বীন-এর প্রতি রহ্মত বর্ষিত হোক, যাঁদের ত্যাগ, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারিত ও প্রসারিত হয়।

সৃষ্টির শুরু থেকে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর নির্দেশিত পথে পরিচালনা করার জন্য যুগে যুগে তাঁর মনোনীত অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ "আল্লাহ্ ফিরিশতা ও মানব থেকে রাসূলদের মনোনীত করেন।"[১]

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তিনি আল্লাহর পথে সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াতদাতা। এ নিবন্ধে আমি রসূগণের রিসালত এবং তাঁদের দ্বীন প্রচার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

---

* **মুহাদ্দিস**- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

১. আল্ কুরআন, সূরা আল্ হাজ্জ : ৭৫।

।।এক।।

রিসালত পরিচিতি

'রিসালত' আরবী (ر س ل) রা, সীন, লাম থেকে উদ্গত। এটি اسم مصدر একবচন, বহুবচনে اَلرِّسَالَاتُ বা اَلرَّسَائِلُ (রিসালত বা রাসাইল) আভিধানিক অর্থে 'রিসালাত' হল বার্তাবহন বা দৌত্যকার্য,[১] চিঠি, পত্র, বার্তা, সন্দর্ভ, থিসিস, পুস্তিকা, মিশন, কর্তব্য, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, রিসালত,[২] সম্বোধন, কিতাব,[৩] লিখিত সহীফা,[৪] লিখিত বিষয়বস্তু বা মাকতূব[৫] এবং বক্তব্য, যা কোন ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রাপ্ত হয়ে বহন করে নিয়ে আসে, চাই সেটা লিখিত হোক অথবা অলিখিত[৬] প্রভৃতি। সাধারণ অর্থে, যা কিছু প্রেরণ করা হয়, তাকেই আমরা রিসালাত বলে জানি। ইংরেজীতে একে Message, Letter, Note, Dispatch, Communication বলা হয়।[৭]

ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের হিদায়াতের জন্য তাদের মধ্য হতে মনোনীত নবী-রাসূল-এর মাধ্যমে যে সব বাণী পাঠিয়েছেন তা রিসালাত। আর যাঁরা এর ধারক-বাহক তাঁরা হলেন সম্মানিত রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা একান্ত ইচ্ছায় তাঁদের মনোনয়ন দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ "নিশ্চয় তাঁরা ছিলেন আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"[৮]

আল্লামা নাসাফী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, هِيَ سَفَارَةُ الْعَبْدِ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْ خَلِيْقَتِهِ "রিসালাত হল আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্টিকুলের জ্ঞানীদের মধ্যে কোন বান্দার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা।"[৯]

অতএব, আল্লাহ তা'আলা যাঁদের মনোনীত করেন তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও গুণাবলী জন্মগতভাবে ও স্বভাবগতভাবে সৃষ্টি করে দেন। মক্কার

১. অধ্যাপক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আক্বা-ইদুল ইসলাম।
২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল মু'জামুল ওয়াফী, সং ১১ (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.) পৃ. ৫০৮।
৩. ড. ইবরাহীম মাদকুর, আল্ মু'জামুল ওয়াসীত্ব (দিল্লী: দারুল ক্বলম, তাবি) পৃ. ৩৪৪।
৪. লুইস মালূফ, আল্ মুনজিদ, সং ২৪ (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তাবী) পৃ. ২০৯।
৫. মুনীর আল বা'লাবাক্কী, আল্ মাওরিদ (বৈরূত: দারুল ইলমি লিল্ মালাইয়্যিন ১৯৭৬ খ্রি.) পৃ. ৫৮৩।
৬. মু'জামু লুগাতিল ফুক্বাহা পৃ.২২২।
৭. মুনীর আল বা'লাবাক্কী, আল্ মাওরিদ (বৈরূত: দারুল ইলমি লিল্ মালাইয়্যিন ১৯৭৬ খ্রি.) পৃ. ৫৮৩।
৮. আল্ কুরআন, সূরা সোয়াদ : আয়াত ৪৭।
৯. শারহু আকায়িদে নাসাফী (চট্টগ্রাম: আল্ মাকতাবাতুদ্ দ্বামীরিয়্যাহ্, তাবি) পৃ. ১২৭।

কাফিররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতকে অস্বীকার করলে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ "আল্লাহ্ তাঁর রিসালাতের ভার কার উপর অর্পণ করবেন তা তিনিই ভাল জানেন।"[১]

ইমাম আবূ জা'ফর ত্বাহাভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন,

إِنَّ الرِّسَالَةَ هِيَ أَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلِصِيْنَ الصَّالِحِيْنَ
نَبِيًّا ثُمَّ نَبَّأَهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُّبَلِّغَ غَيْرَهُ.

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের থেকে কাউকে নবী নির্বাচিত করার পর তাঁকে আসমানী সংবাদ প্রেরণ করে তা অন্যদের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব প্রদানকে রিসালাত বলে।"

ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী বলেন,

اَلرِّسَالَةُ هِيَ أَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ الرَّسُوْلَ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهِ وَيُبَلِّغُهُ

"রিসালাত হল, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক শরী'আত সহকারে রসূল প্রেরণ করা, যা তিনি পালন করেন এবং এর প্রচার করে থাকেন।"

এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে,

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"আমি সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী করে রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২]

ক্বোরআনুল করীমের আলোকে নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত

ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রবর্তন, প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

১. আল্ কুরআন, সূরা আন্'আম : ১২৪।
২. আল্ কুরআন, সূরাহ্ আন্ নিসা : ১৬৫।

"তিনি ওই সত্ত্বা, যিনি উম্মী লোকদের মধ্যে এক রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেন তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।"[১]

সুতরাং আয়াতসমূহের তেলাওয়াত, আত্মার পরিশুদ্ধি, কিতাবুল্লাহ্ তথা ক্বোরআনের শিক্ষাদান, বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা, উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্র শিক্ষাদানের জন্য হুযূর-ই আক্রামের শুভাগমন হয়েছিলো। তাঁর আগমনের প্রাক্কালে আরবের লোকেরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

তরজমা: এবং তোমাদের উপর অবতীর্ণ নি'মাতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরগুলোর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নি'মাত দ্বারা পরস্পর ভাই হয়ে গেছো। আর তোমরা ছিলে দোযখের গর্তের তীরে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ এভাবে তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিকপথের দিশা পাও। [সূরা আলে ইমরান: ১০৩]

হাদীসের আলোকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাত

আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিও ঈমান আনার মধ্য দিয়ে ঈমান পূর্ণ হয়।

হাদীস শরীফে আছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

১. আল্ কুরআন,সূরাহ্ জুমু'আহ্ : ০২।

"হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটিঃ ১. একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল, ২. সালাত ক্বায়েম করা, ৩. যাকাত দেয়া, ৪. হজ করা এবং ৫. রমযানের রোযা রাখা।"[১]

عَنْ أَنَسٍ قَالَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِوَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

"হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় না হই।"[২]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَإِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

"হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ্ তাঁর জন্যে দোযখের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।"[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَلَا يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِإِلَّاكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

"হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেন, ওই মহান আল্লাহ্র শপথ, যাঁর ক্বুদরতের মুঠোর মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণ, এ উম্মতের মধ্যে যে আমার সম্পর্কে শুনতে ও জানতে পারবে। সে ইয়াহুদী হোক বা নাসারা হোক, আর আমি যে দীনসহ প্রেরিত

১. ইমাম বুখারী (রা.), সহীহ্ বুখারী শরীফ, (মাকতাবা মুসতাফাঈ,): পৃ. ০৬।
২. প্রাগুক্ত পৃ. ০৭।
৩. ইমাম মুসলিম ইব্ন আল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, তাবি) পৃ. ৫৭।

হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুমুখে পতিত হবে সে নিশ্চয় জাহান্নামবাসী হবে।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুগত হয়।"[২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ ضَلُّوا، فَإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُكَذِّبُوا بِبَاطِلٍ، أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقٍّ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

এ হাদীসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি মূসা আলায়হিস্ সালামও জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর উপায় থাকতোনা।"[৩]

عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُولُحَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ.

"হযরত রাবাহ্ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হুওয়াইত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দাদী তাঁর পিতা থেকে আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যার ওযূ নেই তার সালাত নেই। আর যে আল্লাহ্র স্মরণ করে না (বিসমিল্লাহ্ পড়ে ওযূ করেনা) তার ওযূ হয় না এবং যে কেউ আল্লাহর উপর ঈমান আনে না সে আমার উপর ঈমান আনে না এবং যে ব্যক্তি আনাসার-কে ভালবাসে না, সে আমার উপর ঈমান আনে না।"[৪]

১. ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ আহ্মাদ, হাদীস-৮২০৩

২. ইমাম মুহাম্মদ আল হুসাইন আল বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ্, ১ম খণ্ড (বৈরূত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.) পৃ. ২১৩।

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ আহ্মাদ, হাদীস -১৪৬৩১।

৪. প্রাগুক্ত, হাদীস-১৬৬৫১।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর রিসালত পূর্ণাঙ্গ ও সর্বকালের সব মানুষের জন্য। তিনি যুগোপযোগী হিদায়তকারীরূপে আবির্ভূত হন।

হাদীসের আলোকে হুযূর-ই আকরামের রিসালাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. সার্বজনীন

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিশেষ সময় ও বিশেষ অঞ্চলের জন্য প্রেরিত হন নি; তিনি সমগ্র জাহানের কল্যাণরূপে আবির্ভূত হন। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল কোন বিশেষ অঞ্চল বা বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন; কিন্তু ইনি বিশ্ববাসীর জন্য সর্বশেষ রাসূল। তাঁর রিসালাত পূর্ণাঙ্গ, চূড়ান্ত, সার্বজনীন ও ব্যাপক। আবদুল হামীদ আস্ সুনহাজী বলেন,

وَجَعَلَ رِسَالَتَهُ الرِّسَالَةَ الْعَامَّةَ لِلْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ

"তাঁর রিসালাত জিন্, মানব ও ফিরিশ্তাকুলের জন্য, যা সার্বজনীন ছিল।"[১]

২. সত্যের সাক্ষ্যদাতা

সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করা মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের বাস্তব নমুনার মূর্ত প্রতীক ও সাক্ষ্যদাতা হয়ে প্রেরিত হন।

৩. আল্লাহ্র পথে আহ্বাহনকারী

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কুফরী ও শিরকের ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে এনেছেন। পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়তের পথ দেখিয়েছেন। সারাজীবন দ্বীনী দাওয়াত প্রদান করেছেন। তাঁর এ কর্মকান্ড

১. আবদুল হামীদ আস্ সুনহাজী, আল্ আক্বা-ইদুল ইসলামিয়্যাহ্, খন্ড- ১, (জাযায়ির: দারুন নাশ্র,) পৃ. ১১৬।

পরিচালনার জন্য মুসলামানদেরকে বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً"একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে (অন্যের নিকট) পৌঁছিয়ে দাও।"[১]

৪. সুসংবাদদাতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেস্তের সুসংবাদদাতারূপে প্রেরিত হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا "সহজপন্থা দেখাও, কঠিন করো না, তোমরা সুসংবাদ দাও, তাড়িয়ে দিওনা।"[২]

৫. ভীতি প্রদর্শনকারী

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দোযখের ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ের বর্ণনা দিতেন। সহীহ মুসলিম শরীফে এ মর্মে হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন তিনি ক্বোরাঈশের সকল শাখা গোত্রকে একত্রিত করে প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরে বলতে লাগলেন, হে বনী কা'ব ইবনে লুয়াই, তোমরা নিজকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। এভাবে তিনি মুর্‌রাহ্ ইবনে কা'ব, আবদে শামস, আবদে মুনাফ, হাশেম, বনী আবদুল মুত্তালিবের লোকদেরকেও সমভাবে আহ্বান জানান। এমনকি আপন কন্যা ফাত্বিমাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকেও একইভাবে সম্বোধন করেন এবং পরকালে নবী করীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান না আনলে তাঁর রক্তের সম্পর্কের হওয়া কোন কাজে আসবে না মর্মে সাবধান করে দিয়েছিলেন।"[৩]

---

১. জামি'উত তিরমিযী, হাদীস-২৫৯৩

২. ইবনুল মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড (কায়রো : ইহ্‌ইয়াউত তুরাসিল আরবী, ১৯৬৮ খ্রি.) পৃ.৪১৭।

৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩০৩

৬. আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধিকরণ

দেহ ও হৃদয় উভয়ের সমন্বয়ে একজন মানব। তাই মানুষের দেহের যেমনি চাহিদা রয়েছে, তেমনি হৃদয় এবং আত্মারও চাহিদা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে বিভিন্ন উপায় উপকরণ অবলম্বন পূর্বক তাদের আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেন,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ، صَلَحُ الْجَسَدُ كُلُّه، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُأَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

"নিশ্চয় মানুষের শরীরে গোশতের একটা টুকরা আছে, যা ভাল থাকলে সারা শরীর ভাল থাকে; আর যা নষ্ট হলে সারা শরীর নষ্ট হয়ে যায়। সাবধান এটা হল ক্বাল্‌ব বা হৃদয়।"[১]

উল্লেখ্য, রসূল-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর রিসালতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। বিদায় হজ্বের সময় আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন, 'আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দ্বী-নাকুম...আল-আয়াত'। অর্থাৎ আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি...।
[সূরা মা-ইদাহ্, আয়াত-৩]

বিদায় হজ্বের এ বিশাল জমায়েতে আল্লাহর হাবীব ও তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন মর্মে স্বীকারোক্তি নিয়েছেন সমস্ত সাহাবী থেকে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আজ আমাদের রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ দ্বীন ও উভয় জাহানের সাফল্যের সঠিক দিক-নির্দেশনা লাভ করেছি।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরিত সকল নবী-রাসূল রিসালতের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালত ছিল সার্বজনীন। তাঁর আগমনে যুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অপরাধ, স্বেচ্ছাচার-নিপীড়ন, কুফর-শিরক ও মুর্খতা দূরীভূত হয়ে ন্যায় ও সুবিচার, আনুগত্য ও ইবাদত, বিনয় ও নম্রতা এবং তাওহীদ ও রিসালত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

---০---

---

১. সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৭

।। দুই ।।

দ্বীন প্রচার-এর পরিচিতি

'দ্বীন-প্রচার' শব্দটার আরবী হলো তাবলীগ (تبليغ) এর আভিধানিক অর্থ প্রচার, ঘোষণা, দ্বীনী দা'ওয়াত ইত্যাদি। আর (دين) দ্বীন অর্থ হচ্ছে ধর্ম, ধার্মিকতা, ধর্মবিশ্বাস, প্রথা, বিচার, প্রতিদান, আনুগত্য ইত্যাদি।[১]

পারিভাষায় এর অর্থ আরো ব্যাপক। যে প্রচার ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির গৃহীত পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে, তাই দ্বীন প্রচার (তাবলীগ)। এ প্রচারে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা হয়। এ'তে মেনে নেয়া এবং তাদের বাস্তব জীবনে চর্চার ব্যবস্থা করার পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। 'তাবলীগে দ্বীন' কুরআন ও সুন্নাহ্য় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একে দ্বীনী দা'ওয়াত এবং দা'ওয়াতে খায়রও বলা হয়। আধুনিক অভিধানগুলোতে ধর্মীয় বা কোন ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণা অর্থে 'দা'ওয়াহ্' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন-

The Hans wehr Dictionary of Modern Written Arabic-এ দা'ওয়াহ্ শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে Missionary activity, Missionary work, propaganda.[2]

তাই দা'ওয়াহ্ যে কোন পথ, মত বা বিষয়ে হতে পারে। কোন বিষয় গ্রহণে অনুপ্রাণিত করার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। বিষয়টি ভাল বা মন্দ হতে পারে। ক্বোরআন মজীদে 'দা'ওয়াহ্' শব্দের এ ধরনের ব্যবহার হয়েছে। যেমন-

"وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ" হে আমার সম্প্রদায়, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দা'ওয়াত দেই মুক্তির দিকে, অথচ তোমরা আমাকে দা'ওয়াত দিচ্ছ দোযখের দিকে।"[৩]

১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল মু'জামুল ওয়াফী, সং ১১ (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.) পৃ. ২৪৯, ৪৮।
২. The Hans wehr Dictionary of Modern Written Arabic. ed.J.M.cowan. (Newyork. 1976) P. 283
৩. আল্ কুরআন, সূরাহ্ আল্ মু'মিন : ৪১।

দ্বীনী দা'ওয়াত সম্পর্কিত হাদীস শরীফ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ : হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও প্রচার কর। বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা কর, এতে কোন দোষ নেই। যে আমার প্রতি স্বেচ্ছায় মিথ্যা আরোপ করে, তার চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে তালাশ করা উচিত।"[১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ،قَالَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَلِمَعَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ .

অর্থাৎ: "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তির চেহারাকে সজীব রাখুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবে তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কেননা, অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয়, ওই ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে।"[২]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

"হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যাঁর ক্বুদরতের মুঠোয় আমার প্রাণ, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে; নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহ্র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা

১. সহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদীস ৩৪৬১
২. জামি' আত তিরমিযী, হাদীস ২৬৫৭

(তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে) দো'আ করতে থাকবে; কিন্তু তোমাদের দো'আ ক্ববূল হবে না।"[১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

"হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন হাত দিয়ে তা ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিকভাবে বারণ করে। যদি এতেও অপরাগ হয়, তবে যেন অন্তরে অন্তরে এ কাজকে ঘৃণা করে। আর অন্তরের ঘৃণা পোষণ দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।"[২]

عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ، فَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا ـ

"হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, সে জাতির লোকের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা বারণ করে না, আল্লাহ্ সে জাতির উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে ভয়াবহ আযাব দেবেন।"[৩]

দ্বীন প্রচারের বিষয়বস্তু

দ্বীন প্রচারের বিষয়বস্তু হল পরিপূর্ণ জীবন বিধান-'দ্বীন ইসলাম'। ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা ব্যাপক। তবে তার মৌলিক বিষয়সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ক. আক্বীদাহ্, খ. শারী'আহ্, গ. আখ্লাক্ব।

দ্বীন প্রচারে উপস্থাপন কৌশল

মানুষের মাঝে কিছু গ্রহণের তিনটি উপাদান আছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রিত। উপাদানগুলো হলঃ ক. হৃদয়ানুভূতি, খ. বুদ্ধি ও গ. ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

[১]. জামি' আত তিরমিযী, হাদীস ২১৬৯
[২]. সহীহ্ মুসলিম, হাদীস-৭৪
[৩]. সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস-৪৩৩৯

ক. হৃদয়ানুভূতির নিকট গ্রহণীয় উপস্থাপন

মানুষের হৃদয় ও অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে এমন উপস্থাপনের নিয়ম হলোঃ ১. দা'ঈ কর্তৃক মাদ'উর প্রশংসা করা, ২. দা'ঈ কর্তৃক মাদ'উকে তিরস্কার করা, ৩. আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করা, ৪. আবেগ উদ্দীপক জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করা, ৫. উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ আখিরাতে জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও দোযখের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া, ৬. আল্লাহ্র সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেয়া, ৭. আবেগকে জাগিয়ে তোলার সঠিক কিস্সা-কাহিনী বলা, ৮. দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি, দয়া প্রদর্শন ও বিপদ-আপদে দেখা-শুনা করা, ৯. মাদ'উর অভাব মোচনে সাহায্য করা এবং সেবা যত্ন করা,[১] ১০. নাম নিয়ে সম্বোধন করা, ১১. উপমা বা উদাহরণ দেয়া, ১২. পরামর্শ চাওয়া, ১৩. নসীহত সুলভ বক্তব্য রাখা, ১৪. ক্ষেত্রবিশেষে বিষয়বস্তুর কিছু উল্লেখ করা, কিছু উহ্য রাখা, ১৫. বক্তব্য সংক্ষেপে বলা, ১৬. কোন প্রশ্নের একাধিক উত্তরের মাঝে অধিক কল্যাণকর দিক উল্লেখ করা, ১৭. প্রয়োজনে আল্লাহ্র শপথ করা, ১৮. সম্মান, ইয্যাত প্রদর্শনমূলক বক্তব্য বা কাজ করা, ১৯. মাদ'উর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ ও প্রশ্নোত্তর করা এবং ২০. সবর ও সংযম প্রদর্শন করা।

খ. বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপন করা

মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে নাড়া দিয়ে তার মাঝে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় অনুসন্ধিৎসু করার ক্ষেত্রে-

১. দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা।

২. বিভিন্ন ধরনের উপমা প্রদর্শন করা। যেমন- একদা এক যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে এসে ব্যভিচার করার অনুমতি চাইল, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমার মায়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করুক- তা কি তুমি চাও?" যুবকটি বলল, "না, কখনো না।" রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে অন্য মানুষেরাও তা চাইবে না।" এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[১]. ড. আবুল ফাত্হ বায়ানূনী, আল্ মাদখালু ইলা ইলমিদ দা'ওয়াহ্ (বৈরুত: মুআসসাতুর রিসালাহ্, ১৪১২/১৯৯১) পৃ. ২০৫.২০৬।

যুবকটির ফুফী ও বোনের সাথে উপমা তুলে ধরলেন। তখন যুবকটি তার ওই বাসনা ত্যাগ করে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নিল।[১]

৩. মাদ'উর সাথে যুক্তি প্রদর্শনমূলক বিতর্ক করা, যাকে বাহাস বা মুনাযারা বলা হয়, ৪. যে সব বিশুদ্ধ কাহিনীতে বুদ্ধি ও চিন্তার কাজ বেশী, সে সব কাহিনী উল্লেখ করা, ৫. বিরোধী পক্ষ যা সত্য মনে করছে, তার বিপরীত বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ করা।

গ. ইন্দ্রিয়ানুভূতিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপন করা

মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ভুক্ত তথ্য গ্রহণের পরিধিতে আবেদন সৃষ্টি করে এমন উপস্থাপন কৌশলের মধ্যে-

১. আসমান-যমীনে, মানব দেহে অবস্থিত আল্লাহ্র সৃষ্টিলীলা প্রত্যক্ষ করানো। এভাবে ক্বোরআন ও সুন্নাহ্য় প্রচুর তথ্য রয়েছে, ২. আদর্শিক যুক্তি-তথ্য উপস্থাপনা, ৩. হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নামায শিক্ষা দিতেন এবং ৪. নিন্দিত কাজ বর্জনে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।[২]

দ্বীন প্রচারে সফলতা

যথাযথ পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বনে দ্বীন-প্রচারে সফলতা অনিবার্য। সমাজবিজ্ঞানী হ্যান্টিংটনের মত যারা সভ্যতার দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের প্রবক্তা, তাঁরাও স্বীকার করেছেন, বর্তমান যুগ ইসলামের যুগ। এর সফলতা ও বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

দ্বীন প্রচারের প্রাথমিক কৌশলগত স্থান হল মানুষের ফিত্বরাত, যা সকলের মাঝে নিহিত। এমনিভাবে দা'ঈদের হাতে রয়েছে ক্বোরআনুল কারীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ্। পাশাপাশি আছে হিকমতপূর্ণ তথা বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রচারের পদ্ধতি। এমনিভাবে মুসলমানদের মাঝে দা'ওয়াতী চেতনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে বিশ্বের মানুষ দিশেহারা হয়ে শান্তি খুঁজছে, সত্যের অনুসন্ধান করছে। দা'ঈরা যদি এ মোক্ষম সুযোগটি যথাযথভাবে কাজে লাগাতে

[১]. মুসনাদ আহ্মদ, ৫ম খ-, পৃ. ২৫৬-২৫৭, মাউমা'উয যাওয়ায়িদ, ১ম খ-, পৃ. ১২৯।
[২]. ড. বায়নূনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

পারেন, তবে গোটা বিশ্বে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটাতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে দা'ঈদের প্রতি পরামর্শ-

১. ক্বোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে আক্বীদা-বিশ্বাসে দৃঢ়তা অর্জন করতে হবে, ঈমানী শক্তিতে উজ্জীবিত হতে হবে এবং অন্যকেও করতে হবে।

২. নির্দ্বিধায় ক্বোরআন-সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যেতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে এ উভয়কে আঁকড়ে ধরতে হবে, ৩. সত্য গ্রহণের জন্য একে অপরকে উপদেশ দিতে হবে এবং নিজের কোন ভুল হলে, তা নিঃসংকোচে মেনে নিতে হবে, ৪. চরম ধৈর্য সহকারে এগুতে হবে; নৈরাজ্যের মোকাবেলা আরেকটি নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে নয়, ৫. দা'ওয়াত দেয়ার পূর্বে প্রস্তুতি নিতে হবে, পরিকল্পনা অনুযায়ী হিকমতের সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে, ৬. একমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করতে হবে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করতে হবে, ৭. কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে, ৮. পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে বরণ ও উপস্থাপন করতে হবে, ৯. নেতৃত্ব সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে, ১০. দা'ঈদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে ও সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে, ১১. মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে গবেষণা মনোবৃত্তি জাগরিত করতে হবে, ১২. দা'ওয়াতী বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাঝে সমন্বয় ও পরস্পরের সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে, ১৩. ইখলাস ও মানবতার প্রতি প্রভূত দরদ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, ১৪. মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে ঐক্য ও ঈমানী ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগরিত করতে হবে, ১৫. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তৃত্বকে দা'ওয়াতের পক্ষে ব্যবহার করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, ১৬. দম্ভ ও ভোগ বিলাসিতার পরিবর্তে বিনয় ও পরিমিত জীবনাচারের আদর্শ উপস্থাপন করতে হবে, ১৭. সমাজে ইসলাম ও আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে, ১৮. ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, ১৯. আধুনিক প্রযুক্তি ও মাধ্যম উদ্ভাবন ও তা ব্যবহারে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে এবং ২০. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে দ্বীন প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাবলীগে দ্বীনের কাজ করে, যুগ প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং তা বিবেচনায় এনে দা'ওয়াতি কাজ পরিচালনা করলে সফলতা আশা করা যায়।

---o---

দ্বীন প্রচার (দা'ওয়াত)-এর গুরুত্ব ও পদ্ধতি

মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী *

প্রারম্ভিকা

আজ আমরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হলো দাওয়াত ও তাবলীগে দ্বীনের মহান দায়িত্ব, যা আম্বিয়া-ই কিরামের ওপর অর্পিত অভিন্ন দায়িত্ব বলে বিবেচিত। দাওয়াত-প্রচারের মহান দায়িত্ব নিয়েই আম্বিয়া-ই কিরাম প্রেরিত হয়েছেন যুগে যুগে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির কাছে। আল্লাহর প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, অথবা থাকলেও শিরক-মিশ্রিত অথবা বিকৃত, তাদের সঠিক পথের দিশা দেয়া, সরল সঠিক পথ তাদের সামনে পরিষ্কারভাবে উন্মোচিত করে তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে ক্বিয়ামতের ময়দানে বলতে না পারে, আমাদের কাছে জান্নাতের সুসংবাদদাতা অথবা জাহান্নাম থেকে হুঁশিয়ারকারী হিসেবে কেউ আসেননি। ইরশাদ হয়েছে :

أَنْ تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ

তরজমা: 'যেন তোমরা না বলো যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা কিংবা সতর্ককারী আসেননি। অবশ্যই তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছেন। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান'। [সূরা আল-মা-ইদাহ: ১৯]

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এ শান্তির ধর্মের প্রচার-প্রসারের একমাত্র উপায় হলো দা'ওয়াত। যুগে যুগে মহান আল্লাহ তা'আলা যে সকল নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের সকলের কার্যক্রম ছিল এ সত্য ধর্মের প্রচার, সত্যের বাণী সকলের কাছে পৌঁছানো। আজ তাঁদের উত্তরসুরী হিসেবে

* **কামিল (হাদীস)**- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম। বি,এ অনার্স. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিসর। এম, এ. এম, ফিল. কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো, মিসর। পি এইচ. ডি (ফেলো) চ.বি। **শিক্ষক**-ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। **খতিব**- মুসাফির খানা জামে মসজিদ, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।

একেকজন মুসলিমের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হলো 'ইসলামের দা'ওয়াত' দেয়া। সত্যের বাণী তথা ক্বোরাআন-সুন্নাহর বাণী নিজেরা সঠিকভাবে জানবো, মেনে চলবো এবং অপরের কাছে তা পৌছিয়ে দেবো- এটাই হওয়া উচিত দা'ওয়াতের মূল কৌশল।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার একক সত্তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে কেবল তাঁরই ইবাদত করা, ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করা। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ.

তরজমা: 'আর জিন্ ও মানুষকে আমি কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের কাছে কোন রিযক্ব চাই না; আর আমি চাই না যে, তারা আমাকে খাবার দিক। [সূরা আয্যা-রিয়াত: ৫৬-৫৭]

আর আল্লাহ তা'আলা অসীম দয়ালু, করুণার আধার। তাই তিনি মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, পৃথিবীতে মানুষের করণীয়, মানুষের সর্বশেষ গন্তব্য ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে বাতলিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিজ ক্বুদরতের হাতে নিয়েছেন এবং নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তার সুস্পষ্ট বিবরণ মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। কারণ মানুষ নিজ উদ্যোগে এসব বিষয়ের আদ্যোপান্ত জানতে অক্ষম আর এসব বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জিত না হলে মানুষ তার কর্তব্য নির্ধারণে ব্যর্থ হবে নিশ্চিতরূপেই। ফলে পরকালের শাশ্বত জীবনে বঞ্চিত হবে অফুরন্ত নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত থেকে, বঞ্চিত হবে রাব্বুল আলামীনের মহা-আনন্দময় দীদার থেকে। শুধু তা নয়; বরং তার আবাস হিসেবে নির্ধারিত হবে মর্মন্তুদ শাস্তি ও অসহনীয় কষ্ট-যাতনার ভয়াবহ স্থান জাহান্নাম।

তাই নবী-রাসূলগণের মৌলিক দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা, চিরন্তন সত্যের পথে আহ্বান করা, মানুষ যেসব সত্য নিজ থেকে আবিষ্কার করতে অক্ষম সেসব বিষয়ে তাকে অবহিত করা। আর যারা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করবে তাদেরকে পরকালীন শাশ্বত সুখের সুসংবাদ দেয়া এবং যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তাদেরকে জাহান্নামী জীবনের দুঃসংবাদ পৌছিয়ে দেয়া, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে হুঁশিয়ার করা। ইরশাদ হয়েছে

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

'নিশ্চয় আমি তাদেরকে বিশেষ করে পরকালের স্মরণের জন্য নির্বাচিত করেছি।'
[সূরা সোয়াদ: ৪৬]

নবী-রাসূলগণ মানুষকে জাহান্নামী জীবন থেকে উদ্ধার করে জান্নাতের পথে নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অক্লান্ত পরিশ্রম করে, সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ যেসব জাতি ও মানব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন তাদেরকে পয়গামে ইলাহী পৌঁছিয়ে বালাগুল মুবীনের পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে গেছেন এবং তাদের ওপর আল্লাহ্‌র প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, তাদের কেউ আর বলতে পারবে না- 'আমাদের কাছে চির সুখের জান্নাতী জীবনের পথ দেখানোর জন্য কেউ আসেনি। জান্নাতের সুসংবাদবাহক কেউ প্রেরিত হয়নি। অথবা মর্মন্তুদ শাস্তির ঠিকানা জাহান্নাম থেকে হুঁশিয়ারকারীও কেউ আসেনি।'

ইরশাদ হয়েছে-

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

তরজমা: 'আর (আমি পাঠিয়েছি) রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রাসূলগণ পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। [সূরা আন-নিসা: ১৬৫]

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটে। হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর আর কেউ নবী হিসেবে প্রেরিত হয়ে মানুষের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে আসবে না। যেহেতু পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানব সম্প্রদায়ের বংশ বিস্তার অব্যাহত থাকবে, তাই যারা ঈমানহারা, যারা সত্যের পথ থেকে দূরে অবস্থান করে, তাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। তাদেরকে ঐশী আদর্শ ও মূল্যবোধ তথা ইসলামের প্রতি আহ্বানের দায়িত্ব রহিত হয়ে যায় নি, বরং খতমে নবূওতের পর দ্বীনের দা'ওয়াতের এ মহান দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদীর কাঁধে অর্পিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তরজমা: হে হাবীব, আপনি 'বলুন, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র-মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'। [সূরা ইয়ূসুফ: ১০৮]

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারী হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তিকেই যার যার সাধ্য অনুযায়ী ইসলামের প্রচারমূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকতে হবে। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসারী হওয়ার দাবি মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হবে।

দা'ওয়াত তথা ইসলামের প্রচার-প্রসারে আমাদেরকে ঐকান্তিকভাবে কাজ করে যেতে হবে। এ পথে জান-মাল ব্যয় করতে হবে। কেবল নিজে সত্যের অনুসারী হলে দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে না; বরং অন্যদেরকেও সত্যের দিকে আহ্বান করতে হবে।

দা'ওয়াহ্ বা দা'ওয়াত কি?

দা'ওয়াত হলো ব্যক্তি জীবন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের এমন একটি পন্থা, যা দ্বারা এ মানবজাতিকে সত্যধর্ম ইসলামের প্রতি আহবান করা হয়, কুফরী হতে ঈমানের দিকে এবং অন্ধকার হতে আলোর দিকে পথ প্রদর্শন আর জীবনের সংকীর্ণতা হতে পার্থিব ও পরকালৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। দা'ওয়াত বলতে শুধু ওয়াজ-নসীহত, মসজিদ-মহল্লায় গিয়ে নামায-রোযার কথা বলাকেই বোঝায় না, বরং এগুলো হলো দা'ওয়াতের অংশ বিশেষ। দাওয়াতী কার্যক্রমে শুধুমাত্র ইসলামের প্রতি আহবান নয়, বরং অমুসলিমসহ সকল মানবজাতির সামনে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের কল্যাণ-মহিমা উপস্থাপন এবং ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান জানানোকে বুঝায়।

দা'ওয়াতী কার্যক্রমে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক বিজ্ঞান ও শিল্পসম্মত (শৈল্পিকভাবে ইসলামের মহিমা উপস্থাপন) উপায়ে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার দিকে মানব সমাজকে আকৃষ্ট করা, তা মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে তা চর্চার ব্যবস্থা করে দেয়ার পদ্ধতিগত ও শরীয়াহ মোতাবেক সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই ইসলামী দা'ওয়াহ (দাওয়াত)।

নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিজের আশেপাশে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা মু'মিনের

অন্যতম দায়িত্ব। এ জন্য মু'মিনের জীবনের একটি বড় দায়িত্ব হলো الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (আল-আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহ্য়ু 'আনিল মুনকার। অর্থাৎ ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। আদেশ ও নিষেধকে একত্রে 'আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ্' বা আল্লাহর দিকে আহবান বলা হয়। এ ইবাদত পালনকারীকে দা'ঈ ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও সংক্ষেপে দা'ঈ অর্থাৎ দা'ওয়াতকারী বা দাওয়াত-কর্মী বলা হয়।

الدعوة (দা'ওয়াত) শব্দের অর্থ

'দা'ওয়াত' (الدعوة) একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ ডাকা, আহবান করা। ইসলামের দাওয়াতের সারকথা হচ্ছে- মানুষকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির দিকে আহবান করা।

ইসলামের আবির্ভাব শুধু ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নয়; সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ইসলাম। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সৌভাগ্য দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: সালাহ ও ইসলাহ। অর্থাৎ নিজে সংশোধন হওয়া এবং অন্যকে সংশোধন করা। দা'ওয়াতের কাজ ছাড়া যা কখনো সম্ভব নয়।

اَلْأَمْرُ- আর আরবিতে 'আমর' الأمر বলতে আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, অনুরোধ, অনুনয় সবই বুঝায়।

النهى- অনুরূপ 'নাহ্য়ু' (النهى) বলতে নিষেধ, বর্জনের নির্দেশ ও অনুরোধ ইত্যাদি বুঝানো হয়।

ক্বোরআন-হাদীসে এই দায়িত্ব বুঝানোর জন্য আরো অনেক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে: তন্মধ্যে রয়েছে 'আত-তাবলীগ' (التبليغ), 'আন-নাসীহাহ্' (النصيحة) 'আল-ওয়া'য' (الوعظ) ইত্যাদি।

التبليغ (আত-তাবলীগ)-এর অর্থ পৌঁছানো, প্রচার করা, খবর দেওয়া, ঘোষণা দেওয়া বা জানিয়ে দেওয়া।

النصيحة (আন-নাসীহাহ্) শব্দের অর্থ আন্তরিক ভালবাসা ও কল্যাণ কামনা। এ ভালবাসা ও কল্যাণ কামনাপ্রসূত ওয়ায, উপদেশ বা পরামর্শকেও নসীহত বলা হয়।

الوعظ (ওয়া'য) বাংলায় প্রচলিত অতি পরিচিত আরবী শব্দ। এর অর্থ উপদেশ, আবেদন, প্রচার, সতর্কীকরণ ইত্যাদি।

দা'ওয়াতের এ দায়িত্ব পালনকে ক্বোরআনুল কারীমে 'ইক্বামতে দ্বীন' বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এগুলোর সবই একই ইবাদতের বিভিন্ন নাম এবং একই ইবাদতের বিভিন্ন দিক। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা তা বুঝতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

ক্বোরআনের আলোকে দা'ওয়াত-এর গুরুত্ব

দা'ওয়াতী কাজের গুরুত্ব ও ফযীলত এত অধিক, যা কোনো মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুধাবন করতে পারে না। পবিত্র কালামের অসংখ্য আয়াত এর পক্ষে উজ্জ্বল সাক্ষী। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

তরজমা: ওই ব্যক্তির কথার চেয়ে ভালো কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহ্র প্রতি আহবান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে, আমি অনুগতদের একজন?

[সূরা হামীম আস্ সাজ্দাহ : ৩৩]

এই আয়াতে ওই সকল বিশেষ প্রিয়ভাজন বান্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এক আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের স্থিরতা ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছে। এখানে তাদের অপর একটি উচ্চ মর্যাদার কথা আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ উত্তম ও উৎকৃষ্ট লোক ওই ব্যক্তি, যে একমাত্র আল্লাহর জন্য নিজেকে নিবেদিত করে তাঁর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের ঘোষণা দেয়, তাঁর মনোনীত পথে চলে এবং দুনিয়াবাসীকে তাঁর দিকে আসার আহবান জানায়। তার কথা ও কাজ অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আসার জন্য প্রভাবিত করে। লোকজনকে সে যে সকল ভালো কাজের দাওয়াত দেয় সে নিজেও সেগুলো অনুসারে আমল করে।

নবী-রাসূলগণের মূল দায়িত্ব

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, প্রচার, নসীহত, ওয়া'য এক কথায় আল্লাহর দ্বীন পালনের পথে আহবান করাই ছিল সকল নবী ও রাসূল (আলাইহিমুস সালাম)-এর দায়িত্ব। সকল নবীই তাঁর উম্মতকে তাওহীদ, রিসালত ও ইবাদতের আদেশ করেছেন এবং শিরক, কুফর ও পাপকাজ থেকে নিষেধ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ

তরজমা: "যারা অনুসরণ করে এ রসূল, বাহ্যিক কোন ওস্তাদের কাছে পড়াবিহীন অদৃশ্য সংবাদদাতার, যাঁর উল্লেখ তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন। [সূরা আ'রাফ: ১৫৭]

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মকে আদেশ ও নিষেধ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

অন্যত্র এ কর্মকে দা'ওয়াত বা আহ্বান নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

তরজমা: "তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছো না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে এ মর্মে আহবান করছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। [সূরা হাদীদ: ৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ দায়িত্বকে দা'ওয়াত বা আহবান বলে অভিহিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

তরজমা: "আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহবান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর ওয়া'য-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন। [সূরা নাহ্‌ল: ১২৫]

অন্যত্র এই দায়িত্বকেই তাবলীগ বা দ্বীন প্রচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ -

তরজমা: "হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।" [সূরা মা-ইদাহ্ : ৬৭]

কোরআনুল কারীমে বারবার এরশাদ হয়েছে যে, প্রচার বা পৌঁছানোই রাসূলগণের একমাত্র দায়িত্ব।

নিম্নে বর্ণিত আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

তরজমা: আমরা রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা। [সূরা: ইয়াসীন- ১৭]

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর জবানিতে এরশাদ হয়েছে-

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আমি আমার প্রতিপলকের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসীহত করছি।" [সূরা আ'রাফ: ৬২]

সূরা আ'রাফের ৬৮, ৭৯, ৯৩ নম্বর আয়াত, সূরা হুদ-এর ৩৪ নম্বর আয়াত ও অন্যান্য স্থানে দা'ওয়াতকে নসীহত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সূরা শুরার ১৩নম্বর আয়াতে এরশাদ করেছেন-

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ O

তরজমা: "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহ আলায়হিস্ সালামকে আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহবান করছেন তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ আপন নৈকট্যের জন্য মনোনিত করে নেন যাকে চান এবং নিজের দিকে পথ প্রদান করেন তাকেই, যে প্রত্যাবর্তন করে। [সূরা শুরা: ১৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

তরজমা: "আর আপনি বুঝাতে থাকুন। কারণ বুঝানো ঈমানদারদের উপকারে আসে।" [সূরা যা-রিয়াত, আয়াত : ৫৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ করে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَاالْمُدَّثِّرُ . قُمْفَأَنذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।" [সূরা মুদ্দাস্সির:১-৩]

উম্মতে মুহাম্মদীর অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য

দা'ওয়াত, আদেশ-নিষেধ, দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা নসীহতের এ কাজই উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্যতম দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

ইরশাদ হয়েছে-

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তরজমা: আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। [সূরা আলে ইমরান: ১০৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ এরশাদ করেন -

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তরজমা: "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যের আদেশ এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।" [সূরা আলে ইমরান: ১১০]

প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন-

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

"তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আলে ইমরান: ১১৪]

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তা'আলা আরও বলেন-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

তরজমা: "আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই অনুগ্রহ করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবা: ৭১]

সূরা তাওবার ১১২ আয়াতে, সূরা হজ্জের ৪১ আয়াতে, সূরা লোক্বমানের ১৭ নম্বর আয়াতে ও অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত মু'মিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান, নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মত সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মু'মিনের অন্যতম কর্ম। শুধু তা নয়, মু'মিনদের পারস্পারিক বন্ধুত্বের দাবি হলো যে, তারা একে অপরের অন্যায় সমর্থন করেন না, বরং একে অপরকে ন্যায়কর্মে নির্দেশ দেন এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করেন। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, এ সকল আয়াতে ঈমান, নামায, যাকাত ইত্যাদির আগে সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে আমরা মু'মিনের জীবনে এর সবিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

"মহাকালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' [সূরা আসর]

অর্থাৎ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের চারটি জিনিস প্রয়োজন :

ক) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাদের হিদায়ত ও প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা-তা দুনিয়া সম্পর্কিত হোক, কিংবা আখিরাত সম্পর্কিত হোক।

খ) ওই ঈমান ও ইয়াক্বীনের প্রভাব কেবল মন-মানস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রাখা; বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা প্রকাশ করা এবং বাস্তব জীবনে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানো।

গ) কেবল নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার ও কল্যাণ নিয়েই তুষ্ট না থাকা, বরং দেশ ও জাতির সামষ্টিক স্বার্থকেও সম্মুখে রাখা। দু'জন মুসলমান একত্রে হলে নিজের কথা এবং কাজ দ্বারা একে অপরকে সত্য দ্বীন মেনে চলার এবং প্রতিটি কাজে সত্য ও সততা অবলম্বনের তাকীদ দেওয়া।

ঘ) প্রত্যেকে একে অপরকে এ নসীহত ও ওসীয়ত করা যে, সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে যত বাধা-বিপত্তি, যত অসুবিধা ও বিপদাপদ দেখা দেবে, এমনকি যদি মন-মানসের বিরোধী কাজও বরদাশত করতে হয় তাহলেও ধৈর্য ও সবরের সঙ্গে তা বরদাশ্‌ত করতে হবে। পুণ্য ও কল্যাণের পথ থেকে পা যেন কখনো ফসকে না যায় এই ওসীয়ত করতে হবে।

যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে এ চারটি গুণের সমাবেশ ঘটবে এবং যিনি নিজে পূর্ণাঙ্গ হয়ে অন্যদেরকে পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা চালাবেন, কালের পৃষ্ঠায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আর এমন ব্যক্তি যেসব নিদর্শন রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন তা 'বাক্বিয়াতে সালেহাত' তথা অবশিষ্ট নেক কাজ হিসেবে সর্বদা তার নেকীর খাতায় সংযোজন ঘটাবে।

বস্তুত এ ছোট সূরাটি সমস্ত দ্বীন ও হিকমতের সার-সংক্ষেপ। ইমাম শাফে'ঈ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি যথার্থ বলেছেন যে, ক্বোরআন মজীদে কেবল যদি এ সূরাটিই নাযিল করা হতো, তাহলে (সমঝদার) বান্দাদের হিদায়তের জন্য যথেষ্ট ছিল। পূর্বকালের মনীষীদের মধ্যে দু'জন একত্র হলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তারা একে অপরকে সূরাটি পাঠ করে শুনাতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হওয়ার কারণে আমাদের উপরও দা'ওয়াতের কাজ জরুরি। যেমন সূরা ইয়ূসুফে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

তরজমা: "বলুন, 'এই আমার পথ। আল্লাহর দিকে ডাকি বুঝে-শুনে আমি এবং যারা আমার সঙ্গে আছে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

[সূরা ইয়ূসুফ : ১০৮]

এই দায়িত্ব পালনকারী মু'মিনকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র ক্বোরআনে।

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

তরজমা: "ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিমদের একজন"।

[সূরা ফুস্‌সিলাত: ৩৩]

আমরা দেখেছি যে, আদেশ, নিষেধ বা দা'ওয়াত-এর আরেক নাম নসীহত। নসীহত বর্তমানে সাধারণভাবে উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হলেও মূল আরবিতে নসীহত অর্থ আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনা। কারো প্রতি আন্তিরকতা ও কল্যাণ কামনার বহি:প্রকাশ হলো তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দেওয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা। এ কাজটি মুমিনদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অন্যতম দায়িত্ব; বরং এই কাজটির নামই দ্বীন ।

---o---

হাদীস শরীফের আলোকে দা'ওয়াতের গুরুত্ব

عن تميم بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الدِّينُ النَّصِيحَةُ" قُلْنَا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ : لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

অর্থাৎ : "দ্বীন হলো নসীহত। সাহাবীগণ বললেন, "কার জন্য?" বললেন, "আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য, মুসলিমগণের নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।" [মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ নসীহতের জন্য সাহাবীগণের বায়'আত তথা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদীসে জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুগীরা ইবনে শু'বাহ্‌ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রমুখ সাহাবী বলেন-

عن جرير بن عبدالله - رضى الله عنه - قال: "بايعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامِ الصلاةِ وإيتاء الزكاةِ والنصحِ لكل مسلمٍ". وفي رواية قال:بايعتُ النبي صلى الله عليه وسلم على السمعِ والطاعةِ فلقننى: "فيما استطعتَ"، والنصح لكل مسلم

অর্থাৎ : "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়'আত বা প্রতিজ্ঞা করেছি সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ও প্রত্যেক মুসলিমের নসীহত (কল্যাণ কামনা) করার উপর"। [বোখারী-৭২০৪, মুসলিম-৫৬]

এ অর্থে যে, তিনি সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধের বায়'আত গ্রহণ করতেন। হযরত ওবাদাহ ইবনে সামিত ও অন্যান্য সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : "بايَعْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمعة والطاعة في المنشط والمكره، وعلى العدل في القول والعمل لا نخاف في ذلك لومة لائم ."

অর্থাৎ : "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়'আত করেছি আনুগত্যের এবং সৎকর্মের আদেশ প্রদান ও অসৎকর্মের নিষেধের এবং এ কথার উপর যে, আমরা মহিমাময় আল্লাহর জন্য কথা বলব এবং সে বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দা বা গালি গালাজের তোয়াক্কা করব না।

[আহমাদ, বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য সনদে]

অনুরূপভাবে, নিজের পরিবার, নিজের অধীনস্থ মানুষগণ ও নিজের প্রভাবাধীন মানুষদের আদেশ-নিষেধ করা গৃহকর্তা বা কর্মকর্তার জন্য ফরযে আইন। কারণ আল্লাহ তাকে এদের উপর ক্ষমতাবান ও দায়িত্বশীল করেছেন এবং তিনি তাকে এদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِى مَال سَيِّدِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَال أَبِيهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- وَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - أخرجهما البخارى ومسلم فى صحيحهما عن ابن عمر

অর্থাৎ: "সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মানুষদের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসক বা প্রশাসক হচ্ছে অভিভাবক এবং তাকে তার অধীনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বাড়ীর কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ী ও তার সন্তান-সন্ততির দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদিম তার মালিকের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তার অধিনস্থ

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা ছিলো যে, তিনি এরশাদ করেছেন, পুরুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত, সে তার অধিনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

[ইমাম বোখারী ও মুসলিম এ দু'টি হাদীস তাদের সহীহ্ গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন]

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্যায় ও অসৎকর্মের প্রতিবাদ করা শুধুমাত্র এদেরই দায়িত্ব; বরং তা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। যিনি অন্যায় বা গর্হিত কর্ম দেখবেন তাঁর উপরেই দায়িত্ব হয়ে যাবে সাধ্য ও সুযোগমত তার সংশোধন বা প্রতিকার করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

عَنْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ"..

অর্থাৎ : "তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে প্রতিহত করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে (প্রতিবাদ) বা পরিবর্তন করবে। এতেও যদি সক্ষম না হয় তা হলে অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করবে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।" [মুসলিম]

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মু'মিনেরই দায়িত্ব হলো, অন্যায় দেখতে পেলে সাধ্য ও সুযোগ মত তার পরিবর্তন বা সংশোধন করা। এক্ষেত্রে অন্যায়কে অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং এর অবসান ও প্রতিকার কামনা করা প্রত্যেক মু'মিনের উপরই ফরয। অন্যায়ের প্রতি হৃদয়ের বিরক্তি ও ঘৃণা না থাকা ঈমান হারানোর লক্ষণ।

আমরা অগণিত পাপ, হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মের সয়লাবের মধ্যে বাস করি। বারংবার দেখতে দেখতে আমাদের মনের বিরক্তি ও আপত্তি কমে যায়। তখন মনে হতে থাকে, এ তো স্বাভাবিক, বা এ তো হতেই পারে। পাপকে অন্তর থেকে মেনে নেওয়ার এ অবস্থাই হলো ঈমানের দুর্বলতা অবস্থা। আল্লাহ ও তাঁর

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা নিষেধ করেছেন তাকে অর্থাৎ পাপ ও অন্যায়কে ঘৃণা করতে হবে, তা নিজের দ্বারা সংঘটিত হোক কিংবা বিশ্বের অন্য মানুষ দ্বারা সংঘটিত হোক। এ হলো ঈমানের ন্যূনতম দাবী।

দাওয়াতের হুকুম

যদি সমাজের একাধিক মানুষ কোনো অন্যায় বা শরীয়ত বিরোধী কর্মের কথা জানতে পারে বা দেখতে পায় তাহলে তার প্রতিবাদ বা প্রতিকার করা তাদের সকলের উপর সামষ্টিকভাবে ফরয তথা ফরযে কিফায়া। তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন যদি এ দায়িত্ব পালন করেন তবে তিনি ইবাদতটি পালনের সাওয়াব পাবেন এবং তা বাকিদের পক্ষ থেকেও সম্পন্ন বলে বিবেচিত হবে। বাকি মানুষেরা তা পালন করলে সাওয়াব পাবেন, তবে পালন না করলে গোনাহগার হবেন না। আর যদি কেউই তা পালন না করেন তাহলে সকলেই গুনাহ্গার হবেন।

দু'টি কারণে তা ফরযে আইন বা ব্যক্তিগত ফরযে পরিণত হয়,

প্রথমত: ক্ষমতা। যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনিই এ অন্যায়টির প্রতিকার করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে তার জন্য তা ফরযে আইন-এ পরিণত হয়। পরিবারের অভিভাবক, এলাকা বা দেশের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নেতৃবৃন্দের জন্য এ দায়িত্বটি এ পর্যায়ে ফরযে আইন হয়। এ ছাড়া যে কোনো পরিস্থিতিতে যদি কেউ বুঝতে পারেন যে, তিনি হস্তক্ষেপ করলে বা কথা বললে অন্যায়টি বন্ধ হবে ন্যায়টি প্রতিষ্ঠিত হবে তবে তা তাঁর জন্য ফরযে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে ফরয হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত: দেখা। যদি কেউ জানতে পারেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ অন্যায়টি দেখেনি বা জানেনি, তবে তার জন্য তা নিষেধ করা ও পরিত্যাগের জন্য দাওয়াত দেওয়া 'ফরযে আইন' বা ব্যক্তিগত ফরয'-এ পরিণত হয়। সর্বাবস্থায় এ প্রতিবাদ, প্রতিকার ও দাওয়াত হবে সাধ্যানুযায়ী- হাত দিয়ে মুখ দিয়ে অথবা অন্তর দিয়ে।

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত-এর বিষয়বস্তু

দাওয়াত, আদেশ, নিষেধ, ওয়ায, নসীহত ইত্যাদির বিষয়বস্তু কী? আমরা কোন কোন বিষয়ের দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধ করব? কোন্ বিষয়ের প্রতি কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে? আমরা কি শুধু নামায ও রোযা ইত্যাদি ইবাদতের জন্য

দা'ওয়াত প্রদান করব? নাকি চিকিৎসা, ব্যবসা, শিক্ষা, সমাজ, মানবাধিকার, সততা ইত্যাদি বিষয়েও দাওয়াত প্রদান করব? আমরা কি শুধু মানুষদের জন্যই দা'ওয়াত প্রদান করব? নাকি আমরা জীব-জানোয়ার, প্রকৃতি ও পরিবেশের কল্যাণেও দা'ওয়াত ও আদেশ-নিষেধ করব?

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ঈমান, বিশ্বাস, ইবাদত, মু'আমালাত (লেনদেন) ইত্যাদি সকল বিষয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। সকল বিষয়ই দা'ওয়াতের বিষয়। কিছু বিষয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কিছু বিষয়ের মধ্যে দাওয়াতকে সীমাবদ্ধ করার অধিকার মু'মিনকে দেওয়া হয়নি। তবে গুরুত্বগত পার্থক্য রয়েছে। ক্বোরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে যে বিষয়গুলোর প্রতি দা'ওয়াতের বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, মু'মিনও সেগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করবেন।

আমরা জানি যে, ক্বোরআন ও হাদীসে প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে মু'মিন-জীবনের কর্মগুলোকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছেঃ ফরযে আইন, ফরযে কিফায়া, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ ইত্যাদি পরিভাষাগুলো আমাদের নিকট পরিচিত। কিন্তু অনেক সময় আমরা ফযীলতের কথা বলতে যেয়ে আবেগ বা অজ্ঞতা বশত এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল করে থাকি। নফল-মুসতাহাব কর্মের দা'ওয়াত দিতে যেয়ে ফরয, ওয়াজিব কর্মের কথা ভুলে যাই বা অবহেলা করি। এছাড়া অনেক সময় মুস্তাহাবের ফযীলত বলতে যেয়ে হারামের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বলা হয় না।

ক্বোরআন-হাদীসের দা'ওয়াত-পদ্ধতি থেকে আমরা দা'ওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার আদেশ-নিষেধের বিষয়াবলীর গুরুত্বের পর্যায় নিম্নরূপ দেখতে পাইঃ

প্রথমত: তাওহীদ ও রিসালাতের উপর বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন, পক্ষান্তরে সর্ব প্রকার শিরক, কুফর ও নিফাক্ব থেকে আত্মরক্ষা

সকল নবী আলায়হি দাওয়াতের বিষয় ছিল প্রথমত: এটি। ক্বোরআন-হাদীসে এ বিষয়ের দা'ওয়াতই সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন তাওহীদের বিধানাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দা'ওয়াত দেওয়া হয়েছে, তেমনি বারংবার শিরক, কুফর ও নিফাক্বের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে দ্বীনের পথে দা'ওয়াতে ব্যস্ত অধিকাংশ দা'ঈ এ বিষয়টিতে ভয়ানকভাবে অবহেলা করেন। অনেকে করি যে, আমরা তো মু'মিনদেরকেই দাওয়াত দিচ্ছি। কাজেই ঈমান-আক্বীদা বা তাওহীদের বিষয়ে

দা'ওয়াত দেওয়ার, পক্ষান্তরে শিরক-কুফর থেকে নিষেধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

দ্বিতীয়তঃ বান্দা বা সৃষ্টির অধিকার সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন

আমরা জানি ফরযকর্ম দুই প্রকারঃ করণীয় ফরয ও বর্জনীয় ফরয। যা বর্জন করা ফরয তাকে হারাম বলা হয়। হারাম হচ্ছে আবার দুই প্রকারঃ প্রথম প্রকার হারাম, মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার নষ্ট করা বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলি বর্জন করা সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, অধীনস্থ, সহকর্মী, প্রতিবেশী, দরিদ্র, এতিম ও অন্যান্য সকলের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করা, কোনোভাবে কারো অধিকার নষ্ট না করা, কাউকে যুল্‌ম না করা, গীবত না করা, ওজন-পরিমাপ ইত্যাদিতে কম না করা, প্রতিজ্ঞা ও চুক্তি পালনে দায়িত্ব বা আমানত রক্ষায় অবহেলা না করা, হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকা, নিজের বা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বলা ও ন্যায় বিচার করা, কাফির শত্রুদের পক্ষে হলেও ন্যায়ানুগ পন্থায় বিচার-ফয়সালা করা ইত্যাদি বিষয় ক্বোরআন ও হাদীসের দা'ওয়াত এবং আদেশ নিষেধের অন্যতম গুরিত্বপূর্ণ বিষয়।

এমনকি রাস্তা ঘাট, মজলিস, সমাজ বা পরিবেশে কাউকে কষ্ট দেওয়া এবং কারো অসুবিধা সৃষ্টি করাকেও হাদীস শরীফে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সৃষ্টির অধিকার বলতে শুধু মানুষদের অধিকারই বুঝানো হয়নি। পশুপাখির অধিকার সংরক্ষণ, মানুষের প্রয়োজন ছাড়া কোনো প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অনেক সময় এ বিষয়গুলি অবহেলিত। এমনকি অনেক দা'ঈ বা দাওয়াতকর্মীও এ সকল অপরাধে জড়িত হয়ে পড়েন।

যেকোনো কর্মস্থলে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য কর্মস্থলের দায়িত্ব পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সঠিকভাবে পালন করা ফরযে আইন। যদি কেউ নিজের কর্মস্থলে ফরয সেবা গ্রহণের জন্য আগত ব্যক্তিকে ফরয সেবা প্রদান না করে তাকে পরদিন আসতে বলেন বা একঘন্টা বসিয়ে রেখে চাশতের নামায আদায় করেন বা দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করেন তাহলে তিনি মূলত: ওই ব্যক্তির মত কর্ম করছেন, যে ব্যক্তি পাগড়ির ফযীলতের কথায় মোহিত হয়ে লুঙ্গি খুলে উলঙ্গ হয়ে পাগড়ি পরেছেন।

অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ক আদেশ-নিষেধ ক্বোরআন হাদীসে বেশি থাকলেও আমরা এ সকল বিষয়ে বেশি আগ্রহী নই। কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্যদেরকে কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন ও আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদানের বিষয়ে দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধ করতে আমরা আগ্রহী নই। অবৈধ পার্কিং করে, রাস্তার উপর বাজার বসিয়ে, রাস্তা বন্ধ করে মিটিং করে বা অনুরূপ কোনোভাবে মানুষের কষ্ট দেওয়া, অপ্রয়োজনীয় ধোঁয়া, গ্যাস, শব্দ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ বা জীব জানোয়ারকে কষ্ট দেওয়া বা প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা, দা'ওয়াত বা আদেশ-নিষেধ করাকে আমরা অনেকেই আল্লাহর পথে দাওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করি না; বরং এগুলিকে জাগতিক, দুনিয়াবী বা আধুনিক বলে মনে করি।

তৃতীয়তঃ পরিবার ও অধীনস্থদেরকে ইসলাম অনুসারে পরিচালিত করা

বান্দার হক, বা মানবাধিকার বিষয়ক দায়িত্বসমূহের অন্যতম হলো নিজের দায়িত্বাধীনদেরকে দ্বীনের দা'ওয়াত দেওয়া ও দীনের পথে পরিচালিত করা। দাওয়াতকর্মী বা দা'ঈ নিজে যেমন এ বিষয়ে সতর্ক হবেন, তেমনি বিষয়টি দা'ওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবেন।

চতুর্থতঃ অন্যান্য হারাম বর্জন করা

হত্যা, মদপান, রক্তপান, শুকরের মাংস ভক্ষণ, ব্যভিচার, মিথ্যা, জূয়া, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া ইত্যাদিও হারাম। দা'ঈ বা দাওয়াতকর্মী নিজে এ সব থেকে নিজের কর্ম ও হৃদয়কে পবিত্র করবেন এবং এগুলো থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য দা'ওয়াত প্রদান করবেন। আমরা দেখতে পাই যে, ক্বোরাআন ও হাদীসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বারংবার বিভিন্নভাবে এ বিষয়ক দা'ওয়াত প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চমতঃ পালনীয় ফরয-ওয়াজিবগুলো আদায় করা

নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, হালাল উপার্জন, ফরযে আইন পর্যায়ের ইলম শিক্ষা ইত্যাদি এ জাতীয় ফরয ইবাদত এবং দা'ওয়াতের অন্যতম বিষয়।

ষষ্ঠতঃ সৃষ্টির উপকার ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত করা

সকল সৃষ্টিকে তার অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া ফরয। অধিকারের অতিরিক্ত সকলকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উপকার করা ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে

সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও প্রিয়তম পথ। ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া, দরিদ্রকে দারিদ্রমুক্ত করা, বিপদগ্রস্তকে বিপদ হতে মুক্ত হতে সাহায্য করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং যে কোনোভাবে যে কোনো মানুষের বা সৃষ্টির কল্যাণ, সেবা বা উপকারে সামান্যতম কর্ম ও আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। ক্বোরআন ও হাদীসে এ সকল বিষয়ে বারংবার দা'ওয়াত ও আদেশ নিষেধ করা হয়েছে।

সপ্তমত: আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যেকার সুন্নত-নফল ইবাদত করা

নফল নামায, রোযা, যিক্‌র, তিলাওয়াত, ফরযে কিফায়া বা নফল পর্যায়ের দা'ওয়াত দেওয়া, জিহাদ, নসীহত ও তায্‌কিয়া ইত্যাদি এ পর্যায়ের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে রত মু'মিনগণ ষষ্ঠ পর্যায়ের নফল ইবাদতের চেয়ে সপ্তম পর্যায়ের নফল ইবাদতের দা'ওয়াত বেশি প্রদান করেন। বিশেষত, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান তৈরি, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসা সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের দা'ওয়াত প্রদানকে আমরা আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত বলে মনেই করি না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীব-জানোয়ারও যদি কোনো অন্যায় বা ক্ষতিকর কর্মে লিপ্ত থাকে, তাহলে সাধ্য ও সুযোগমত তার প্রতিকার করাও আদেশ নিষেধ ও কল্যাণ কামনার অংশ। যেমন কারো পশু বিপদে পড়তে যাচ্ছে বা কারো ফসল নষ্ট করছে দেখতে পেলে মু'মিনের দায়িত্ব হল সুযোগ ও সাধ্যমত তার প্রতিকার করা। তিনি এই কর্মের জন্য আদেশ-নিষেধ ও নসীহতের সাওয়াব লাভ করবেন। পূর্ববর্তী যুগের প্রাজ্ঞ আলিমগণ এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেকেই এ সকল বিষয়কে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত বা দীন প্রতিষ্ঠার অংশ বলে বুঝতে পারেন না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।

দা'ওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা

দা'ওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী। পুরো ইসলাম একসাথে উপস্থাপন করার পরিবর্তে প্রথমে আক্বীদা-বিশ্বাস দিয়ে শুরু করা। এরপর পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আল্লাহর প্রতি ঈমান, রাসূলের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ইত্যাদি বিষয় সর্বাগ্রে উপস্থাপন করা। অর্থাৎ ঈমান ও আক্বীদা সংক্রান্ত বিষয়গুলো আগে উপস্থাপন করা। এসবের প্রতি যখন কোন ব্যক্তির

ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং যথার্থভাবে এ বিশ্বাস স্থাপন করে নেবে, তখন পর্যায়ক্রমে তাকে আমলী বিষয়গুলোর প্রতি দা'ওয়াত দেয়া, যেমন নামায, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি। দা'ওয়াতী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরী। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এক বর্ণনায় এসেছে-

وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ : لَا تَشْرَبُوْا الْخَمْرَ،لَقَالُوْا : لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَزْنُوْا،لَقَالُوْا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَإِنِّيْ لَجَارِيَةٌ لَعْبُ : {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْوَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} . وَمَا نَزَلَتْ سُوْرَةُ بَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّاوَأَنَا عِنْدَهُ

অর্থাৎ : 'যদি শুরুতেই নাযিল হতো 'তোমরা মদপান করো না', তবে তারা বলত, 'আমরা কখনো মদ ছাড়ব না।, যদি শুরুতেই নাযিল হতো, 'তোমরা যিনা করো না', তবে তারা অবশ্যই বলত, 'আমরা কখনো যিনা ছাড়ব না।' মক্কায় হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নাযিল হয়েছে- ((বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময়। আর ক্বিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর ও তিক্ততর।)) তখন আমি ছিলাম ছোট বালিকা। আর সূরা বাক্বারা ও সূরা নিসা যখন নাযিল হলো তখন তো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঘর করছি'। [বোখারী]

তবে এক্ষেত্রে পরিবেশ ও পরিপার্শ্বিকতার দাবি ও চাহিদা সামনে রেখে কর্তব্য পালনে মনযোগী হতে হবে। গুরুত্বানুসারে দা'ওয়াতী কার্যক্রমের টার্গেটসমূহ ঢেলে সাজাতে হবে। যারা তাওহীদ ও রিসালতে অবিশ্বাসী, আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্ববাদে এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের সার্বজনীন রেসালতে যাদের ঈমান নেই, তাদের প্রতি দা'ওয়াতী কার্যক্রমের প্রারম্ভিক বিন্দু হবে তাওহীদ ও রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান। তাওহীদ ও রিসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত হলে নামাযের প্রতি আহ্বান। এরপর রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির প্রতি পর্যায়ক্রমে আহ্বান। ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে-

حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْإِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّاالله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ

بِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ. (صحيح البخاري : كتاب الزكاة 544) باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا , رقم الحديث- ١٤٢٥)

অর্থাৎ : 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআ'য ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে যখন ইয়েমেনে পাঠান, তখন তাঁকে বললেন, 'তুমি নিশ্চয় কিতাবীদের কাছে যাবে। তাই যখন তুমি তাদের কাছে যাবে, তাদেরকে এ কথার প্রতি সাক্ষ্য দানের আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তারা যদি এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এ বিষয়ে তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে দরিদ্রদেরকে দেয়া হবে। যদি তারা এ ব্যাপারে তোমার অনুসরণ করে তবে তুমি তাদের সর্বোত্তম সম্পদ পরিহার করবে। আর মাযলুমের দো'আ থেকে হুঁশিয়ার থাকবে; কেননা মাযলুম ব্যক্তি ও আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরাল নেই'। [বোখারী]

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে এক বর্ণনায় এসেছে যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ "أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ) " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ , أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ , وَمُسْلِمٌ , مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, 'উত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। বলা হলো, 'এরপর কোনটি?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (জান মাল ব্যয়) করা'। বলা হলো, 'এরপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন,'মাবরুর হজ্জ'। [বোখারী]

দা'ওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন, মাও'ইযাহ্-ই হাসানাহ্ ও উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্কের গুরুত্ব

সূরা নাহল-এ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

قوله تعالى : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থাৎ: 'ডাকুন স্বীয় প্রতিপালকের পথে হিকমত (সুন্দর কৌশল)এবং মাও'ইযাহ্-ই হাসানাহ্ (উত্তমরূপে উপদেশ)সহকারে। আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর করুন উত্তম পন্থায়।' নিশ্চয় আপনার রব উত্তমরূপে জানেন তাকে, যে তাঁর পথ থেকে সরে গেছে আর তিনি হিদায়ত প্রাপ্তদেরকেও উত্তমরূপে জানেন। [নাহ্ল-১২৫]

এ আয়াতে খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তা'লীম দেওয়া হচ্ছে মানুষকে কিভাবে পথে আনতে হবে। এর তিনটি পন্থা বলা হয়েছেঃ ক. হিকমত, খ. মাও'ইযাহ্ হাসানাহ্ ও গ. জিদাল বিল্লাতী হিয়া আহসান (বিতর্কে উত্তমরূপে নিরুত্তর করা)।

হিকমত

দা'ওয়াত বা প্রচারের ক্ষেত্রে হিকমত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দা'ওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে দা'ওয়াতী সম্পর্ক কায়েম করার সঠিক পদ্ধতি কী হবে, কীভাবে তাকে ইসলামী আক্বীদা ও মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহী করে তোলা যাবে, কখন ও কোন্ পদ্ধতিতে দা'ওয়াত দিলে সে অতি সহজে সত্য অনুধাবনে সক্ষম হবে, এসব বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে হিকমতের আশ্রয় নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

হিকমত অর্থাৎ মযবূত দলিল-প্রমাণের আলোকে প্রজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে অত্যন্ত পরিপক্ক ও অকাট্য বিষয় বস্তু পেশ করতে হবে, যা শুনে সমঝদার ও জ্ঞানবান রুচিসম্পন্ন লোক তা মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ্য হবে এবং দুনিয়ার কাল্পনিক দর্শনাদি তার সামনে ম্লান হয়েযায়। কোন রকম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ যেন ওহী বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যকে পরিবর্তন করতে না পারে।

মাও'ইযাহ্-ই হাসানা

দা'ওয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো মাও'ইযাহ্-ই হাসানাহ্। মাও'ইযা-ইযাহ্ হাসানাহ্ অর্থ সুন্দর ওয়াজ বা কথামালা। বাচনভঙ্গি থেকে শুরু করে দা'ওয়াতী কথার উপকরণ নির্ধারণ, ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যুক্তি-প্রমাণ পেশ,

কাহিনী বর্ণনা, জান্নাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, জাহান্নামের ব্যাপারে ভয় ও শঙ্কা সৃষ্টি করা মাও'ইযা-ই হাসানার অন্তর্ভুক্ত।

মাও'ইযাহ-ই হাসানা দ্বারা মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশকে বোঝানো হয়েছে, যা কোমল চরিত্র ও দরদী আত্মার রস ও আবেগে থাকবে ভরপুর। নিষ্ঠা, সহমর্মিতা, দরদ ও মধুর চরিত্র দিয়ে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় যে নসীহত করা হয় তাতে অনেক সময় পাষাণ-হৃদয়ও মোম হয়ে যায়, মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার হয় এবং একটি হতাশ ও ক্ষয়ে যাওয়া জাতি গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। মানুষ ভয়-ভীতি ও আশাব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে চলে প্রবল বেগে, বিশেষত যারা ততটা সমঝদার, ধীমান ও উচ্চ মেধা-মস্তিষ্কের অধিকারী নয়, অথচ অন্তরে সত্য-সন্ধানের স্পৃহা প্রবল, তাদের হৃদয়ে মনোজ্ঞ ওয়ায-নসীহত দ্বারা এমন কর্ম-প্রেরণা সঞ্চার করা যায়, যা উঁচু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সম্ভব হয় না।

উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করা

মাও'ইযাহ্-ই হাসানার পরবর্তী পর্যায় হলো, 'উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করা'। অর্থাৎ যদি দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাওয়াত দাতার সাথে বিতর্ক করতে চায়, অথবা পরিস্থিতি বিতর্কের দিকে গড়ায় তাহলে সে ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করা। দুনিয়ায় সব সময় একটা দল এমনও থাকে, যাদের কাজই হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করা এবং কথায় কথায় হুজ্জত করা ও কূটতর্কে লিপ্ত হওয়া। এরা না হিকমতপূর্ণ কথা ক্বুবূল করে, না ওয়ায-নসীহতে কান দেয়। তারা চায় প্রতিটি বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের ময়দান উত্তপ্ত হোক। অনেক সময় প্রকৃত বোদ্ধা, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যানুসন্ধিৎসু স্তরের লোকদেরও সংশয়-সন্দেহ ঘিরে ধরে, আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়া তখন তাদেরও সন্তোষ লাভ হয় না। তাই বলা হয়েছে-'আর তাদেরকে বিতর্কে নিরুত্তর কর উত্তম পন্থায়।'

অর্থাৎ কখনো এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে তখন উৎকৃষ্ট পন্থায় সৌজন্য ও শিষ্টাচার এবং সত্যানুরাগ ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তর্ক-বিতর্ক কর। প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করতে চাইলে তা উত্তম পন্থায় কর। অহেতুক বেদনাদায়ক ও কলজে-জ্বালানো কথাবার্তা বলো না, যা দিয়ে সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না; বরং তা আরও জটিল হয়ে যায়। উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রতিপক্ষকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করা ও সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। রুক্ষতা, দুর্ব্যবহার, বাক-চাতুর্য ও হঠকারিতা কখনো সুফল দেয় না।

ইরশাদ হয়েছে-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

তরজমা: 'আপনি আপনার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করুন। নিশ্চয় একমাত্র আপনার রবই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন'। [সূরা আন নাহল: ১২৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .

তরজমা: 'আর তোমরা উত্তমপন্থা ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা যুলম করেছে। আর তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী'। [সূরা আল-আনকাবূত:৪৬]

দা'ওয়াতের স্থান, কাল ও পাত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা

দা'ওয়াতের স্থান, কাল ও পাত্র নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দা'ওয়াতী বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পন্থা ও পদ্ধতি নির্ণয় করতে হবে। যার সাথে যেভাবে কথা বললে অধিক ফলপ্রসূ বলে মনে হবে তার সাথে সে ধরনের ভাষায় কথা বলতে হবে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই মহাগ্রন্থ পবিত্র ক্বোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তরজমা: 'আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে তিনি তাদের কাছে বর্ণনা দেন, সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। [সূরা ইবরাহীম: ৪]

কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দিতে গেলে তাকে যথাযথ সম্মান দেখাতে হবে। অন্যথায় মানসিকভাবে সে দা'ওয়াতী কথাবার্তা শোনার জন্য প্রস্তুত

থাকবে না। এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-

"إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ" . سنن ابن ماجه كتاب الأدب باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه رقم الحديث-٣٧١٢.المستدرك على الصحيحين كتاب الأدب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه.رقم الحديث . ٧٨٦١

অর্থাৎ : "তোমাদের কাছে কোনো সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি এলে তাকে সম্মান কর'। [ইবনে মাজাহ-৩৭১২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত পাঠান, তখন তিনি তাকে 'আযীমুর রুম' অর্থাৎ রোমের মহান ব্যক্তি বলে খেতাব করেছিলেন। তাই সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়েই দা'ওয়াত কর্ম শুরু করতে হবে।

আর যারা দুর্বল তাদের প্রতিও যত্নশীল হতে হবে। কারণ এরাই হলো দা'ওয়াতের মূল শক্তি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বলরাই দা'ওয়াত গ্রহণে অধিক আগ্রহী হয়ে থাকে। দা'ওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিবানদের তুলনায় দুর্বলরাই অধিক হারে এগিয়ে আসে।

দা'ওয়াত কর্মে আদর্শিক দৃঢ়তা ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া

দা'ওয়াত কর্মে আদর্শিক দৃঢ়তা অত্যন্ত জরুরী। সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় অনেকেই দা'ওয়াতী বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকেন। এটা মারাত্মক অন্যায়। কেননা, দা'ওয়াত অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা উদাসীনতা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে এরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَاأُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ .

তরজমা: "হে আমার প্রিয় রাসূল, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছিয়ে দিন। আর যদি আপনি তা না করেন তাহলে তো আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছালেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়ত করেন না'।

[সূরা আল মা-ইদাহ: ৬৭]

সম্মানিত নবীগণ সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। দা'ওয়াত কর্ম শুরু করার পূর্বে তাঁরা সবাই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। কিন্তু দা'ওয়াত কর্ম শুরু করার সাথে সাথে তারা তাঁদের বিরাগভাজন হয়ে যায়। কিন্তু এ জন্য তাঁদের কেউ দা'ওয়াত কর্ম ছেড়ে দেননি। নবী হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে তাঁর সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো-

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

তরজমা: "তারা বলল, 'হে সালিহ, তুমি তো ইতোপূর্বে আমাদের মধ্যে প্রত্যাশিত ছিলে। তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ তাদের উপাসনা করতে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত? তুমি আমাদেরকে যার দিকে আহ্বান করছ, সে ব্যাপারে নিশ্চয় আমরা ঘোর সন্দেহের মধ্যে আছি'।

[সূরা হূদ:৬২]

দা'ওয়াত প্রচারে বিনম্র আচরণ

দাওয়াত প্রচারে বিনম্র আচরণ ও কথা একটি জরুরী বিষয়। হযরত মূসা ও হযরত হারুন আলায়হিমাস সালামকে আল্লাহ তা'আলা খেতাব করে বলেন-

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

তরজমা: "তোমরা দু'জন ফির'আউনের নিকট যাও, কেননা সে সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। হয়তো বা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।"

[সূরা ত্বাহা:৪৩-৪৪]

দা'ওয়াত প্রচারে অকাট্য দলীল-প্রমাণ পেশ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা জরুরী

দা'ওয়াত প্রচারে অকাট্য দলীল-প্রমাণ পেশ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা জরুরী, যাতে দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সকল সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং দা'ওয়াতকে অস্বীকার করার মতো তার কাছে কোন প্রমাণ না থাকে। এ ক্ষেত্রে নমরূদের সাথে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামের কথোপকথন বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ -

তরজমা: আপনি কি ওই ব্যক্তিকে দেখননি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে? আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন। যখন ইবরাহীম বললেন, 'আমার রব তিনিই, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইব্রাহীম বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন। ফলে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়ত দেন না'। [সূরা আল বাক্বারা:২৫৮]

দাওয়াত পেশ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে দলীল-প্রমাণ ও যুক্তির আশ্রয় নিতে হবে। বিনা দলীলে কথা বললে মানুষের বুদ্ধি-বিবেক তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। পবিত্র ক্বোরআনে এ ধরনের অনেক যুক্তিপ্রমাণ রয়েছে, আম্বিয়া-ই কেরাম তাঁদের দা'ওয়াত প্রচারে যুক্তিপ্রমারে পেশ করেছেন।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যুক্তি-প্রমাণ বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো, প্রাকৃতিক দলীল, যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে বুঝে নিতে হয়। যেমন সৃষ্টিজগৎ ও মানব প্রকৃতি কেন্দ্রিক সাধারণ যুক্তি-প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম চন্দ্র সূর্যের অস্ত যাওয়াকে, চন্দ্র-সূর্য যে রব হওয়ার অযোগ্য এবং রব কেবল তিনিই হবেন, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, এ বিষয়ের দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। শিরকী আক্বীদা-বিশ্বাসের সপক্ষে আল্লাহ্র পক্ষ হতে কিছু নাযিল-হওয়া কোনো প্রমাণ নেই। তাই মুশরিকরা যেসব বস্তুকে মা'বূদ বলে বিশ্বাস করে সেগুলোকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এ যুক্তিটিও একটি স্বাভাবিক যুক্তি, যা সকলেই বুঝে নিতে সক্ষম।

যাকে দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে তার বক্তব্য শোনা ও তাকে কথা বলতে দেয়া

যাকে দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে তার বক্তব্য শোনা ও তাকে কথা বলতে দেয়াও একটি জরুরী বিষয়। দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার কথায় ও আচরণে কঠোর হলে দা'ওয়াতদাতাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। দা'ওয়াত প্রচারে ধৈর্য হলো নবী

রাসূলগণের আদর্শ। দা'ওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির অশালীন আচরণ সম্পর্কে সকল নবী-রাসূলের অভিন্ন বক্তব্য ছিল-

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

তরজমা: "আমাদের কী হলো যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করবো না, অথচ তিনি আমাদের সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন। আর তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছ, আমরা তার ওপর অবশ্যই সবর করব। আর আল্লাহর ওপরই যেন তাওয়াক্কুলকারীরা তাওয়াক্কুল করে'। [সূরা ইবরাহীম: ১২]

একজন দা'ওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে প্রয়োজনে বছরের পর বছর দা'ওয়াতী মেহনত চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও আমাদেরকে প্রত্যয়ী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। হযরত নূহ আলায়হিস সালাম সাড়ে নয়শ' বছর যাবৎ তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি দা'ওয়াতী মেহনত চালিয়ে গেছেন। রাতদিন, প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল মাধ্যম ব্যবহার করে তাদেরকে তিনি দা'ওয়াত দিয়ে গেছেন। তাই এ ক্ষেত্রে ধৈর্যহারা হলে হক আদায় হবে না।

ব্যক্তিগতভাবে ও দলবদ্ধভাবে দা'ওয়াতী কাফেলা বা জামা'আত প্রেরণ

দা'ওয়াত কর্ম ব্যক্তিগতভাবে, দলবদ্ধভাবে, দা'ওয়াতী কাফেলা বা জামা'আত প্রেরণের মাধ্যমে আনজাম দেয়া যেতে পারে। সহীহ বোখারী শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে-

عن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبثنا عنده نحوا من عشرين ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (صحيح البخاري أبواب صلاة الجماعة والإمامة باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. رقم الحديث-٦٥٣

অর্থাৎ "হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আমি আমার সম্প্রদায়ের একটি দল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। আমরা সেখানে বিশ দিন অপেক্ষা করলাম। তিনি আমাদের প্রতি দয়া ও করুণাপরবশ ছিলেন। পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার তীব্র আগ্রহ আমাদের মধ্যে আঁচ করতে পেরে তিনি আমাদের নিজ গোত্রে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা ফিরে যাও এবং তাদের মাঝেই অবস্থান করো। তাদেরকে শেখাও এবং সালাত আদায় কর। সালাতের

সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে, আর তোমাদের মধ্যে অধিকতম বয়সী ব্যক্তি ইমামতী করবে'। [বোখারী শরীফ]

এক বা একাধিক ব্যক্তিকেও উদ্দিষ্ট স্থানে পাঠিয়ে দাওয়াত কর্ম আনজাম দেয়া যেতে পারে। হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নাজরানবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন, 'আমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রেরণ করুন। তিনি বললেন-

عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه (صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه, رقم الحديث-٣٥٣٥

অর্থাৎ: "নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাঠাব, যে হবে সত্যিকার অর্থেই বিশ্বস্ত।' লোকজন এ ব্যক্তির অপেক্ষায় থাকল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পাঠালেন'। [বোখারী শরীফ]

আবূ বুরদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ لَهُمَا: يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا رقم الحديث [٦١٢٤]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : " يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا "(صحيح مسلم كِتَاب الْجِهَاد وَالسِّيَر بَاب فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِير ...رقم الحديث- ٣٢٦٩)

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবূ বুরদাহ্ ও হযরত মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে ইয়েমেনে পাঠালেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা সহজ করবে কঠিন করবে না, সুসংবাদ দেবে ঘৃণা সৃষ্টি করবে না'। [বোখারী শরীফ]

দা'ওয়াত প্রচারে আধুনিক সকল মাধ্যম তথা প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া, ইন্টারনেট প্রযুক্তি ইত্যাদির ব্যবহার

দাওয়াত প্রচারে আমাদেরকে আধুনিক সকল মাধ্যমই ব্যবহার করতে হবে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া, ইন্টারনেট প্রযুক্তি এসব কিছুকেই দাওয়াত প্রচারে ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় শত কোটি মানুষের দোরগোড়ায় ইসলামের অমীয় বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া সম্ভবপর হবে না। আধুনিক প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলো এ বলে বর্জন করা যাবে না যে, এগুলো অমুসলিমদের আবিষ্কৃত। অথবা অন্যরা এসব মাধ্যমকে খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। কেননা আধুনিক প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যম আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট নি'মাত। তাই এ নি'মাতকে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুগের সকল প্রচার মাধ্যমকেই ব্যবহার করেছেন। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইত্তিবা' ও ইক্বতিদার দাবি হবে, আমাদের যুগের সকল প্রচার মাধ্যমকে আল্লাহর দীন প্রচারের ক্ষেত্রে যথাযথরূপে ব্যবহার করা।

উপসংহার

আল্লাহর পথে আহবান করতেই নবী-রাসূলগণের পৃথিবীতে আগমন। মু'মিনের জীবনের আন্যতম দায়িত্ব এই দা'ওয়াত। ক্বোরআনুল কারীমে এ দায়িত্বকে কখনো দাওয়াত, কখনো সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ, কখনো প্রচার, কখনো নসীহত ও কখনো দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলে অভিহিত করা হয়েছে। ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে এ কাজের গুরুত্ব, এর বিধান, পুরস্কার, এ দায়িত্ব পালনে অবহেলার শাস্তি এবং কর্মে অংশগ্রহণের শর্তাবলী এবং এর জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এ লেখাটিতে।

সমগ্র পৃথিবীতে ছয়শত কোটির বেশি মানুষের বসবাস। আর এদের অধিকাংশই অমুসলিম। আবার মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই হল নামে মাত্র মুসলিম। তাই ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে থাকলে আল্লাহর কাছে জওয়াব দেয়ার মতো কোনো ভাষা আমাদের থাকবে না। কাজেই আসুন, আমরা সবাই মিলে ব্যাপক পরিকল্পনা ও নিরলস কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হই।

---o---

তাসাওফ

তাসাওফ ও তরীক্বতের গুরুত্ব

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী *

।। এক ।।

তাসাওফ

'ইলমে তাসাওফ' বা সুফীবাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'তাসাওফ' তথা তরীক্বত চর্চা ও অনুশীলন করে মানবজাতি বাস্তব জীবনে ইসলামের প্রকৃত শান্তি উপলব্ধি করতে পারে। তাসাওফ ও তরীক্বত ভিত্তিক জীবন গঠন মানব জাতির ইহকালীন শান্তি, পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। 'তাসাওফ' ও 'তরীক্বত চর্চা' ইসলামের নতুন কোন বিষয় নয় এবং তাসাওফ হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত নির্যাস বা প্রাণ, ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আদর্শবিরোধী বাতিল অপশক্তিগুলো ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে বিলুপ্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে আসছে। ইসলাম বিদ্বেষী ও ইসলাম বিকৃতিকারীদের তাসাউফ ও তরীক্বত বিরোধী অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণে একশ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানরাও তাসাওফ ও তরীক্বত চর্চার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করছে অথবা এ ব্যাপারে উদাসীন হয়ে আছে। তাসাওফ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা না থাকার কারণেই তারা এ ঐশী জ্ঞানের সংযোগ ও অলৌকিক শক্তির সুপ্রভাব বঞ্চিত হয়ে আসছে। তাসাওফ চর্চা মানুষকে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলে। তাসাওফ ও তরীক্বত বর্ণিত ইসলাম প্রাণহীন ও ফ্যাকাশে। নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের এ ক্রান্তিকালে তাসাওফ চর্চা ও তরীক্বতের শিক্ষা অনুসরণেই মুক্তির পথ সুগম হওয়া নিশ্চিত। উন্নত চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে তাসাওফ শাস্ত্র এক নিয়ামক শক্তি।

---

* **অধ্যক্ষ**- মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল, মধ্যম হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।
সভাপতি- আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক।

'তাসাওফ' (تصوف) শব্দের বিশ্লেষণ

'তাসাওফ' (تصوف) শব্দটি আরবী। এর উৎস মূল নিয়ে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেন, এটা صوف (সূফ) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পশম। এ অর্থে 'সূফী' বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি পার্থিব জগতের লোভ-লালসা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগের নিদর্শন স্বরূপ পশমী কাপড় বা পোষাক পরিধান করেন। অবশ্য, আল্লামা ক্বোশায়রী বলেন, প্রকৃত সূফী হওয়ার জন্য এমনটি করা আবশ্যকীয় নয়। কারো কারো মতে تصوف শব্দটি صفا শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা। এ অর্থে সূফী সাধকরা হচ্ছেন পবিত্র-পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী। কারো কারো মতে, শব্দটি صف (সফ) থেকে উৎকলিত। এর অর্থ কাতার বা সারি। এ অর্থে সূফীরা হচ্ছেন মর্যাদাসম্পন্ন প্রথম কাতারের মানুষ[১]। কেউ কেউ বলেছেন, 'সূফী শব্দটি সুফ্ফাহ্ থেকে গৃহীত। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মসজিদে নবভী শরীফের একপাশে কিছু সাহাবী-ই রসূল সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করতেন, যাঁরা 'আসহাবে সুফ্ফা' নামে পরিচিত। ইসলামের ইতিহাসে এখান থেকেই সুফীবাদ শব্দটির উৎপত্তি বলে তাঁদের ধারণা। কেননা, সুফীগণও এ ধরনের সাধনার মাধ্যমে পবিত্র আত্মার অধিকারী।[২]

উল্লেখ্য, 'সূফী' 'সুফ্ফা' থেকে নির্গত হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়- প্রায় সত্তরজন সাহাবী, যাঁরা মসজিদে নববীতে এক প্রকোষ্ঠে অবস্থান করতেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।[৩]

ড. আর.এ. নিকলসন সূফী দর্শনের সমালোচক পন্ডিত, তিনি 'সূফী' শব্দটিকে সো ফিস্ট (Sophist) (আরবী سوف) থেকে নির্গত বলে মনে করেন। سوف (সূফ) অর্থ জ্ঞান আর سوفى মানে জ্ঞানী। سوف থেকে পরিবর্তিত হয়ে সূফী (صوفى) হচ্ছে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের আধার।[৪]

[১]. ড. মুহাম্মদ ফজলুল রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান। রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, জুন ১৯৯৮, পৃ.৪৫৮।
[২]. আল কাত্তানী, আত্ তারতীব আল ইসরী, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮২.
[৩]. সাম হুদী, ওয়াফাউল ওয়াফা, ১ম খন্ড, পৃ. ৩২২।
[৪]. ড. রশিদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, পৃ. ৩৪৭।

কিন্তু তরীক্বতপন্থী ও আরিফ বান্দাদের মতে, গ্রীক দার্শনিকদের সাথে ইসলামের সূফীদের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং এ সম্পর্কে ওলামা-মাশাইখ, সূফীগণের অভিমত নিম্নরূপঃ

ওলামা মাশা-ইখ ও সূফীগণের দৃষ্টিতে তাসাওফ

যেহেতু তাসাওফ ও সূফীদের প্রকৃত পরিচিতি নির্ণয়ে ওলামা-মাশা-ইখ ও সূফীগণের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হলেও নিম্নলিখিত কতিপয় মতামত থেকে উল্লেখযোগ্য তাসাওফ ও সূফীর সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায়-

১. আধ্যাত্মিক জগতের মহান দিকপাল অলীকুল সম্রাট হযরত শায়খ আবদুল কাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাসাওফ সম্পর্কে বলেছেন-

اَلتَّصَوُّفُ اَرْبَعَةُ اَحْرُفٍ تَاءٌ وَصَادٌ وَوَاءٌ وَفَاءٌ ـ فَالتَّاءُ مِنَ التَّوْبَةِ وَهُوَ عَلٰى وَجْهَيْنِ تَوْبَةُ الظَّاهِرِ وَتَوْبَةُ الْبَاطِنِ ـ وَالصَّادُ مِنَ الصَّفَا وَهُوَ اَيْضًا عَلٰى وَجْهَيْنِ صَفَآءُ الْقَلْبِ وَصَفَاءُ السِّرِّ فَصَفَاءُ الْقَلْبِ اَنْ يَصْفِىَ قَلْبُه مِنَ كُدُوْرَاتِ الْبَشَرِيَّةِ مِثْلُ الْعَلَائِقِ الَّتِىْ تُحْصَلُ فِى الْقَلْبِ مِنْ كَثْرَةِ الْاَكْلِ وَالشَّرَبِ وَالْمَنَامِ وَالْكَلَامِ وَالْمُلَاحَظَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ الخ وَاَمَّا صَفَاءُ السِّرِّ فَهُوَ بِالْاِجْتِنَابِ عَمَّا سِوَى اللهِ تَعَالٰى ـ وَاَمَّا الْوَاوُ فَهُوَ مِنَ الْوَلَايَةِ ... الخ وَنَتِيْجَةُ الْوَلَايَةِ اَنْ يَّتَحَقَّقَ بِاَخْلَاقِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللهِ تَعَالٰى ـ وَاَمَّا الْفَآءُ فَهُوَ الْفَنَآءُ فِى اللهِ جَلَّ جَلَالُهٗ فَاِذَا فَنَتْ صِفَاتُ الْبَشَرِيَّةِ تَبْقٰى صِفَاتُ الْاَحَدِيَّةِ وَهُوَ سُبْحَانَهٗ لَا يَفْنٰى وَلَا يَزُوْلُ فَبَقِىَ الْعَبْدُ الْفَانِىَ مَعَ الرَّبِّ الْبَاقِىْ وَمَرْضِيَاتِهٖ الخ

অর্থাৎ تَصَوُّفٌ (তাসাউফ) শব্দটি হচ্ছে আরবী চারটি বর্ণের সমষ্টিঃ প্রথম বর্ণ ت (তা), দ্বিতীয় বর্ণ ص (সোয়াদ), তৃতীয় বর্ণ و (ওয়াও) এবং চতুর্থ বর্ণ ف (ফা)। প্রতিটি বর্ণ মাহাত্ম্য জ্ঞাপক। যেমন 'তা' বর্ণ تَوْبَة (তাওবাহ্) এর দিকে ইঙ্গিতবহ। 'তাওবাহ্' দু' প্রকার- বাহ্যিক তাওবাহ্ ও অভ্যন্তরীণ তাওবাহ্; ص সোয়াদ বর্ণ দ্বারা صَفَا -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়। এর অর্থ পরিচ্ছন্নতা। এটিও দু'প্রকারঃ ক্বলবের পরিচ্ছন্নতা ও অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা। ক্বলব বা অন্তরের পরিচ্ছন্নতা হলো মানবীয় পঙ্কিলতা থেকে অন্তর পবিত্র হওয়া, যা সাধারণত মানুষের অন্তরে পাওয়া যায়, যেমন অধিক পানাহার, অধিক নিদ্রা, অধিক কথা বলা ও দুনিয়ার সাথে অধিক সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি। আর অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা

হলো, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে অন্তরাত্মাকে মুক্ত রাখা। আর واو (ওয়াও) বর্ণ দ্বারা (বেলায়ত) ولاية বুঝায়। বেলায়তের সারকথা হলো, বান্দা নিজেকে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত করা। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।'' 'তাসাওফ' শব্দের সর্বশেষ বর্ণ فاء; এটা দ্বারা فَنَافِى اللهِ-এর দিকে ইঙ্গিত করা যায়। অর্থাৎ বান্দা নিজেকে আল্লাহ্তে বিলীন করে দেওয়া। যখন মানবীয় গুণ বিলীন হয়ে যায়, তখন খোদায়ী গুণ বিকশিত হয়। আল্লাহ্র সত্তায় বিলীনতা নেই। সুতরাং ধ্বংসশীল বান্দা চিরন্তন সত্তার সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানে স্থায়িত্ব অর্জন করতে পারে।[১]

২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আবূ তালিব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হতে বর্ণিত,

عَلَيْكَ فِى التَّصَوُّفِ اَلتَّصَوُّفُ خُلُقٌ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فِى الْخُلُقِ زَادَ

অর্থাৎ 'তাসাওফ' অনুপম সুন্দর চরিত্রের নাম। যাঁর চরিত্র যত বেশী সৌন্দর্যমন্ডিত, তিনি তাসাওফের ততবেশি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবেন।[২]

৩. হযরত আবুল হুসাইন আননূরী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন,

اَلتَّصَوُّفُ تَرْكُ النَّفْسِ جُمْلَةً

অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে আত্মার কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ পরিত্যাগ করার নামই তাসাওফ।[৩]

৪. শায়খ আবুল হাসান রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন,

لَيْسَ التَّصَوُّفُ رُسُوْمًا وَلاَ عُلُوْمًا وَلٰكِنَّهُ اَخْلاَقٌ

অর্থাৎ তাসাওফ নিছক প্রথাগত বিদ্যা ও কেবল একটি শাস্ত্রের নাম নয়; বরং চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের নাম তাসাওফ।[৪]

৫. হযরত দাতাগঞ্জ বখশ মাখদুম আলী হাজভিরী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ كشف المحجوب-এ হযরত শায়খ খিযরীর বর্ণনা ব্যক্ত করেন,

[১]. সিয়ারুল আসরার, পৃ. ৮৮-৮৯
[২]. খলিক আহমদ নিযামী, তারিখে মাশায়েখ-ই চিশ্ত। (দিল্লী ১৯৬৩) পৃ. ১৮
[৩]. আবুল 'উলা- আফিফী ফী তাসাউফিল ইসলামী। (কায়রো ১৯৬৯) পৃ. ৩১
[৪]. শায়খ মুহাম্মদ ক্বায়সার রিসালা-ই কুশায়রিয়াহ্, পৃ. ১৯

اَلتَّصَوُّفُ صَفَاءُ السِّرِ مِنْ كُدُوْرَةِ الْمُخَالَفَةِ

অর্থাৎ তাসাওফ হচ্ছে সির্র বা অভ্যন্তরকে সত্যের বিরোধিতার পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত রাখার নাম।[১]

৬. শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী তাসাওফ প্রসঙ্গে বলেন,

اَلتَّصَوُّفُ هُوَ عِلْمٌ تُعْرَفُ اَحْوَالُ تَزْكِيَةِ النُّفُوْسِ وَتَصْفِيَةُ الاَخْلاَقِ وَتَعْمِيْرُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ لِنَيْلِ السَّعَادَةِ الاَبَدِيَّةِ

অর্থাৎ 'তাসাওফ' এমন এক শাস্ত্রের নাম, যে শাস্ত্রের চর্চায় আত্মার পবিত্রতা, চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, চিরস্থায়ী কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জনের নিমিত্তে আন্তরিক ও বাহ্যিক উৎকর্ষ ও সংস্কার সাধনের জ্ঞান অর্জিত হয়।[২]

৭. প্রখ্যাত সূফীসাধক হযরত ইমাম মা'রূফ কারখী (ওফাত ৮১৫খ্রি.)

اَلتَّصَوُّفُ هُوَ الاَخْذُ بِالْحَقَائِقِ وَالْيَأْسُ مِمَّا فِىْ اَيْدِى الْخَلاَئِقِ

অর্থাৎ তাসাওফ হচ্ছে হাক্বীক্বত তথা সত্যকে গ্রহণ করা এবং মানুষের হাতে যা আছে, তা অর্জন থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া।

মানুষের পার্থিব অর্জন, যশ-খ্যাতি, লোভ লালসা, কামনা-বাসনা ধন সম্পদের প্রাচুর্য এবং বিলাস বহুল জীবন যাপনের মহড়া থেকে নিজকে পবিত্র ও মুক্ত রেখে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, কল্যাণের পথে, হেদায়তের পথে এবং আল্লাহ্ ও স্বীয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি বিধানের পথে নিজকে নিয়োজিত রাখাই তাসাওফের মূল শিক্ষা।[৩]

৮. সিলসিলা-ই আলিয়া ক্বাদেরিয়ার শায়খুল মাশা-ইখ সৈয়্যদুল আউলিয়া হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাসাওফের পরিচয় ব্যক্ত করেন এভাবে-

اَلتَّصَوُّفُ اَلصِّدْقُ مَعَ الْحَقِّ وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ الْخَلْقِ

অর্থাৎ তাসাওফ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সত্যপরায়ণতা ও সৃষ্টির সাথে সুন্দর ও উত্তম আচরণ তথা আদর্শিক ব্যবহার করা।[৪]

মহান স্রষ্টার প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি মার্জিত, কাঙ্ক্ষিত, সুন্দর ব্যবহার ও উত্তম আচরণ প্রদর্শন তাসাওফের অন্যতম শিক্ষা ও আদর্শ।

[১]. দাতাগঞ্জে বশখ আলী হাজভীরী, কাশ্ফুল মাহজূব।
[২]. শরহুর রিসালাহ্ আল কুশাইরিয়্যাহ্, পৃ. ৭০,
[৩]. হযরত ইমাম মা'রূফ কারখী আলায়হির রাহ্মাহ্।
[৪]. শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী, গুনিয়াতুত্ ত্বালিবীন।

সূফীদের পরিচয়

ইসলামী পরিভাষায় ওই ব্যক্তিকে 'সূফী' বলা হয়, যিনি আল্লাহর নির্দেশিত ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথে নিজকে উৎসর্গ করেছেন, আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রেম ও ভালবাসায় সর্বপ্রকার ইবাদতে নিজকে মগ্ন রাখেন, আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া পার্থিব জীবনের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তির প্রতি তাঁর কোন কামনা-বাসনা থাকেনা এবং সৃষ্টি জগতের সবকিছুই যিনি আল্লাহ্‌তে বিলীন করে দেন তিনিই প্রকৃত সূফী।

সূফীদের পরিচয় প্রদানে ওলামা- মাশা-ইখের কতিপয় সংজ্ঞা নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১. হযরত বিশর হাফী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির মতে,

اَلصُّوْفِىُّ مَنْ صَفَا قَلْبُهٗ بِذِكْرِاللهِ

অর্থাৎ আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে যিনি স্বীয় আত্মা পরিশুদ্ধ করে নেন, তিনিই সূফী।[১]

২. হযরত যুন্নূন মিসরী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন,

اَلصُّوْفِىُّ هُمْ قَوْمٌ اٰثَرُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ شَئٍ

অর্থাৎ সূফী এমন এক শ্রেণীর বিশেষ বান্দা, যাঁরা জীবনের প্রত্যেক বস্তুর উপরে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসাকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেন।[২]

৩. হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি (ওফাত ২৯৭) বলেন,

اَلصُّوْفِىُّ اَنْ يَتَخَصَّصَ اللهَ بِالصَّفَاءَ فَمَنْ اصْطَفٰى
مِنْ كُلِّ مَاسِوَى اللهِ فَهُوَ الصُّوْفِىُّ

অর্থাৎ পবিত্রতার সাথে নিজকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া সকল কিছুর প্রভাব থেকে নিজকে মুক্ত রেখে আল্লাহর জন্য যিনি মনোনীত হয়েছেন, তিনি সূফী।[৩]

৪. সূফীগণ আসহাবে সূফ্‌ফার অনুসারী। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা-ই কেরাম সাদাসিধে জীবন যাপনে

[১]. আবুল 'উলা আফিফী ফী তাসাউফিল ইসলাম। (কায়রো ১৯৬৯), পৃ. ২৯
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩, আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম, ই.ফা.বা.পৃ. ৮৩

অভ্যস্থ ছিলেন। সূফীরাও হচ্ছেন ওই পুণ্যাত্মা বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসারী। শায়খ আবূ বকর ইবনে ইসহাক্ব বুখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন,

قَالَ قَوْمٌ اِنَّمَا سُمِّيَتِ الصُّوْفِيَّةَ لِقُرْبِ اَوْ صَافِهِمْ مِنْ اَوْصَافِ اَهْلِ الصُّفَّةِ الَّذِيْنَ
كَانُوْا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ একদল আলেম বলেন, সূফীদের 'সূফী' নামে নামকরণ এ অর্থে করা হয় যে, তাঁরা নিজ গুণাবলীতে আসহাবে সুফ্‌ফার নিকটবর্তী; যাঁরা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিলেন।[১]

৫. গাউসুল আ'যম দস্তগীর শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সূফীর পরিচয় দিয়ে বলেন,

اَلصُّوْفِىُّ مَنْ كَانَ صَافِيًا مِّنْ اٰفَةِ النَّفْسِ خَالِيًا مِنْ مَّذْمُوْمَاتِهَا سَالِمًا لِحَمِيْدِ
مَذْهَبٍ مُلاَزِمًا لِلْحَقَائِقِ غَيْرَ سَاكِنٍ قَلْبُهٗ اِلٰى اَحَدٍ مِّنَ الْخَلاَئِقِ

অর্থাৎ 'সূফী' ওই ব্যক্তি, যিনি কুপ্রবৃত্তির বিপদ থেকে পবিত্র থেকেছেন, নিন্দিত অপকর্ম থেকে মুক্ত, নিরাপদ প্রশংসিত পথে পরিচালিত সত্যকে অনিবার্যরূপে গ্রহণ করেছেন, সৃষ্টিরাজির কারো সাথে অন্তরের সংযোগ রাখেন না।[২]

৬. সূফীগণ পশমের পোশাক পরিধান করেন। অর্থাৎ সূফীগণ অনাড়ম্বর সাদাসিধে জীবন যাপন করে থাকেন, বৈচিত্রময় পোষাকের চাকচিক্য তাঁরা এড়িয়ে চলেন। আবূ নসর আস্ সার্‌রাজ এ প্রসঙ্গে বলেন-

اَلصُّوْفِيَةُ نُسِبُوْا اِلٰى ظَاهِرِاللُّبْسَةِ لِاَنَّ لُبْسَةَ الصُّوْفِ وَدَأْبُ الْاَنْبِيَآءِ
وَشِعَارُ الْاَوْلِيَاءِ وَالْاَصْفِيَاءِ

অর্থাৎ বাহ্যিক পোষাকের দিক দিয়েও সূফীগণকে সূফী বলা হয়। কারণ, পশমের কম্বল পরিধান করা নবীগণ, ওলীগণ ও সূফীগণের নিদর্শন বা প্রতীক।[৩]

৭. পূর্ববর্তী সূফীগণ ইলমে শরীয়তের ইমাম ছিলেন। আল্লামা ইবনুল জওযী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ৫০৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন, ৫৯৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি একাধারে মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক সমালোচক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় সহস্রাধিক গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তিনি সূফীবাদের একজন সূক্ষ্ম বিশ্লেষক হিসেবে একথা স্বীকার করেন যে,

[১]. ايقاظ الهمم ও شرح الحكم; খ. ১, পৃ. ৬
[২]. হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির, গুনিয়াতুত্ তালেবীন
[৩]. আল্লামা ইমাম কুশাইরী, রিসালা-ই কুশাইরিয়া, মিশর, পৃ. ১৯

وَمَا كَانَ الْمُتَقَدِّمُوْنَ فِى التَّصَوُّفِ اِلاَّ رُؤَسَاءُ
فِى الْقُرْاٰنِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيْثِ وَالتَّفْسِيْرِ

অর্থাৎ পূর্ববর্তী সূফীগণ ক্বোরআন, ফিক্বহ্ ও হাদীস এবং তাফসীরের ইমাম ছিলেন।

আজকের যুগে সূফী নামধারীদের অনেকে শর'ঈ জ্ঞানশূন্য। যথারীতি শর'ঈ জ্ঞানে পারদর্শী না হয়েও 'আল্লামা' ও 'শাহ্সূফী' উপাধি ধারণকারী অনেক ভন্ড প্রতারকও প্রতিনিয়ত সরলপ্রাণ মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। ইসলামবিরোধী শরীয়তবিরোধী, আউলিয়া-ই কেরামের আদর্শ ও চেতনাবিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার পরও 'শাহ্' 'সূফী' লক্বব ধারণ করা প্রকৃত সূফীবাদ তথা সূফীয়া-ই কেরামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি প্রতারণা ও প্রহসনের শামিল। এসব ভন্ড সূফীদের বেশভূষা দেখে সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। এদের স্বরূপ উম্মোচন এবং এদের অশুভ তৎপরতা ও প্রতারণা থেকে দেশ জাতি ও মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করা সকলের ঈমানী দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে হযরত ইয়াহ্ইয়া মু'আয রাযী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন,

اِجْتَنِبْ صُحْبَةَ ثَلاَثَةِ اَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ -
اَلْعُلَمَاءِ الْغَافِلِيْنَ وَالْفُقَرَاءِ الْمُدَاهِنِيْنَ وَالْمُتَصَوِّفَةِ الْجَاهِلِيْنَ

অর্থাৎ তিনি প্রকার লোকের সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকা অপহিরার্যঃ এক. অলস ও অমনোযোগী আলিম থেকে, দুই. প্রতারক পদলেহী তোষামোদকারী ফক্বীর থেকে এবং তিন. অজ্ঞ সূফী থেকে।[১]

সূফীবাদের ক্রমবিকাশ

মহাগ্রন্থ ক্বোরআনুল করীম ও প্রিয়নবীর সুন্নাহ তথা হাদসি শরীফই সূফীবাদের উৎস। পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হয়েছে-

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ আত্মাকে বিশুদ্ধ করেছে, সে সফলকাম হয়েছে আর যে একে কলুষিত করেছে, সে অকৃতকার্য হয়েছে।[২]

এতে প্রমাণিত হয় যে, আত্মশুদ্ধি তথা তাসাওফ অর্জন ও চর্চা ব্যতীত কল্যাণ ও সফলতা আশা করা যায়না।

১. খলীক আহমদ নিযামী, তারিখে মাশায়েখে চিশত, পৃ.৩৬
২. ক্বোরআনুল করীম, সূরা শাম্স, ৯১: ৯,১০

অসংখ্য হাদীস শরীফেও ইলমে তাসাওফ তথা বাতেনী বা আধ্যাত্মিক ইলমের কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন,

قَالَ اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَالِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ
وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ

অর্থাৎ ইলম দু' প্রকার: অন্তরের ইল্ম, এটি উপকারী ইলম। মুখের ইলম এটি আদম সন্তানের উপর দলীল।[১]

বর্ণিত হাদীসে অন্তর সম্পর্কিত ইলমই হলো তাসাওফ বা সূফীবাদ। এ প্রকার ইলমের অপর নাম ইলমে বাত্বিন। যেমন, হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَىٰ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا قَدْ بَيَّنْتُ فِيْكُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَلَوْ بَيَّنْتُ فَقُطِعَ الْبَلْعُوْمُ

অর্থাৎ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে দু'টি জ্ঞানের পাত্র সংরক্ষণ করেছি; এক প্রকার যাহেরী জ্ঞান, যা আমি তোমাদের মধ্যে বর্ণনা করেছি। অপরটি যদি আমি বর্ণনা করতাম, তাহলে আমার কণ্ঠনালী কেটে ফেলা হতো।[২] এর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বই ইসলামে তাসাওফ নামে খ্যাত। যেমন সূরা কাহ্ফের বর্ণনায় হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম ও হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালামের মধ্যে সংগঠিত ঘটনায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই আল্লাহর সূফীবাদী পূণ্যাত্মা প্রিয় বান্দারা এ প্রকার ইলমের অধিকারী। এ প্রকারের ইল্মে তাসাওফের সূচনা হয় হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকেই। তাসাওফের প্রথম শিক্ষক হলেন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম। নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন তাসাওফের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা।

১. মিশকাত শরীফ, পৃ. ৩৭০
২. মিশকাত শরীফ, ইলম পর্ব, পৃ. ৩৭

সাহাবা-ই কেরাম থেকে যাহেরী ও বাতেনী ইলম অর্জন করে নিজেদেরকে ধন্য করেন। সাহাবা-ই কেরাম ও তাবে'ঈদের যুগে তাসাওফ চর্চা অব্যাহত থাকলেও তাদেরকে সূফী নামে অভিহিত করা হতো না, দার্শনিক আল বেরুনীর মতে, 'সূফী' শব্দটি প্রথম কুফাবাসী আবূ হাশিম উসমান ইবনে শরীফ (ওফাত-১৬২ হিজরী, ৭৭৭ খ্রি.) থেকে শুরু হয়।[১]

অন্যদের মতে, 'সূফী' নামটি প্রথম যুক্ত হয় হযরত জাবির ইবনে হাইয়্যান (ওফাত ১৬৪হি.) এর উপর। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে 'সূফী' নামটি জন সাধারণে বিস্তার লাভ করে। এ সময়ের কতিপয় উল্লেখযোগ্য সূফীসাধক বিশেষভাবে স্মরণীয়- ১. হযরত হাসান আল বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি হিজরি ২১ সালে ৬৪২ খৃস্টাব্দে মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতকালে তিনি বসরায় গমন করেন। হিজরি ১১০ সালে এখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। ১২০ জন সাহাবীকে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৭০ জনই ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মহান সাহাবী।[২]

ইবরাহীম ইবনে ঈসা বলেন, আমি আখিরাতের চিন্তায় হাসান বসরীর চেয়ে অধিক চিন্তিত ও ক্রন্দনকারী আর কাউকে দেখিনি।

হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন,

اِبْنَ اٰدَمَ بِعْ دُنْيَاكَ بِاٰخِرَتِكَ تَرْبَحْهُمَا جَمِيْعًا

وَلاَ تَبِعْ اٰخِرَتَكَ بِدُنْيَاكَ فَتَخْسِرَهُمَا جَمِيْعًا

অর্থাৎ হে মানব সন্তান! তুমি আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া বিক্রি করে দাও। এতে তোমরা দু'টিই লাভ করতে পারবে। সাবধান, দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি করো না। এতে দু'টিই হারাবে।[৩]

২. হযরত রাবেয়া বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা (ওফাত ১৫৮হি.)। হযরত রাবেয়া বসরী ছিলেন এক মহিয়সী রমণী। বর্ণিত আছে যে, এক সময় তিনি এক হাতে পানি এবং আরেক হাতে আগুন নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো কেন দৌড়াচ্ছেন? তিনি বললেন ''মানুষ দোযখের ভয়ে ইবাদত করে। আমি পানি দিয়ে দোযখকে নিভিয়ে দেবো। আর কিছু লোক জান্নাতের লোভে

[১]. ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বাদশ খন্ড, ১৯৯২ পৃ. ৩৯৪

[২]. সাইয়্যেদ কাসেম মাহমুদ, ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, করাচি, পৃ. ৭৮৪

[৩]. ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৮ম খন্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ২৮৪

ইবাদত করে। এ জন্য আগুন দিয়ে জান্নাতকে জ্বালিয়ে দেবো।'' বান্দা তার সব আমল যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্যই করে। এটাই একমাত্র সূফীতত্ত্বের মূলকথা।

৩. হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক্ব (ওফাত ৭৬৫খ্রি.)

৪. হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম। (ওফাত ৭৭৭ খ্রি.)

৫. হযরত মা'রূফ কারখী (ওফাত ৮১৫ খ্রি.)

৬. হযরত ফুদ্বাইল ইবনে আয়ায (ওফাত ৭৯৪খ্রি.)

৭. হযরত দাঊদ আত্ তাঈ। (ওফাত ৭৮২খ্রি.)

৮. হযরত শফীক্ব আল বলখী। (ওফাত ৮১০খ্রি.)

৯. হযরত হারিস আল মুহাসিবি। (ওফাত ৮৫৭খ্রি.)

১০. সমকালীন সময়ে মিশরের অন্যতম সূফী সাধক ছিলেন হযরত আবুল ফয়য সওবান ইবনে ইব্রাহীম (প্রসিদ্ধ যুননূন আল মিসরী) হিসেবে। তিনি সূফীবাদে 'মাক্বাম' ও 'হাল' স্তর সম্পর্কিত ধারনার প্রবর্তন করেন।[১]

১১. পারস্য দেশীয় সূফী মনসূর হাল্লাজ। (ওফাত ৯২২)। তিনি সূফী তত্ত্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর মতে, মানব সত্তা ঐশী সত্বার সাথে একাকার হয়ে গেলে সাধক ব্যক্তিগত দ্রষ্টায় পরিণত হয়। তখনি বলে উঠেন 'আনাল হক' হযরত মনসূর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি নিজেই এ উক্তি করেছিলেন। তৎকালীন যাহেরী ইলমের অধিকারী এক শ্রেণীর আলেম তাঁকে অভিযুক্ত করেন।

১২. সূফী মতবাদের বিকাশে আধ্যাত্মিক সাধক হযরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি (ওফাত ১২৪১)। তিনি ছিলেন 'ওয়াহ্দাতুল ওজূদ'-এর প্রবক্তা, যার সারকথা, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অণুর মধ্যে প্রকাশিত হন। কবির ভাষায়-

وَفِىْ كُلِّ شَىْءٍ لَهٗ اٰيَةٌ تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ الْوَاحِدُ

অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টির মাঝে তাঁর সত্তার নিদর্শন রয়েছে। ওই নিদর্শনই প্রমাণ করে যে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

১৩. সূফীবাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ ও দার্শনিক মাত্রায় সূফী তত্ত্বের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠায় হযরত ইমাম গায্যালী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি (১০৫৮-১১১১)

[১]. Majid fakhry. op cit. P.3

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী, হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম (ওফাত ৮৭৪) ও হযরত শিবলী প্রমুখ সূফীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি সূফীবাদের সমর্থন ও প্রশংসা জ্ঞাপন এবং বিভ্রান্তির স্বরূপ উন্মোচন করেন। তিনি 'আল মুনক্বিয মিনদ্বদ্বালাল' 'ভ্রান্তি থেকে মুক্তিদাতা' পবিত্রতা নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেন।

সূফীবাদের গ্রহণযোগ্যতা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে এবং এ ভাবধারাকে সর্বাধিক জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে সাহিত্য রচনা ও কাব্য রচনার মাধ্যমে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল করীম জীলী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, হযরত মোল্লা জামী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, হযরত শেখ সা'দী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রমুখে ভূমিকা চির অম্লান হয়ে থাকবে।

---o---

।। দুই ।।

ত্বরীক্বত

ত্বরীক্বতের গুরুত্ব

طريقت (ত্বরিক্বত) শব্দটি طرق (ত্বরুক) থেকে গৃহীত। এর আধিভানিক অর্থ পথ, রাস্তা, নির্দেশনা। আর পারিভাষিক অর্থ- পথ চলার নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান, আইন-কানূন, নিয়মাবলী, পদ্ধতি-প্রণালী, নির্দেশনা, নির্দেশিকা, দিশা-দিশারী প্রভৃতি। ইলমে মা'রিফাতপন্থীদের একটি পরিভাষা তরীক্বত। মা'রিফতের পরিভাষায় চারটি মূলনীতি সহকারে খোদাপ্রাপ্তির সাধনা করতে হয়। যথা-

১. শরীয়ত, ২. তরীক্বত, ৩. হাক্বীক্বত ও ৪. মা'রিফাত। খোলাফা-ই রাশেদীনের পরবর্তী যুগে সূফীবাদের বিস্তার ঘটলে আউলিয়া-ই কেরাম ও সূফীসাধকগণের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার প্রসারে বিভিন্ন তরীক্বার উদ্ভব ঘটে। হানাফী, শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবগুলো যেমনি ইলমে শরীয়তকে

পরিপূর্ণতা দান করেছে, তরীক্বতগুলোও তেমনি ইলমে মা'রিফাতকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছে।[১]

ক্বোরআন মজীদে ত্বরীক্বতের নির্দেশনা

আল্লাহর নির্দেশিত, প্রিয়নবীর প্রদর্শিত এবং সাহাবা-ই কেরামের অনুসৃত বিধিমালার যথার্থ অনুসরণের নাম তরীক্বত। যুগে যুগে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ক্বোরআন, সুন্নাহর আলোকে সৎপথের নির্দেশ দিয়ে মুক্তিকামী মানুষের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা অন্ধকার থেকে আলোর পথে পৌঁছার যে নিয়ম-পদ্ধতি ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন সেটাই তরীক্বত বা তরীক্বাহ্।

তরীক্বতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তরীক্বত অবলম্বণের অপরিহার্যতা প্রমাণে ক্বোরআন-সুন্নাহর নির্দেশনাই মূলভিত্তি। নিম্নে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ক্বোরআনিক দলীল পেশ করা হলোঃ

তরীক্বতের মূলনীতি প্রসঙ্গে সূরা ফাতিহায় এরশাদ হয়েছে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

তরজমা: (হে আল্লাহ!) আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করো, তাদেরই পথে, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছো।[২]

উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর বা বিশদ বর্ণনায় নিম্নোক্ত আয়াতে চার শ্রেণীর নি'মাত প্রাপ্ত বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

এরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ

তরজমা: যারা আল্লাহ্ রসূলের আনুগত্য করে তারা ওইসব লোকের সাথে থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবীগণ সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ।[৩]

আল্লাহর মনোনীত বুযুর্গনে দ্বীন সালেহীন পুণ্যাত্মাবান্দাদের অনুসরণের কথা ক্বোরআনুল করীমের বহু স্থানে নির্দেশ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন,

---

১. ফক্বীর আবদুর রশীদ, সূফীতত্ত্ব, ই.ফা.বা. পৃ. ২২১
২. আল ক্বোরআন, ১: ৫
৩. আল ক্বোরআন, ৪:৬৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)

তরজমা: হে মু'মিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ অবলম্বন করো ।[১]

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জীবনাদর্শ বিশ্বমানবজাতির জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় । ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে এ শ্রেণীর প্রিয় বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণের কথা পবিত্র ক্বোরআনে বহু স্থানে বিঘোষিত হয়েছে । এরশাদ হয়েছে-

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ

তরজমা: যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু' করেছে, তার পথকে অনুসরণ করো ।[২]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে,

اَلْوَصُوْلُ لاَ يَحْصِلُ اِلاَّ بِالْوَسِيْلَةِ هِىَ عُلَمَاءُ الْحَقِيْقَةِ وَمَشَائِخُ الطَّرِيْقَةِ

অর্থাৎ ওসীলা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা যায়না । ওসীলা হচ্ছেন হক্কানী ওলামা-ই কেরাম ও ত্বরীক্বতপন্থী মাশায়েখ বা কামিল পীর মুর্শিদগণ । সত্যিকার তরীক্বতপন্থী দ্বীনের অনুসারী মুত্তাক্বী পরহেযগার বান্দারা হচ্ছেন হিদায়তপ্রাপ্ত । তরীক্বতের আদর্শ শিক্ষাচ্যুত বান্দা গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন,

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

তরজমা: আল্লাহ্ পাক যাকে হিদায়ত করেন, সে হিদায়ত পায় এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন ওলী (কামিল), মুর্শিদ পাবেনা ।

ঈমান আক্বীদার হিফাযতের জন্য সকল মুজতাহিদ ইমাম কামিল পীর মুর্শিদের পদাঙ্ক অনুসরণকে অপরিহার্য মনে করেছেন । হুযূর গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রণীত 'সিররুল আসরার' কিতাবে উল্লেখ করেন,

لِكَوطَلَبُ اَهْلِ التَّلْقِيْنِ لِحَيَاةِ الْقُلُوْبِ فَرْضٌ

অর্থাৎ অন্তরাত্মাকে যিন্দা করার জন্য আহলে তালক্বীন তথা কামিল মুর্শিদের শরণাপন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক ।

---

১. আল ক্বোরআন, ৯:১১৯

২. আল ক্বোরআন, ৩১:১৫

ইমামুল আইম্মাহ, কাশফুল গুম্মাহ্ হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন,

لَوْلاَ ثِنْتَانِ لَهَلَكَ نُعْمَانُ

অর্থাৎ আমি (আবূ হানীফা) যদি আমার পীর-মুর্শিদ ইমাম জা'ফর সাদেক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট বায়আত গ্রহণপূর্বক তাঁর সান্নিধ্যে দু'বছর না থাকতাম, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম ।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রণীত 'কীমিয়া-ই সা'আদাত' গ্রন্থে, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রণীত 'মাকতূবাত শরীফ'-এ সৈয়্যদুল আউলিয়া হযরত ইমাম আহমদ কবীর রেফা'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রণীত 'আল বুনিয়ানুল মুশাইয়্যাদ' গ্রন্থে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ফাযেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রণিত 'নাক্বাউস সুলাক্বাহ্ ফী আহকামিল বায়'আত ওয়াল খিলাফাহ' (১৩১৯হি.) গ্রন্থে ইলমে তাসাওফ অর্জন তথা পীর-মুর্শিদের বায়'আত গ্রহণ করাকে অপরিহার্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ।

এ ক্ষেত্রে বিখ্যাত সুফী সাধক আল্লামা জালালুদ্দিন রুমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ও তাঁর পীর মুর্শিদ হযরত শামসুদ্দীন তাবরীযির ঘটনা প্রণিধানযোগ্য । মাওলানা রুমী বলেন,

مولا . ا ہرگز سد مولائے روم ـ ا غلام شمس تبریزی سد

অর্থাৎ আমি মাওলানা রুম মাওলানা রুমী হতে পারতাম না, যদি না আমার পীর শামসে তাবরীযের গোলামী করতাম ।[১]

এ কারণে যতবড় জ্ঞানী হোক না কেন, শর'ঈ জ্ঞানের পাশাপাশি তরীক্বত তথা তাসাওফের জ্ঞান না থাকলে গোমরাহ্ তথা পথভ্রষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে ।

হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রনীত 'মু'আত্তা'য় এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন । তিনি বলেন,

مَنْفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ

---

১. মাওলানা রুমী, মসনবী শরীফ, আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী, নাম- মুহাম্মদ, উপাধি- জালালুদ্দিন, তাঁর পিতার নামও ছিল মুহাম্মদ, উপাধি- বাহাউদ্দিন । খোরাসানের অন্তর্গত বলখ নগরীতে ৬০৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ।

وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইলমে ফিক্বহ তথা শর'ঈ জ্ঞান অর্জন করলো এবং ইলমে তাসাওফ তথা তরীক্বতের জ্ঞান অর্জন করলো না, সে ফাসিক্ব হলো, যে ব্যক্তি ইলমে তাসাওফ অর্জন করল অথচ ইলমে ফিক্বহ অর্জন করলো না সে যিন্দীক্ব হলো। আর যে ব্যক্তি উভয় প্রকার ইল্‌ম অর্জন করল, সে প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করলো।[১]

প্রসিদ্ধ তরীক্বাসমূহ

বিশ্বব্যাপী ইসলামী আদর্শ শিক্ষা ও নৈতিকতার উৎকর্ষ সাধনে বিভিন্ন তরীক্বার ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। ইসলামী গবেষকদের পরিবেশিত তথ্য অনুসারে এ পর্যন্ত বিশ্বে ৩১৩ টি তরীক্বার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১১০টি তরীক্বা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বীনী আখলাক্ব সৃষ্টি ও আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উপমহাদেশে ১০/১২টি তরীক্বা বিস্তার লাভ করেছে। এর মধ্যে ৪টি তরীক্বা প্রধান। যথা- ক্বাদেরীয়া, চিশতীয়া, নক্বশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়াহ্। অন্যান্য তরীক্বাগুলোকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ চারটি তরীক্বার শাখা-প্রশাখা বা সমন্বয় বলা হয়। এ চারটি তরীক্বা ৪০০ হিজরীর শেষে এবং ৫০০ হিজরীর প্রারম্ভে মুসলিম বিশ্বের নানাস্থানে বিশেষত পাক-ভারত উপমহাদেশে, মুসলমানদের রুহানী জগতে যে ইনকিলাব তথা বিপ্লব সাধন করেছে, তা ইতিহাসের এক স্বর্ণালী অধ্যায়। এ প্রসিদ্ধ চার তরীক্বার মধ্যে ক্বাদেরীয়াহ্ তরীক্বাহ্ হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন তরীক্বাহ্। হযরত শায়খ সৈয়্যদ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ তরীক্বার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসারে এ তরীক্বাহ্‌সিলসিলা-এ আলীয়া ক্বাদেরীয়া' নামে বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি ৪৭০ মতান্তরে ৪৭১ হিজরীর ১লা রমযান (২৯ শা'বান দিবাগত রাত) মোতাবেক ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহর শতসহস্র ওলীর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি জীলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বুযুর্গ পিতার নাম সাইয়্যেদ আবূ সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত। মাতার নাম হযরত সাইয়্যেদাহ্ ফাতেমা বিনতে সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ্ সাওমা'ঈ যাহেদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিম আজমাঈন। ইসলামের এ মহান সাধক ওলীকুল সম্রাট হযরত আবদুল ক্বাদির জীলানী

[১]. মোল্লা আলী ক্বারী মিরক্বাতুল মাফাতীহ: ১ম খন্ড, পৃ. ২৫৬

রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ৫৬১ হিজরি সনে ১১ রবিউস্ সানী সোমবার ৯১ বছর বয়সে পুণ্যভূমি বাগদাদে ইন্তিক্বাল করেন।[১]

চিশতিয়া তরীক্বা

হযরত খাজা মু'ঈনুদ্দিন চিশতী আজমিরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হলেন চিশতিয়া তরীক্বার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ৫৩৭ হিজরী মোতাবেক ১১৪২ খ্রিস্টাব্দে সীস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাক-ভারতে আসেন। ৬৩৩ হিজরি মোতাবেক ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে আজমীরে ইন্তেকাল করেন। চিশতিয়া তরীক্বাহ্ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, চীন আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দেশে বিস্তার লাভ করে এবং নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিশ্বে বহু দেশে প্রচলিত আছে।

খাজা-এ খাজেগান আতা-এ রসূল হযরত খাজা গরীব-নাওয়ায মঈন উদ্দীন চিশতী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বিরাজের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ভারতবর্ষে কলেমার আওয়াজ বুলন্দ করেন। মূলতঃ হযরত গরীব নাওয়াযের বরকতময় হাতেই ভারতে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কালক্রমে গরীব-নাওয়াযের ভাবাদর্শে উজ্জীবিত সৈনিকদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ উপমহাদেশে ইসলামের বিজয়-নিশান উড্ডীন হয়েছে। সুলতান ইলতুৎমিশের যুগে বিখ্যাত সূফী সাধক খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, সুলতান আলা উদ্দীনের যুগে হযরত খাজা নিযাম উদ্দীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি, তা'আলা আলায়হি ফিরোজ শাহ্ তুঘলক্বের শাসনামলে হযরত নাসীর উদ্দিন মাহমূদ চেরাগ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বিশ্ববিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক হযরত মোজাদ্দিদ আলফেসানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, সম্রাট আওরঙ্গ যেবের যুগে বিশ্ববিখ্যাত আলিমে দ্বীন মোল্লা জীবন রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রমুখ জাতির ক্রান্তিকালে ইসলামী তাহযীব-তমুদ্দুন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার কাজে যে কোরবানী বা ত্যাগের নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

চিশতিয়া তরীক্বার অনুসারীদের মতে, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র শিক্ষা ও আদর্শ হযরত আলী

[১]. আল্লামা ইবনে কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ, দ্বাদশ খন্ড: পৃ. ১৪৯

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাধ্যমে হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লাভ করেন। এ তা'লীম রূহানীভাবে হযরত খাজা ওসমান হারওয়ানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি পর্যন্ত চলে আসে। খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী গরীব নাওয়ায তাঁর খলীফা হিসেবে এ তরীক্বার নিয়ম-পদ্ধতি সুবিন্যস্তরূপে বিধিবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর খলীফাগণও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে অসাধারণ অবদান রাখেন।

নক্বশবন্দিয়া তরীক্বা

নক্বশবন্দিয়া তরীক্বার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হযরত শায়খ খাজা বাহাউদ্দিন ইবনে মাহমূদ বোখারী। তিনি ৭১৮ হিজরী সনে মধ্য এশিয়ার বোখারায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সেই তিনি সূফীত্বের দীক্ষা লাভ করেন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি যখন কামালিয়াতের উচ্চ মার্গে অবস্থান করেন, তখন তিনি যেদিকে থাকাতেন সেদিকেই শুধু 'আল্লাহ্' নামের চিত্ররূপ দেখতে পেতেন। অথবা তিনি যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, সেদিকেই 'আল্লাহ' নামের নক্বশা অঙ্কিত হয়ে যেত। সে কারণেই তিনি ইতিহাসে 'বাহাউদ্দিন নক্বশবন্দ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।[১] তিনি ৭৯১ হিজরিতে ইন্তেক্বাল করেন। এ তরীক্বার গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম হলো, ছয় লতীফার উপর সাধনা করা ও প্রতিক্রিয়া ঘটানো। লত্বীফাগুলো হলো, ক্বলব, রুহ, নাফ্স, সির, খফী ও আখফা। এ তরীক্বার অনুসারীগণ মনে করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে যে গুপ্ত ইল্ম দান করেছিলেন, তা এ তরীক্বার শায়খগণের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে।

নক্বশবন্দিয়া তরীক্বার অনুসারী ও সূফীগণ ইসলামী শরীয়তের নির্দেশনাবলীর প্রতি একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও মনযোগ সহকারে অধিকতর মনোনিবেশ করে থাকেন। তরীক্বতের বিভিন্ন ওযীফা, মোরাক্বাবা ও যিকরের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট থাকেন। খাজা বাহাউদ্দিন নক্বশন্দ এ তরীক্বার তা'লীমকে সুসংবদ্ধ, সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেন। এ তরীক্বার শীষ্যরা 'আল্লাহ' নামের বরকতময় ইসমটির নক্বশা বা চিত্র হৃদয়ে ধারণ করেন বলেই এ তরীক্বার নাম নক্বশবন্দীয়া তরীক্বা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।[২]

---

১. সূফী জীবন দর্শন, পৃ. ৫৬

২. ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশ সূফী সম্প্রদায় ও তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনা, সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ, ঢাকা। আগষ্ট ১৯৬৯, পৃ. ৪০

মুজাদ্দেদিয়া তরীক্বা

হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী ওরফে হযরত শায়খ আহমদ ফারুক্বী সেরহিন্দি রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি মুজাদ্দেদীয়া তরীক্বার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ৯৭১ হিজরীতে ভারতবর্ষের সেরহিন্দ নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় মহাদেশে যখন খোদাদ্রোহী, নবীদ্রোহী, তাগুতি ও কুফরিশক্তির প্রভাবে সর্বত্র কুফর শির্ক, বিদ্'আত, অত্যাচার, অবিচার, যুল্ম, নির্যাতন, শোষণ-নিপীড়ন, কুসংস্কার, ইসলামবিরোধী শরীয়তবিরোধী নানাধরনের কর্মকান্ড সর্বত্র ছেয়ে গিয়েছিল, ইসলামের এমনি এক ক্রান্তিকালে গণমানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং সর্বত্র ইসলামের সুমহান আদর্শ ও সুশিক্ষার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার প্রয়াসে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা। ইসলামে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। তাঁর বেলায়ত ও মাকালাতের খোদাপ্রদত্ত শক্তির প্রভাবে, সর্বপ্রকার কুফর শির্ক ও বিদ্'আতের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করে ইসলামের নিস্কলুষ ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত তথাকথিত 'দ্বীন-ই ইলাহী'র মূলমন্ত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আকবর খলীফাতুল্লাহ্' ইসলামের বিরুদ্ধে এক সুগভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখা দেয়। এর কালো মেঘে যখন ভারতবর্ষ আচ্ছাদিত হচ্ছিল, তখনই ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী তখন পূর্ণ বেলায়তী শক্তি দিয়ে আকবরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, ইসলামের নামে বিকৃতি ও ষড়যন্ত্রের সকল বিষদাঁত ভেঙ্গে দেন। ইসলামের মূলমন্ত্র কলেমার সুমহান বাণী 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'র দাবী ও আবেদন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্বকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এ ছাড়াও তিনি উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, নাচ-গান ইত্যাদি কুসংস্কারপূর্ণ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধেও কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যান। ইসলামের আধ্যাত্মিক জেহাদের এই কঠিন সংগ্রামে তিনি সকল প্রকার বাতিল শক্তিকে পরাভূত করেন। ইসলামী ঝান্ডাকে সমুন্নত করেন। ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই ধারাবাহিকতায় এ তরীক্বার শায়খগণ আজও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবজাতির চরিত্র গঠনে ও আত্মার সংশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার প্রচার-প্রসার

বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসারে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার সূফীসাধক ও মাশা-ইখের ভূমিকা ও অবদান অগ্রগণ্য। বিশেষতঃ ভারতীয় উপমহাদেশে ক্বাদেরীয়া তরীক্বার শায়খগণের অক্লান্ত সাধনার বদৌলতে ইসলামের যে সম্প্রসারণ ও

বিস্তার ঘটেছে, তা ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। ঐতিহাসিকদের পরিবেশিত তথ্যমতে, প্রখ্যাত ওলীয়ে কামেল হযরত আবদুল করীম ইবনে ইব্রাহীম আলজীলী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ক্বাদেরীয়া তরীক্বার প্রসার ঘটে। ১৩৮৮ খৃস্টাব্দে তিনি ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। উল্লেখ্য যে, এ সময়েরও অনেক পূর্বে বাবা আদম শহীদ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ১১৪২ খৃস্টাব্দে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে ১২ জনের আরবীয় বণিক কাফেলাসহ জাহাজযোগে চট্টগ্রাম আগমন করেন। তিনি বাংলাদেশের মহাস্থানগড়ে ক্বাদেরীয়া তরীক্বার প্রচার-প্রসার কল্পে খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা বল্লাল সেনের সাথে তাঁর সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে বাবা আদম বিক্রমপুরে শাহাদত বরণ করেন। একইভাবে গাউসুল আ'যম জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রূহানী নির্দেশক্রমে এ দেশে তিনি ইসলাম প্রচারে অসাধারণ অবদান রেখেছেন, তিনিও ক্বাদেরীয়া তরীক্বার অন্যতম মহান শায়খ। হযরত শাহ্ মাখদূম রোপোশ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি রাজশাহীর বৃহত্তম অঞ্চলে ১১৮৪ খৃস্টাব্দে ইসলাম প্রচার করেন। ৬১৫ হিজরীর ২ রজব তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

হুযূর গাউসে পাকের ২৭ পুত্রের একজন হলেন হযরত আযাল্লাহ শাহ্ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। হযরত আযাল্লাহ্ শাহ্ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির ২য় পুত্র হলেন হযরত শাহ্ মাখদূম রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। এ হিসেবে তিনি ওলীকুল সম্রাট গাউসুল আযম দস্তগীরের প্রিয়তম পৌত্র তথা নাতি। এ ছাড়া হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি রচিত তাফসীরে নইমীর সূরা আন'আম-এর তাফসীরের এক পর্যায়ে ভারতবর্ষে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার প্রচারক হিসেবে হযরত সৈয়্যদ কবির উদ্দিন দুল্হা দরিয়ায়ী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির নাম উল্লেখ করেন। তিনি আনুমানিক ১০৬১ হিজরি মোতাবেক ১৬৬৭ খৃস্টাব্দের দিকে পাঞ্জাবের গুজরাটে ইন্তেকাল করেন।

এক বর্ণনা মতে হযরত শাহ্ ক্বাসিম রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এতদঞ্চলে সর্বপ্রথম ক্বাদেরীয়া তরীক্বার প্রচারক ছিলেন। তিনি ছিলেন গাউসে বাগদাদের বংশধর। বাংলার মা'লার বা মালোরা নামক স্থানে তিনি ইন্তেক্বাল করেন। হযরত সৈয়্যদ আবদুর রায্যাক্ব রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছিলেন তার প্রধান খলীফা। ক্বাদেরিয়া ত্বরীক্বার প্রচারে এ মহামনীষীর নামও উল্লেখযোগ্য।

এভাবে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য সূফী সাধক মাশা-ইখের অক্লান্ত ত্যাগ ও ক্বোরবানীর বদৌলতে সিলসিলাহর ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ক্বাদেরিয়া তরীক্বা এতদঞ্চলে সর্বত্র দ্রুত প্রচার প্রসার ও বিস্তার লাভ করে।

এ তরীক্বার প্রচার-প্রসারে আরো যাঁদের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণীয়, তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন- খাজায়ে খাজেগান খলীফায়ে শাহে জীলান গাউসে যমান ক্বুত্ববে দাওরান, গুপ্ত রহস্যাবলীর অন্তর্দ্রষ্টা, মা'আরিফে লাদুন্নিয়ার প্রস্রবণ হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ১২৬২ হিজরী মোতাবেক ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবোটাবাদ জেলার হরিপুরের চৌহর শরীফে প্রখ্যাত ওলীয়ে কামেল হযরত খাজা ফক্বীর মুহাম্মদ খিদ্বরী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি পবিত্র ঔরশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরই প্রধান খলীফা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ৩৯তম বংশধর হযরত হাফেজ ক্বারী মাওলানা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছিলেন ক্বাদেরিয়া তরীক্বার একজন সফল প্রচারক। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রচেষ্টায় ভারত, পাকিস্তান, বার্মা (মায়ানমার)সহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য মাদরাসা, মক্তব, মসজিদ ও খানক্বাহ্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের এবোটাবাদ, শেতালু শরীফ সিরিকোট গ্রামের সৈয়্যদাবাদ শরীফের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে হযরত সৈয়্যদখানী যামান শাহ্ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির সাহেবজাদা হযরত সৈয়্যদ সদর শাহ্ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র ঔরশে ১২৭১/৭২ হিজরি মোতাবেক ১৮৫২ সালে কুত্ববুল আউলিয়া হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি জন্ম গ্রহণ করেন। তারই ঔরশে ১৩৩৬ হিজরী, মোতাবিক ১৯১৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন মাতৃগর্ভের ওলী গাউসে যমান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি।[১]

তিনি ছিলেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চল্লিশতম অধঃস্তন পুরুষ এবং আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির সাহেবযাদা। ১৯৯৩'র ৭ জুন ১৫

[১]. তাযকিরা, ১৯৯৩ (উর্দু), পেশোয়ার, পাকিস্তান। পৃ.৬

যিলহজ্ব ১৪১৩ হিজরী সোমবার সকাল ৯টায় এ মহান আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ ইন্তেকাল করেন।[১]

১৯৭৭ সালে হুযূর কেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর দুই সাহেবযাদা মাখদূমে মিল্লাত রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.যি.আ.) ও রওনক্বে আহলে সুন্নাত রাহবরে মিল্লাত সাহেবযাদা আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (মু.যি.আ.)কে সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরিয়ার খিলাফত প্রদান করেন।[২]

এ দু' মহান দিক্‌পাল বর্তমানে কাদেরিয়া তরীক্বার প্রচার-প্রসার, শরীয়ত-তরীক্বত, মাযহাব-মিল্লাত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতাদর্শ বিস্তারে বিশ্বব্যাপী বহুমুখী খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে আউলিয়া কেরাম, সূফী সাধক, ওলামা-মাশায়েখ, হক্কানী, রব্বানী, আলেম-ওলামা ও মাশায়েখ-ই 'ইযামের বিরামহীন প্রচেষ্টা ও সাধনার বদৌলতে নানা বাধা বিপত্তি প্রতিকূলতা প্রতিবন্ধকতা এবং প্রতিপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ, অনুপম শিক্ষা, চরিত্রমাধুর্য দিয়ে কলুষিত মানবাত্মাকে হিদায়তের পথে, কল্যাণের পথে, সত্যের পথে, মুক্তির পথে আহ্বান করে যাচ্ছেন। অসংখ্য দিশেহারা বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট মুক্তিকামী মানুষ আজ আউলিয়া-ই কেরাম ও মাশায়েখ-ই এযামের সান্নিধ্যে সিরাতুল মুস্তাক্বীম তথা ইসলামের সঠিক আক্বিদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাক্বের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনকে পুণ্যময় ও আলোকিত করার সুযোগ লাভ করে ধন্য হচ্ছেন। মূলতঃ এঁদের কর্মময় জীবন আমাদের মুক্তির পাথেয়। তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ আমাদের উভয় জগতের নাজাতের ওসীলা।

আল্লাহ্ পাক তাঁদের পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন। আ-মী-ন।

---o---

[১]. Daily Khabarin, pakistan, 1993, P.2

[২]. মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন, রেযা ইসলামিক একাডেমি, সন. ১৯৯৮, পৃ. ২৩৫

উপমহাদেশে ক্বাদেরিয়া ত্বরীক্বার সম্প্রসারণে শাহানশাহে সিরিকোটের অবদান

ড. মোহাম্মদ সাইফুল আলম *

তরীক্বায়ে ক্বাদেরিয়ার পরিচয় ও যোগসূত্র

'ত্বরীকা-ই ক্বাদেরীয়া'র নাম শুনতেই মনে এসে যায়, এ ত্বরীকা হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে চালু ও প্রচলন হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ত্বরীক্বতের ভিত্তি স্থাপন করেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই দিনে, যখন তিনি হেরা পর্বতের গুহায় একাকী ইবাদত-বন্দেগী করেছিলেন। ওহী আসল, হুকুম হল, আর সেই হুকুম পালনের জন্য ত্বরীকতের পথ নির্ধারণ করেন তিনি। স্বয়ং গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরশাদ করেন, "আমি ওই ত্বরীকা প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করি, যেটার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবীগণ ও তাবি'ঈন ছিলেন। শেষ যমানায় অধিকাংশের উপাস্য দিরহাম ও দিনার হয়ে গেছে।"

নগদ অর্থের এই উপাসনা তখনই দূর হবে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ত্বরীকায় মুসলমানদের আত্মা পবিত্র ও অন্তর পরিস্কার-পরিশুদ্ধ হবে। আর আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার নিয়ম-রীতির নামই ত্বরীকা।

এ ত্বরীকা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফা-ই রাশেদীনের যুগেও ছিল। যেমন, সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন, সময়ের প্রেক্ষাপটে খোলাফা-ই রাশেদীন ও অপরাপর সাহাবা, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) একে অন্যের নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। যদিও মুসলিম মহামনীষীদের কেউ কেউ বায়'আত গ্রহণের ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে শুধু

* **উপাধ্যক্ষ-** জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

সালতানাত বা খেলাফতের বায়'আতের কথা উল্লেখ করেছেন, তথাপি কেউ ত্বরীকার বায়'আতকে অস্বীকার ও বিরোধিতা করেন নাই। কেননা, ত্বরীক্বতের বায়'আতের অন্যতম উৎস-প্রমাণ হিসেবেও ওই বায়'আতকে উপস্থাপন করা হয়। এ দু'ধরনের বায়'আতের অর্ন্তনিহিত ভাব হল আনুগত্য। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র 'উস্ওয়া-ই হাসানা' ও তাঁর প্রবর্তিত ত্বরীকার যথাযথ অনুসরণের অনিবার্য সুফল হচ্ছে ওলী হওয়া। এটা হলো- খোদা প্রদত্ত এক বিশেষ ক্ষমতা। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হলেন **'শাহে বেলায়ত'**। এ বেলায়তের এক উচুতর পদমর্যাদা হলো 'গাউসুল আ'যম এক পর্যায়ে এ দায়িত্ব হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে ন্যস্ত হয়। ইমাম মেহদীর শুভাগমণ পর্যন্ত এ দায়িত্ব তাঁরই হাতে বহাল থাকবে। তাছাড়া, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে এ ত্বরীকার বেলায়তের ফয়য-বরকতের ধারা শায়খ পরম্পরায় তিন ধারায় হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে মিলিত হয়ে ক্বাদেরীয়া ত্বরীকার রূপ লাভ করে। যেমন- হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাধ্যমে; এ ধারার নাম ক্বাদেরিয়া বসরীয়া, ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাধ্যমে, তাঁর অধ্ব:স্তন চতুর্থতম পুরুষ ইমাম মূসা আলী রেদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নামানুসারে এ ধারার নাম ক্বাদেরিয়া রেদ্বভীয়া এবং ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাধ্যমে; এ ধারার নাম ক্বাদেরিয়া হাসানিয়া হিসেবে সূফীগণের নিকট পরিচিত। অবশ্য শেষোক্তটি প্রসিদ্ধ না হলেও হযরত গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বংশীয় পরম্পরায় ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে মিলিত হয়েছে।

অধিকন্তু বেলায়ত হচ্ছে- নুবূয়্যতের ছায়া। এটা স্বত:সিদ্ধ কথা বটে; কিন্তু ছায়া যে মূলের অনুরূপ হয়ে থাকে- এটাও বাস্তবসম্মত। দৃশ্যত: এ উভয় কথা সাংঘর্ষিক মনে হলেও বস্তুত কোন দ্বন্দ্ব নেই। ইমামগণের মতে, প্রত্যেক নবীর নুবূয়্যতের মাঝে বেলায়ত বিদ্যমান।* স্বয়ং হযরত গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

* ইলমে মানত্বিকের ভাষায় বিষয়টি এভাবে বলা যায়- প্রত্যেক নবী ওলীও কিন্তু প্রত্যেক ওলী নবী নন।

"প্রত্যেক ওলি কোন না কোন কদমে (নবীর ছায়ায়)
রয়েছেন আর আমি পূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ রাসূল সাল্লাল্লাহু
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কদমে আছি।"

কাজেই ত্বরীকা-ই ক্বাদেরিয়া'র ভিত্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এ ত্বরীকা হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে- সব মাশায়িখ হতে প্রাপ্ত হন, তাঁদের প্রসিদ্ধ শাজরা (শায়খ পরম্পরা) নিম্নরূপ:

১. **হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)**।
২. হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রিদ্বওয়ানুল্লাহে আন্হুম)
৩. হযরত শায়খ হাসান বসরী
৪. হযরত ইমাম হুসাইন
৫. হযরত শায়খ হাবীবে আ'যমী
৬. হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন
৭. হযরত শায়খ দাউদ তাঈ
৮. হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাক্বের
(যিনি হযরত সালমান ফার্সী (র.)'র তত্ত্বধানে লালিত-পালিত হন)
৯. হযরত ইমাম জাফর আল-সাদেক্ব
১০. হযরত ইমাম মূসা আল রেদ্বা
১১. হযরত শায়খ আল মা'রূফ আল কারখী হানাফী
১২. হযরত শায়খ সারিউস্ সাক্বত্বী
১৩. হযরত শায়খ জুনাঈদ আল বাগদাদী
১৪. হযরত শায়খ আল শিবলী মালেকী
১৫. হযরত শায়খ আবুল ফদ্বল আবদুল ওয়াহেদ আত্ তামিমী
১৬. হযরত শায়খ আবুল ফারাহ আল ত্বারত্বুসী
১৭. হযরত শায়খ আবুল হাসান আলী আল-হাক্কারী
১৮. হযরত শায়খ আবু সা'ঈদ আলী আল-মুবারক আল মাখযূমী হাম্বলী
১৯. **হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ সায়্যিদ আবদুল ক্বাদের জিলানী**
[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমা'ঈন]

এ শায়খ পরম্পরা সূত্রে হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শায়খদের মধ্য সবাই হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী রয়েছেন।

আবার তাঁর শিক্ষকগণের শিক্ষা-সনদের চার মাযহাবের ইমাম যথাক্রমে হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখও তাঁর শায়খুল মাশায়িখ তথা উস্তাদগণের উস্তাদ। এ চার মাযহাবের কেন্দ্র হল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার নূরানী সত্ত্বা। সুতরাং ত্বরীকতের সূত্রে যেমন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে 'উসওয়া-ই হাসানা' ও ত্বরীকা'র ফয়য-বরকত প্রাপ্ত হন, তেমনি ইসলামী শরী'আতের চার মাযহাবের ভিত্তিতেও প্রাপ্ত হন। এ কারণে যখনই তিনি ইসলামী শরী'আতের কোন মাসআলা-মাসা-ইল সর্ম্পকে ফাত্ওয়া দিতেন, তখন চার মাযহাব অনুসারে সমাধান দিতেন।

তা ছাড়া, বংশগতভাবেও তিনি এ ত্বরীকা লাভ করেন। তিনি ছিলেন পিতা আবূ সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দিক দিয়ে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বংশধর এবং মা উম্মুল খায়ের ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বংশীয় পরম্পরায় ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে মিলিত হয়েছে। তাঁর আম্মাজানের বংশ পরম্পরা এই-

হযরত গাউসুল আ'যম শায়খ সায়্যিদ আবদুল ক্বাদের জিলানী > **উম্মুল খায়ের ফাতেমা** > আবদুল্লাহ সাওমা'ঈ > আবু জামাল > মুহাম্মদ > আবু মাহমুদ তাহির > আবুল 'আতা আবদুল্লাহ > কামাল ঈসা > 'আলাউদ্দীন মুহাম্মদ জাওয়াদ > ইমাম আলী রেদ্বা > ইমাম মূসা কাযেম > ইমাম জা'ফর সাদেক > ইমাম মুহাম্মদ বাক্বের > ইমাম যায়নুল 'আবেদীন > ইমাম হুসাইন > হযরত আলী ইব্নে আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

উপরন্তু তাঁর পিতার বংশ-পরম্পরা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পাশাপাশি ইসলামের অন্যান্য তিন খলিফা যেমন- হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, হযরত উমর ফারূক্ব ও হযরত উসমান যুন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সাথেও সম্পৃক্ত। হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পিতৃকুলের বংশ পরম্পরা এই-

হযরত গাউসুল আযম শায়খ সায়্যিদ আবদুল ক্বাদের জিলানী > **আবু সালেহ মূসা জঙ্গী** > আবদুল্লাহ > ইয়াহিয়া আল যাহিদ > মুহাম্মদ > দাউদ > মূসা > আবদুল্লাহ > মূসা আল জূন > আবদুল্লাহ আল মাহাদ্ব > আল হাসান আল-

মুসান্না > ইমাম হাসান > হযরত আলী ইব্নে আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

এখানে হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দাদী 'উম্মে সালমা' (আবদুল্লাহ'র স্ত্রী) বংশ পরম্পরায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পুত্র আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে সম্পৃক্ত। আবার উর্ধ্বস্তন নবম পুরুষ আবদুল্লাহ আল মাহাদ্বের পিতা 'আল হাসান আল মুসান্নার ইন্তেকালের পর তাঁর মা 'ফাতেমা'কে আবদুল্লাহ ইব্নে আল-মুযাফ্ফর বিয়ে করেন, যিনি হযরত উস্মান যুন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পুত্র উমরের বংশধর। আবার আবদুল্লাহ ইব্নে আল-মুযাফ্ফরের মা 'হাফসা' হযরত উমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ'র কন্যা। যদিও পুত্র সন্তানের মাধ্যমে বংশ সাব্যস্ত হয়, তারপরও এ কথা স্বত:সিদ্ধ যে, সন্তান মাতৃকুলের গুণাবলী লাভ করে থাকে। সুতরাং হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ধমনীতে ইসলামের খলীফা চতুষ্টয়ের অন্তরস্থিত সদাশয়তা ও উত্তম গুণাবলীও প্রবহমান ছিল। এ কারণে তাঁর মাঝে একই সময় 'সিদ্দীক্বিয়াত' (সততা ও সত্যতা), 'ফারুক্বিয়াত' (সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ে পারঙ্গমতা), 'উসমানিয়াত' (সৃষ্টির প্রতি অমুখাপেক্ষিতা) এবং 'আলভিয়াত' (মহত্ব ও উন্নতর সাহসিকতা) সমুজ্জ্বল। যে কারণে "ক্বাদেরিয়া ত্বরীকা'র অনুসারী শায়খগণের মাঝেও এ সব গুণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এ ছাড়াও, হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শায়খ আহমদ আস্ওয়াদ দায়নূরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হ'তে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খিরক্বাহ (ত্বরীকার খেলাফতের বিশেষ পোশাক), হযরত আবুল খায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিরক্বাহ এবং শায়খ মুহাম্মদ মাগরিবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র খিরক্বাহ লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুরও খিরক্বাহ প্রাপ্ত হন। কাজেই, এ দুই ধারায়ও তিনি এ ত্বরীকা প্রাপ্ত হন। বস্তুত: মহান আল্লাহ'র জালালী (তেজস্বী) ও জামালী (মহত্ব-সৌন্দর্য্য) গুণাবলীর একমাত্র প্রকাশস্থল হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে নি:সৃত যতগুলো

ঝর্ণাধারা রয়েছে, সবগুলোর মিলনকেন্দ্র ছিলেন হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পবিত্র সত্ত্বা। সে জন্যে হযরত সুলতান বাহু রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

"অন্যান্য সকল ত্বরীকার যেখানে শেষ, সেখান হতে এ ত্বরীক্বার সূচনা মাত্র"।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

"সকল ত্বরীকা হতে সর্বোৎকৃষ্ট তরীক্বা হল 'ক্বাদেরিয়া ত্বরীকা'।"

তাছাড়া, সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের উপযোগী করে ইল্‌ম-ই তাসাউফ তথা ত্বরীক্বতের মূলনীতি প্রণয়ন ও ভিত্ রচনা করার কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাই তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এ ত্বরীকা 'ক্বাদেরিয়া ত্বরীকা' নামে খ্যাতি লাভ করে। যদিও তাঁর পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে ত্বরীকত চর্চা ও সূফী-সাধনা হয়ে আসছিল; কিন্তু সেটা অনুসরণ-অনুশীলন সাধারণ মুসলমানদের জন্য সহজসাধ্য ছিল না। সে জন্যে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকা'র মূলনীতিগুলোর সাথে পূর্বেকার প্রচলিত ত্বরীকত চর্চা ও সূফী সাধনার সংশ্লিষ্টতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে পরবর্তীকালের আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাবানগণ এ ত্বরীকার যোগসূত্র নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে নানা মত প্রকাশ করেছেন। যেমন, সাধারণত: ধারণা করা হয় যে,

"এ ত্বরীকার উর্ধ্বতন শায়খ হযরত আবুল ফারাহ ত্বারত্বুসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র অনুসৃত রীতি-নীতির সাথে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।"

কিন্তু শাহজাদা দারাশিকূহ বলেন যে,

"উসওয়া-ই হাসানা' তথা সুন্নাত অনুসরণের দিক বিবেচনা করে এ ত্বরীকাকে সায়্যিদুত্ তায়িফা হযরত শায়খ জুনাঈদ আল-বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সময়কাল পর্যন্ত জুনাঈদিয়া বলা হত।"

তবে হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন,

"হযরত গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ত্বরীকার উদাহরণ এমন এক নদী, যা ক'দিন ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রবাহিত হয় আবার যমীনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে পড়ে এবং ভিতরে ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে ভিতরের কূপগুলো ভরে দেয়। আবার যমীন হতে বিদীর্ণ হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের উপর

অনেক দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এটাই এ ত্বরীকার অবস্থা। যেরূপ শায়খগণের মাঝে একবার এ ত্বরীকার খেলাফত প্রদান ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, দ্বিতীয়বার মধ্যখানের শায়খ বা পীর-মুরশিদ ছাড়াই বাত্বেনীভাবে এ ত্বরীকার নিসবত (সম্পৃক্ততা) গ্রহণ কোন কোন বুযুর্গ হতে প্রকাশ পায়। সত্যি করে জিজ্ঞেস করলে বলব, ত্বরীকায়ে ক্বাদেরীয়া পুরোটাই ওয়াইসিয়া।"

উল্লেখ্য, হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির এ অভিমতটি শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির শ্রদ্ধেয় পীর আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ধারাবাহিকভাবে স্বীয় পীর হযরত ইয়াকূব শাহ গিনছাতরী কাশ্মিরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হতে খেলাফত লাভ এবং হযরত গাউসুল আ'যম রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির মাযার শরীফ যিয়ারত করার সময় বাত্বেনীভাবে নিসবত গ্রহণ প্রকাশিত হওয়ার সাথে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উপমহাদেশে ক্বাদেরীয়া ত্বরীকা

হিজরী প্রথম শতকের একেবারে গোড়ার দিকে উপমহাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ইসলামের আগমনের সাথে সাথে ত্বরীকত চর্চার সূচনা হয়। অত:পর ৭১৩ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন ক্বাসেম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের পর থেকে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাসান চিশতী আজমেরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির আগমন পর্যন্ত প্রায় পৌনে পাঁচশত বছর ইসলাম প্রচারের গতিধারা ছিল অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন। এই অর্ন্তবর্তীকালে অনেক উলামা-মাশা-ইখ আগমন করলেও তাঁদের ইসলাম প্রচার ছিল সীমিত স্থানে ও সময়ে আবদ্ধ। ফলে তা বেশীদূর পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। হযরত খাজা আজমেরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছিলেন হযরত গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আত্মীয় ও বয়সে প্রায় ষাট বছরের ছোট। গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে উপমহাদেশে এসে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ নির্দেশ তিনি তখনই প্রদান করেন, যখন তিনি হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইতিপূর্বে এ ভূ-পৃষ্ঠে ইসলামের মজবুত ভিত্ রচনা করতে বিশ্বব্যাপী তাঁর সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। ওই সময় নিজের সন্তান ও খলিফাদেরকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনাবাদী জায়গাতেও প্রেরণ পূর্বক আবাদ করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবে

চারিদিকে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার বিস্তার ঘটে; কিন্তু খাজা আজমীরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ছিলেন চিশতিয়া ত্বরীকার অনুসারী। তিনি উপমহাদেশের সাধারণ জনগণকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের সাধারণ জনগণের মাঝে তাঁর ইসলাম প্রচার ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে, যার কারণে চিশতীয়া ত্বরীকার প্রভাব ও হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে ব্যাপকতা লাভ করে।

হিজরী ষষ্ঠ হতে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে উপমহাদেশে আগত সোহরাওয়ার্দিয়া ত্বরীকার অনেক শায়খও সোহরাওয়ার্দীয়া ত্বরীকার প্রচার চালান। তবে এ উভয় ত্বরীকার শায়খগণের খানকাহগুলোতে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার ওযীফা ও কর্মগুলো, যেমন গেয়ারভী শরীফ, গাউসিয়া শরীফ, যিক্‌র ইত্যাদি অতি ভক্তি সহকারে পালন করা হত। যে কারণে এ সব ত্বরীকার সাধারণ মানুষ ক্বাদেরীয়া ত্বরীকার প্রতি ছিল বেশ শ্রদ্ধাশীল। যদিও সুন্নাতের পদাঙ্ক অনুসরণে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার নিয়ম-রীতিসমূহে তখনকার সাধারণ নও-মুসলমানদের অভ্যস্ত হতে কিছুটা কষ্টসাধ্য ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সে কারণে আলেমসমাজে তখন এ ত্বরীকার চর্চা সীমাবদ্ধ থাকে। সে সময়কার অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় সময় ও স্থানগত পার্থক্য ও দূরত্ব থাকার প্রেক্ষিতে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার প্রচার উল্লেখযোগ্য ছিল না। অন্যদিকে পরবর্তীকালের ত্বরীকা সম্পর্কে কলামিষ্ট বুযর্গদের প্রায় ছিলেন চিশতীয়া ও সোহরাওযার্দীয়া ত্বরীকার অনুসারী; যারা নিজ নিজ ত্বরীকা নিয়ে তৎপর ছিলেন। ফলে উপমহাদেশে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত অনুদ্‌ঘাটিত থেকে বলা যায়। কাজেই, উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ক্বাদেরিয়া ত্বরীকাকে প্রচার করেছে? এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে বলা খুবই কঠিন। ইদানিং কোন কোন গবেষক এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মত ব্যক্ত করলেও তাতে ঐতিহাসিক তথ্যগত অসঙ্গতি ও পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য বেশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

মাস'উদ হাসান শিহাব দেহলভী বর্ণনা করেন,

> সিন্ধুতে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার প্রথম বুযর্গ ছিলেন হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহজাদা শায়খ শরফুদ্দীন ঈসা। তিনি শরফুদ্দীন ক্বাত্তাল নামে পরিচিত। উপমহাদেশে তিনি কিছু দিনের জন্য আগমন করেন।

ড. আবদুল মজীদ সিন্ধীর মতে,

> হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহজাদা শায়খ সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহ্‌হাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ত্রিশ বছর বয়সে মাত্র আঠার দিন মুলতানে অবস্থান করতে বাগদাদে ফিরে যান।

ড. ইয়াহ্‌ইয়া আন্‌জুম বলেন,

> হযরত খাজা আজমীরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর সাথে হযরত গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহজাদা শায়খ সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে চব্বিশ বছর বয়সে উপমহাদেশে প্রেরণ করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে তার স্ত্রী আয়েশা ও খাদেম মুযাফ্‌ফরও ছিলেন। তিনি মাত্র ছয় মাস হযরত খাজা আজমীরীর সাথে আজমিরে অবস্থান করেন। অত:পর তাঁর অনুমতিক্রমে নাগূরে গমন করেন এবং সেখানে ওফাত বরণ করেন। নাগূরে তাঁর মাযার অবস্থিত।

ড. জালালুদ্দীন আহমদ নূরী বলেন,

> হযরত গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বংশধর ও খলীফাদের মধ্যে যাঁদের নাম উপমহাদেশে পাওয়া যায়, তাঁদের অধিকাংশের বংশীয় ও সিলসিলার পরম্পরা (শাজরা) শাহজাদা শায়খ তাজুদ্দীন আবদুর রায্‌যাক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সাথে সম্পৃক্ত।

এ সকল মতামতে উপমহাদেশে হযরত গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহজাদা শায়খ শরফুদ্দীন ঈসা ও শায়খ সাইফুদ্দীন আবদুল ওয়াহাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আগমন উল্লেখ স্পষ্টতর; কিন্তু ওইগুলো ঐতিহাসিক তথ্যগতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন, হযরত আবদুল ওয়াহাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বয়স ও আগমনের স্থানের মধ্যে মতামত ভিন্ন ভিন্ন। তবে আরবদেশের ইতিহাস ও জীবন চরিত গ্রন্থে উপমহাদেশে উল্লেখিত দু'জনের আগমন সম্পর্কে তথ্য নেই। ইরাকে হালবাহ্‌ কবরস্থানে তাঁদের মাযার শরীফ রয়েছে; যা ড. জালালুদ্দীন আহমদ নূরীও বাগদাদে অধ্যায়ন কালে যিয়ারত করেছেন বলে প্রামাণ্য তথ্য পেশ করেন। অবশ্য হযরত গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ওফাতের পর ১২৫৮ সালে বাগদাদে মঙ্গোলীয়দের

হামলার আগে তাঁর বংশধরদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁরা মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে গমণ করেন। তাই ধারণা করা হয় যে, সেখান হতে তাঁদের বংশধরগণ উপমহাদেশে আগমন করেছেন।

শাহানশাহে সিরিকোটের পরিচিতি

ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ৩৭তম অধঃস্তন পুরুষ শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। তাঁর আসল নাম আহমদ। তাঁর নামের আগে 'সাইয়্যেদ' শব্দটি বংশীয় উপাধি এবং নামের শেষে 'শাহ' শব্দটিও জাতিগত উপাধি। সিরিকোটি শব্দটি তাঁর গ্রামের দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে। তিনি সাইয়্যেদ আহমদ শাহ সিরিকোটি' নামে সমধিক খ্যাত। তিনি বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সাইয়্যেদ সদর শাহ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির পাঁচ সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। অধিকাংশের মতে, তাঁর জন্ম ১৮৫৭ সনে। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের বৈপ্লবিক সন্ধিক্ষণে পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিরিকোট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শুভাগমন বার্তা হিদায়তের আলোকবর্তিকা ছিল, যা তাঁর বাস্তব জীবনে মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিফলিত হয় এবং আজকে তা আরো উৎকর্ষতা লাভ করে। তিনি অতি অল্প বয়সে কুরআন মজীদ হিফ্য করেন। স্থানীয় বিদ্যাপীঠে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর ইসলামী শিক্ষার সকল বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জন করেন হিন্দুস্তানের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে। ১২৯৭ হি. মুতাবিক ১৮৮০ সালে উচ্চতর ডিগ্রীর সর্বশেষ সনদ 'ফাদ্বিল' অর্জন করেন। তারপর আঠারো শতকের নব্বই দশকে কোন এক সময় বিয়ে করেন। অত:পর ব্যবসার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমণ করেন। সেখানে সূতা ব্যবসায় প্রভূত: উন্নতি লাভ করেন। পরে ১৯১২ সালে স্বদেশে চলে আসেন এবং আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির সান্নিধ্যে এসে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকায় বায়'আত গ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে পীরের নির্দেশে প্রায় ৬৩ বছর বয়সে বার্মায় গমন করেন ও ত্বরীকায়ে ক্বাদেরিয়া সম্প্রসারণের প্রয়াস পান। পরে চট্টগ্রাম-ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ত্বরীকার প্রচার-প্রসারে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক বহুমুখী অবদান রাখতে সক্ষম হন। অবশেষে ১৯৬১ সালে মাওলায়ে কায়েনাতের ডাকে লাব্বায়ক বলে সাড়া দেন।

প্রচারিত তরীক্বায়ে ক্বাদেরিয়ার উদ্দেশ্য

তরীক্বায়ে ক্বাদেরিয়া দ্বারা সিলসিলা আলিয়া ক্বাদেরিয়া-ই উদ্দেশ্য। শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি স্বীয় পীর আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হতে ১৯২৩-১৯২৪ সালে খিলাফত প্রাপ্ত হয়ে এ তরীক্বার দায়িত্ব লাভ করেন। আর আল্লামা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি স্বীয় পীর ইয়াকুব শাহ গিনছাতরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হতে মাত্র দশ বছর বয়সে চিশতীয়া, নক্সবন্দীয়া সোহরাওয়ার্দীয়া, আকবরীয়া, কিবরাভীয়া, বদভীয়া, রিফাঈয়া, শাযলীয়া, জুনাঈদীয়া, দাসুক্বীয়া, খিল্ওয়াতিয়া, মাদারিয়া, ইদ্রীসিয়াসহ এ ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার খেলাফত প্রাপ্ত হন। তাঁর প্রচারিত ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার শাজরা এই-

হযরত শায়খ সুলতান সাইয়্যেদ আবদুল ক্বাদের জিলানী। > হযরত সাইয়্যেদ আবদুর রায্যাক্ব > হযরত সাইয়্যেদ আবু সালেহ > হযরত শিহাবুদ্দীন আহমদ > হযরত সাইয়্যেদ শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আল ক্বুত্ব > হযরত সাইয়্যেদ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ > হযরত সাইয়্যেদ আলাউদ্দীন > হযরত সাইয়্যেদ বদরুদ্দীন > হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আল সানী > হযরত সাইয়্যেদ শরফুদ্দীন আল ক্বাসেম > হযরত সাইয়্যেদ আহমদ > হযরত সাইয়্যেদ আল হুসাইন > হযরত সাইয়্যেদ আবদুল বাসেত > হযরত সাইয়্যেদ আবদুল ক্বাদের আল সানী > হযরত সাইয়্যেদ আল মাহমূদ > হযরত সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ > হযরত শায়খ ইনায়াতুল্লাহ শাহ্ > হযরত শায়খ হাফেয আহমদ > হযরত শায়খ আবদুস্ সবূর > হযরত গুল মুহাম্মদ কাঙ্গাল > হযরত শায়খ মুহাম্মদ রফীক্ব > হযরত শায়খ আবদুল্লাহ > হযরত শায়খ মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ > হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইয়া'কুব শাহ > হযরত খাজা আবুল ফাদ্বলান আবদুর রহমান চৌহরভী (রা.)।

অবশ্য আল্লামা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি যখন হযরত শায়খ সুলতান সাইয়্যেদ আবদুল ক্বাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাযার শরীফ যিয়ারত করতে গেলেন; তখনও আবার সরাসরি মাযার শরীফ হতে এ ত্বরীকার খেলাফত প্রাপ্ত হন, যা ওই সময়কার গাউসে পাকের বংশধর ও দরবার শরীফের তদানীন্তন সাজ্জাদানশীল হযরত সাইয়্যেদ মোস্তফা ক্বাদেরী ইব্নে সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ক্বাদেরী ইব্নে সাইয়্যেদ আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি আদিষ্ট হয়ে তাঁকে ওযীফা পাঠ করে শুনান, যার ফলে এরূপে

খেলাফত লাভের খবর প্রকাশ হয়ে যায়। আল্লামা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর অনুসৃত এ তরীক্বার নাম রাখেন–"তরীক্বায়ে ক্বাদেরিয়া মাহবূবীয়াহ্"। শাহানশাহে সিরিকোট কর্তৃক প্রচারিত এ তরীক্বা পরবর্তীতে বাংলাদেশে প্রচারিত অন্যান্য ত্বরীকা হতে পৃথক পরিচয়ে 'সিলসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরীয়া' নামে প্রকাশ পায়।

উপমহাদেশে সম্প্রসারণ

মঙ্গোলীয়দের হামলায় আরব রাষ্ট্রসমূহে বিশেষত: বাগদাদে পর্যাপ্ত ক্ষতি হলেও উপমহাদেশে সে সব এলাকা হতে আগত বুযুর্গদের প্রচেষ্টায় ইসলামের দ্রুত প্রচার ও উন্নতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোক প্রতিফলিত হয়। ইসলামকে এমন জায়গাতে নিয়ে যায়, যেখানে তখনও পর্যন্ত ইসলামের নামও পৌঁছেনি। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণে ইসলাম ও ত্বরীকার প্রচার এবং উন্নতি বহুলাংশে বেশী হয়। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তথা বাংলা ও বার্মায় (মায়ানমারে) মধ্যযুগে যেভাবে বুযুর্গগণ এসে ইসলাম প্রচার করেছিলেন, সে-ই তুলনায় আধুনিককালে (১৭০০ খৃষ্টাব্দের পর) তাদেঁর আগমন ও ত্বরীকত প্রচার ছিল খুবই কম। মধ্যযুগে আগত বুযুর্গগণ যতদিন এ সব অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন, কেবল ততদিন সঠিক ত্বরীকা চর্চা হয়েছিল। তাঁদের ওফাত বা প্রত্যাবর্তনের পর যারা তাঁদের মাযার বা আস্তানা শরীফ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আসছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ওই সকল স্মৃতিগাহ্কে হয়ত: ব্যবসায়িক পূঁজির মাধ্যম করে রেখেছেন অথবা তারা নিজেরাই আত্মতুষ্টিতে ব্যতিব্যস্ত, স্বীয় মনমর্জিতে লিপ্ত, স্বার্থসিদ্ধিতে মশগুল। তাদের জীবন প্রণালী শুধু সুন্নাত বিরোধী নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষ ইসলামী মতবিশ্বাসের সাথেও সাংঘর্ষিক। বলা যায়- এ সকল লোক ছিল শরী'আতের জ্ঞান সম্পর্কে নিরেট মূর্খ। এ সকল লোকদের উপর ধারণা ও অনুসরন করে সাধারণ মুসলমান ইসলামের মূলধারা হতে বিচ্যুত হতে থাকে। অধিকন্তু বৃটিশ উপনিবেশক ও এ অঞ্চলের কাফির-মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের কারণে রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে মুসলমানগণ বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হযরত গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খলীফা আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ১৯২০ সালে শাহানশাহে সিরিকোট আল্লামা সাইয়্যেদ আহমদ শাহ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে বার্মায় প্রেরণ করেন।

তিনি বার্মায় আসার পর শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার সময় সদা সর্বদা অতি ভক্তি ভরে স্বীয় পীর-মুরশীদ আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির প্রশংসা করতেন। তাতে শ্রোতাদের হৃদয় প্রভাবিত হত। ফলে তাঁরাও আল্লামা চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির হাতে বায়'আত হয়ে তরীকায়ে কাদেরিয়ায় অন্তর্ভূক্ত হতে ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল। শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও স্বীয় পীর-মুরশীদের নির্দেশনা অনুযায়ী সাধারণ মুসলমানদের মাঝে তরীকায়ে ক্বাদেরীয়া প্রচার-প্রসারের সাথে সাথে অমুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে থাকেন। ফলে অতি অল্প সময়ে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুনে) তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সে-সময়ে চট্টগ্রামের রেঙ্গুন প্রবাসী অনেকে সেখানে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে ক্বাদেরীয়া ত্বরীকায় অনুসরণ ও অনুশীল করতে থাকেন। পরে তাদেঁরই আমন্ত্রণে শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বাংলা অঞ্চলে আগমণ করেন। এভাবে এ তরীকার সম্প্রসারণ সূচনা হয়।

শাহানশাহে সিরিকোট (র.)'র অনুসৃত পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার রবের পথে প্রজ্ঞার সাথে (কৌশলে) এবং উত্তম ওয়াজ করে ডাকো। (আল ক্বোরআন)

শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিও পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং এ তরীক্বার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ওয়াজ, লিখনী প্রকাশনা ও হিকমত তথা প্রজ্ঞার সাহায্য গ্রহণ করেন।

১.ওয়াজ

ইসলাম ও মুসলিম সমাজে সমাদৃত ও প্রচলিত গণজমায়েতের উত্তম স্থানগুলো তিনি ওয়াজের উপযুক্ত স্থান হিসেবে গ্রহণ করেন। আর বাস্তবায়ন করে তরীক্বায়ে ক্বাদেরিয়া সম্প্রসারণে কাজে লাগান।

১.ক. মসজিদ

বার্মা বৌদ্ধ শাসিত দেশ। যেখানে প্রকাশ্যে মাহফিল-সভা-সেমিনার করার কোন সুযোগ নেই। সেখানে সর্বপ্রথম তিনি মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মসজিদে বসে ধর্মীয় আলোচনা শুনতে সাধারণ মুসল্লীদের স্বভাবতই আকর্ষণ থাকে আর সে-ই আলোচনা যখন ওই মসজিদের ইমাম কিম্বা খতীব করেন,

তখন তা অনুসরণে তাদের কোন প্রশ্ন থাকে না। তথ্য সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন আছর নামাযের পর তিনি মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে তাক্বরীর করতেন। এ ছাড়াও জুমার দিনে, ইসলামী দিবস, যেমন- শবে বরাত, শবে কদর, ঈদ ইত্যাদিতেও তাঁর হৃদয়গ্রাহী তাকরীরের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে তরীক্বায়ে ক্বাদেরিয়াতে সাধারণ মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে।

১.খ. খানকাহ

১৯৩৫ সালের দিকে শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি চট্টগ্রামে আসেন এবং আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের অদূরে তাঁর বিশিষ্ট মুরিদ 'কৌহিনূর পত্রিকা' বর্তমানে 'দৈনিক আজাদী'র প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক্বের বাসায় অবস্থান করেন। ওই সময় উক্ত মসজিদের খতীব হযরত আবদুল হামীদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির সাথে তার সু-সর্ম্পক গড়ে ওঠে। অত:পর দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে স্বদেশ তথা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিরিকোট হতে যখনই চট্টগ্রামে আসতেন, তখন আন্দরকিল্লা মোড়স্থ কোহিনূর মঞ্জিলের দ্বিতীয় তলায় খানকাহ্ শরীফে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে আগত লোকদের মাঝে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার দীক্ষা দান করেন। এ সময় অনেকে তাঁর কাছে আসত বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায়। তিনি তাঁদের জন্য দো'আ করতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিতেন। ফলে বায়'আত গ্রহণ করে অনেকের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যেত অনেক দ্রুত, স্বচ্ছল জীবনও লাভ করত। এ পরিবর্তন দেখে দলে দলে মানুষ তাঁর অবস্থানরত খানক্বাহ্ মুখী হতে থাকে। ফলে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার সম্প্রসারণের নব সূচনা হলো।

১.গ. মাহফিল

চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্থানে মুরীদগণের বাসা-বাড়ীতে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে মাহফিল তথা গণ সমাগম করে এ তরীক্বার সম্প্রসারণ করেন। ১৯৪৯ সালে বাঁশখালী শেখরখীলের মাহফিল এবং ১৯৫২ সালে লালদিঘীর ময়দানের জনসভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সবে তিনি সভাপতির ভাষণ দান করেন। এ সময় তিনি বাতিলদের সাথে যেমন আপোষহীন কঠোর ছিলেন, তেমনি অন্যান্য হক্ব তরীক্বার ওলামা-মাশা-ইখের যথাযথ সম্মান করতেন। এ সময় হযরত আবদুল হামীদ বাগদাদী, শেরে বাঙলা আল-ক্বাদেরী প্রমুখসহ বিশিষ্ট সুন্নী উলামা-মাশা-

ইখের সাথে তাঁর বন্ধুত্বের সর্ম্পক গড়ে উঠেছিল। তৎসঙ্গে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে অবমাননাকর উক্তি করত, তাদের ও এ সকল লোকের অনুসারীদের কার্যকলাপ তেজোদীপ্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করতেন এবং স্বীয় ভক্ত-অনুরক্তদেরকে তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখানের নির্দেশ দিতেন।

উল্লেখ্য,আধ্যাত্মিক ও রূহানী উন্নতির জন্য তাঁর অনুসৃত ও প্রচারিত ক্বাদেরিয়া ত্বরীক্বার শায়খদের কেউ ওই সকল অবমাননাকারীর সাথে বিন্দুমাত্র সর্ম্পক ছিল না। ফলে নিখাদ-নিটোল হিসেবে তাঁর প্রচারিত ক্বাদেরিয়া তরীক্বা চুলসেরা বিশ্লেষক ও জ্ঞানী-গুণীজনদেও কাছে সমাদৃত হয় এবং এ ত্বরীকা সম্প্রসারণে অনুকল পরিবেশ তৈরী হয়।

১.ঘ. মাদ্রাসা

শাহানশাহে সিরিকোট আল্লামা সাইয়্যেদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির প্রচারিত তরীক্বায়ে ক্বাদেরিয়ার সকল কার্যক্রম-কর্মসূচী ইসলামী শরী'আতের ভিত্তিতে প্রবর্তিত। কোনটি শরী'আত বিরোধী নয়। তাঁর মতে, শরী'আতকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে ত্বরীক্বত চর্চা করা আর ত্বরীক্বতকে অস্বীকার করে শরী'আত চর্চা করা, দু'টোই অসার, অর্থহীন ও বাতিল। তাই যাতে তাঁর প্রচারিত ত্বরীকাতে শরী'আত বিরোধী কোন কার্যকলাপের আচ না লাগে, তৎজন্য ইসলামের সঠিক রূপরেখা ও মূলধারা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের' মতাদর্শে তথা মাসলাক-ই 'আলা হযরতের উপর ১৯৫৪ সালে আজকের এশিয়াখ্যাত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তারপর ১৯৫৬ সালে এই মাদ্রাসার শিক্ষার কার্যক্রম চালু করেন। যাতে ইসলামী শরী'আতের উপর যাঁরা জ্ঞান রাখেন, তাঁদের সংস্পর্শে ও সহযোগীতায় এ ত্বরীকা আরো দীর্ঘ পরিজনের সম্প্রসারিত হয়। এ ছাড়াও ইতিপূর্বে বার্মা থাকাকালে শাহানশাহে সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর পীরের প্রতিষ্ঠিত কাঁচা ইটের হরিপুর ইসলামিয়া রহমানিয়া মাদরাসাটি পাকা ইট দিয়ে দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেন। জমি কিনে জায়গা সম্প্রসারণ করেন এবং পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেন।

ফলশ্রুতিতে আলেম-শিক্ষক-ছাত্র সমাজে ক্বাদেরিয়া তরীক্বার সঠিক পরিচয় পৌঁছে, তাঁদের মাধ্যমে তা আরো সম্প্রসারিত হয়। এ দুটো মাদরাসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার জন্য প্রথমে ১৯২৫ সালে আনজুমানে শুরায়ে রহমানিয়া, পরে ১৯৩৫ সালে ঐ নামে আরেকটি শাখা চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। অত:পর

১৯৫৪ সালে আরেকটি সংস্থা 'আন্‌জুমান-এ আহমদিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এ দু'টি সংস্থাকে ১৯৫৬ সালে একত্র করে 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' নামে নামকরণ করেন। বর্তমানে এ নামের সাথে ট্রাস্ট সংযোজিত হয়েছে। ফলে তরীক্বায়ে ক্বাদেরিয়ার সম্প্রসারণে আরো ব্যপ্তি ঘটে।

২.লিখনী প্রকাশনা

সাধারণ মানুষের মনে নবীর প্রেম জাগরণের বিশেষ হাতিয়ার দুরূদ শরীফ চর্চার বিস্তারে স্বীয় পীরের লিখনী ৩০ পারা সম্বলিত দুরূদ গ্রন্থ 'মাজমু'আ-ই সালাওয়াতির রাসূল' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ১৯৩৩ সালে, পরে ১৯৫৩ সালে দু'বার প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণ করেন। ফলত: জন সাধারণ দুরূদ শরীফ চর্চার মাধ্যমে তরীকতে ধাবিত হয় আর ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার সম্প্রসারণে তা সহায়ক হয়। অতঃপর এ বিরাটাকার দুরুদ শরীফ গ্রহণ উর্দু ভাষায় অনুদিত হয়। এরপর ওই গ্রন্থের অনুবাদসহ বাংলায় অনুবাদ করা হচ্ছে। তাছাড়া, শাজরা শরীফ প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। প্রকাশনার এ সূচনা এখন অনেক প্রাপ্তি লাভ করেছে।

৩.ত্বরীকাকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন

আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কাল ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। পাশাপাশি মানসিক অবস্থাদির প্রতি গুরুত্ব দিতেন। আধুনিককালে জীবন সংগ্রামে জর্জরিত কর্মব্যস্ত মানুষের ধর্মকর্ম পালন সহজ-সাধ্য করে উপস্থাপনে তিনি ছিলেন বেশ মনোযোগী। তিনি ত্বরীকা-ই ক্বাদেরীয়া সম্প্রসারণে স্বীয় পীরের নির্দেশনা অনুসারে সর্ব প্রথম বায়'আত ও ত্বরীকার ওযীফাগুলোকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করেন। অর্থাৎ আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি মুরীদগণদেরকে যে ওযীফা দিতেন, তার চেয়েও আরো সংক্ষিপ্ত পরিসরে শাহানশাহে সিরিকোট স্বীয় মুরীদানদের প্রদান করতেন।

৩.ক.বায়'আত গ্রহণের জন্য সময় অনির্দিষ্ট রাখা

আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বায়'আতের জন্য সময় নির্ধারিত ছিল। যেমন- তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে ঐ জায়নামাযে কিবলামুখী হয়ে বায়'আত হবে। যেমন রেঙ্গুনে রুমালের মাধ্যমে যারা বায়'আত

হয়েছেন তাদেরকে এরূপে করেছেন। পক্ষান্তরে, শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কোন সময় নির্ধারণ করেননি। যখন যে বায়'আতের আগ্রহ প্রকাশ করত, তখন তাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ বা নির্দেশনা দিয়ে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার অর্ন্তভূক্ত হবার সুযোগ দিতেন।

৩.খ. প্রদত্ত ওযীফাসমূহ সংক্ষিপ্তকরণ

আল্লামা আবদুর রহমান চৌহরভী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির নিকট যারা বায়'আত হতেন, তাদের ওযীফা ছিল নিম্নরূপ :

১। প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের আগে-পরে দুরূদ-ই ইব্রাহিমী শরীফ একশ' বার করে মোট (২০০X৫) =১০০০ বার দৈনিক পাঠ করা ।

২। মাগরিবের নামাযের সাথে সাথে সালাত-ই আওয়াবীন ছয় রাক্'আত আদায় করা।

৩। ফজর ও এশা নামাযের সাথে সাথে ইসমে জাত শরীফ তথা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামটি নফী-এসবাত সহকারে অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'ইল্লাল্লাহ্' ও 'আল্লাহু' এ তিন যিক্‌র শ্বাস-প্রশ্বাসের সমন্বয়ে তিনশত বার করে (৩০০X৩)=৯০০X২=১৮০০ বার দৈনিক পাঠ করা ।

৪। ইচ্ছা করলে ফজর ও ইশা নামাযের সাথে আরো একশ'বার করে দুরূদ শরীফ (১০০X২)=২০০ বার পাঠ করা ।

অপর দিকে, শাহান শাহে সিরিকোট তাঁর মুরীদানদের বায়'আত হওয়ার পর যে সকল ওযীফা দিতেন তা পর্যালোচনায় দেখা যা

ক) ফজর নামাযের পর সংক্ষিপ্ত দুরূদ শরীফ - ১০০ বার এবং উক্ত তিন যিকর - ২০০ বার করে (২০০X৩)=৬০০ বার।

খ) মাগরিবের নামাযের পর সালাতে আওয়াবীন ছয় রাক্'আতের সাথে একশত বার দুরূদ শরীফ।

গ) এশা নামাযের পর কেবল ওই তিন যিকর ২০০ বার করে।

দৈনিক অযীফা

আগের অযীফা	পরের অযীফা
দুরূদ শরীফ –	দুরূদ শরীফ –
১০০০+২০০=১২০০ বার	২০০ বার
যিকর –	যিকর –
১৮০০ বার	১২০০ বার

৩.গ.বায়'আত গ্রহণ সহজ লভ্য করন

ইতিপূর্বে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যারা তরীক্বত চর্চা করতে উৎসাহী ছিলেন, তাঁরা পীরের সন্ধানে ঘরের মায়া ত্যাগ করে পীরের দরবারে এসে বায়'আত হতেন। কথায় আছে–'পানির প্রয়োজন হলে কূয়া কিংবা পুকুর কিংবা জলাশয়ের নিকট আসবে, জলাশয় মানুষের নিকট যায় না।' কথাটা আংশিক সত্য হলেও সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত মহানবীর এই বংশধরের রহমতের সাগরে জোয়ারের উচ্ছ্বাস এতটা বেশী যে, মানুষের একেবারে কাছে পৌঁছে যায়।

শাহানশাহে সিরিকোট ৬৩ বছর বয়সে ১৯২০ সালে আপন পীরের নির্দেশে বার্মায় গমন করেন। ১৯৩৫ সালে ৭৮ বছর বয়সে চট্টগ্রামে আসেন। ১৯৪৯ সালে ৯২ বছর বয়সে বাঁশখালীতে গমন করেন। এমনটি ১৯৫৮ সালে প্রায় ১০১ বছর বয়সে ঢাকা-চট্টগ্রামে প্রায় ছয়মাস অবস্থান করেন, মাঠে-ময়দানে অজয় পাড়া-গ্রামে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কষ্ট করে মানুষের ঘরে ঘরে ত্বরীকায়ে ক্বাদেরীয়ার দাওয়াত পৌঁছান। ফলে এ ত্বরীকার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। তিনি ওই সময় সাধারণ মানুষের মানসিক অবস্থার খুবই গুরুত্ব দিতেন। সে সম্বন্ধে সম্যক ধারনার জন্য নীচে দু'টি ঘটনার অবতারণা করা হল:

এক .

শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি একদা বার্মার বাঙ্গালী মসজিদে ওয়াজ-তাক্বরীর করার সময় তাঁর মুরীদ সূফী আব্দুল গফূরের কাঁধে ভর দিয়ে কাকা সর্দার নামে এক প্রভাবশালী নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মসজিদের দিকে আসল। ওই সর্দারকে আসতে দেখে হুজুর দাঁড়ালেন, করমর্দন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন-

হুজুর ; সর্দারজী কিয়া সমঝকর ইঁহা আনা হুয়া (অর্থাৎ সর্দার সাহেব, কী মনে করে এখানে আসলেন)!

সর্দার : সূফী নে বাতায়া, ইঁহা জান্নাত মিলতী হ্যায়। মুঝে ভী জান্নাত চাহিয়ে, মুঝে জান্নাত দীজিয়ে। (সূফী বলেছেন, এখানে বেহেশ্‌ত পাওয়া যায়। আমারও বেহেশত দরকার, আমাকে বেহেশ্‌ত দিয়ে দিন।)

হুজুর : ঠিক হ্যায়, তুম কো জান্নাত মিল জায়েগী (ঠিক আছে, তুমি বেহেশত পাবে।)

সর্দার : মগর মাঁই শরাব পিনা নেহীঁ ছোড়োঁঙ্গা,আওর রণ্ডীখানে মে ভী জায়েঙ্গা (মদও পান করব, বেশ্যালয়েও যাব)।

হুজুর : ঠিক হ্যায়, মগর কভী ঝুট মাত বুলেঁ। খিঞ্জির কা বাচ্চা নেহীঁ খাওগে আওর হামারে সামনে হো কর রণ্ডীখানে মে মাত জানা। (ঠিক আছে, তবে কখনও মিথ্যা বলবে না, শুকরের বাচ্চা খাবে না এবং আমার সামনে দিয়ে বেশ্যালয়ে যাবে না।)

সর্দার : ঠিক হ্যায়। (ঠিক আছে, মেনে নিলাম।)

অত:পর সর্দার তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে মদ পানে বসে গেল বটে; কিন্তু যখনই মদের বোতল পান পাত্র হাতে নিলেন, তখন সেখানে শুকরের বাচ্চা অবলোকন করলেন সুতরাং তখনই তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। নতুন বোতলে একই অবস্থা দেখে বিরক্ত হয়ে বেশ্যালয়ের পথে ছুটে যাচ্ছিলেন। যে পথ দিয়ে যান না কেন, ওই পথে হুযূরকে দেখতে পান! এভাবে সারা রাত ঘোরাঘুরি করে অবশেষে বাঙ্গালী মসজিদে এসে দেখেন; সেখানে হুযূর তাহাজ্জুদের নামাযেরত আছেন। উপায়ান্তর না দেখে ওযূ করে সর্দার ফজরের নামায আদায় করলেন হুযূরের ঠিক পেছনে। নামাযান্তে হুযূর তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করা মাত্রই হু হু করে কেঁদে উঠলেন, পুরো ঘটনার বর্ণনা দিলেন, তাওবা করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। জবাবে হুযূর কেবলা বললেন, "জব আপ কো জান্নাত মিল গিয়া তো শরাব পিনা আওর রণ্ডীখানে মে জানে সে কেয়া ওয়াসত্বাহ্ হ্যায়? (যখন বেহেশত পেয়ে গেলেন, তখন মদ পান করা ও বেশ্যালয়ে যাওয়ার কী সর্ম্পক থাকতে পারে?)।

এ ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- শাহানশাহে সিরিকোট দা'ওয়াতে খায়র তথা উত্তম দা'ওয়াতই প্রদান করলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে প্রক্রিয়াগুলো গ্রহণ করলেন, তা হল :

ক) ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ ও বাঙ্গালী মসজিদে তাক্বরীর করেছিলেন।

খ) কাকা সর্দারকে দেখে দাঁড়ালেন, করমর্দন করলেন।
গ) কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। **[সর্দারজী কেয়া সমঝকর ইহাঁ আনা হুয়া?]**
ঘ) আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন।
ঙ) সর্দারের কথার ইতিবাচক জবাব দিলেন।
চ) সর্দারের শর্তের জবাবে শর্তারোপ করলেন।
ছ) পরের দিন সাক্ষাতে সর্দারের কুশলাদি আবার জানতে চাইলেন। **[আপ কা কেয়া হাল হ্যায়?]**
জ) বেহেশতীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে অবহিত করলেন।
ঝ) পরিশেষে সান্ত্বনা ও সুসংবাদ দিলেন।
ঞ) সর্বোপরি, ইতিবাচক কথা বললেন।

আবার শাহানশাহে সিরিকোট দাওয়াত প্রক্রিয়ায় যা পরিহার করলেন, সেগুলো হল:

ক) নেতিবাচক বক্তব্য।
খ) দূর্ব্যবহার।
গ) ভয়-ভীতি প্রদর্শন
ঘ) ধমক ও ঘৃণা প্রদর্শন এবং
ঙ) অবজ্ঞা।

।। দুই ।।

শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি একদা বাঙ্গালী মসজিদে ওয়াজ -তাকরীর করার সময় হঠাৎ রাস্তার দিকে ইশারা করে বললেন, ইস্ কো দো রুপিয়া দে দো। (এ'কে দু'টি টাকা দিয়ে দাও।)। উপস্থিত লোকেরা দেখল, যাকে টাকা দিতে বলা হয়েছে; সে নেশাগ্রস্ত ও বেশ্যালয়ে যাতায়তে অভ্যস্ত। তবুও হুজুরের নির্দেশ। তাই তাকে একজন মুসল্লি তাকে দু' টাকা দিল। তখন মাসিক বেতন ছিল এক টাকা/দু'টাকা। লোকটি মুহূর্তে একত্রে দু'টাকা পেয়ে অভ্যাসবশত: বেশ্যালয়ের দিকে ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পর ওই লোকটি একটা যুবতী মেয়ে সহ হুজুরের নিকট এসে কদমে লুটিয়ে পড়ল। আর কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা চাইতে লাগল। লোকটি বর্ণনা দিল যে, যুবতী মেয়েটি তার, এক আত্মীয় ফুস্‌লিয়ে তাকে বেশ্যালয়ে এক টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে।

সেখানে তাঁর মেয়েকে দেখতে পেয়ে ঐ দু'টাকা দিয়ে কিনে এনেছে। অত:পর সে তাওবা করল।

এখানে শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লোকটিকে দু'টাকা দিয়ে প্রয়োজন পূরণ করলেন। তখনকার সময়ে মানুষ পুরো মাস কাজ করে এক টাকা/দু'টাকা পেত। লোকটিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা ভরে তাড়িয়ে দেননি। মূলত: আলোচ্য ঘটনা দু'টিতে শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লোক দু'জনের প্রতি দয়া-মায়ার সাথে নিজকে এমনভাবে তুলে ধরলেন, যাতে তাদের আস্থা সৃষ্টি হয়, উপলব্ধি আসে, তারা বুঝতে পারে মুক্তির পথ কোথায়? সে জন্যে ওই দু'জন লোক শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে ছুটে এসেছিল। এটা বাস্তব যে, দয়া-মায়ার বাধঁনে দূরের লোককে সহজে কাছে নিয়ে আসা যায়। লোক দু'টির অভ্যাস (মদপান ও অবৈধ যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়ার মত ঘৃণ্যকর্ম) যদিও একই এবং হারাম ও কবীরাহ গুণাহ'র কাজ ছিল, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও সদা সত্য কথা বলার মত গুণ তাদের মাঝে বিরাজমান ছিল। যেন শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাদেরকে গুণাহ'র কর্ম হতে বিরত রাখাটা ছিল তাঁর পণ। দেখা গেছে যে, অনেকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পেয়ে পরিবেশিত পানাহার বিনা সংকোচে তিনি গ্রহণ করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে আপনসূলভ আচার-ব্যবহার করে তাদের আস্থাভাজন হয়ে উঠেন এবং তাদেরকে ত্বরীকায়ে ক্বাদেরীয়ার দিকে ধাবিত করেন। এমনকি স্থানীয় অনেক পীর সাহেবও মুগ্ধ হয়ে স্ব স্ব ভক্তদেরকে শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির হাতে বায়'আত হওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন। আবার অনেকে তাঁর কাছে এসে সংগোপনে বায়'আত হওয়ার নজীরও আছে।

সুতরাং শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বাংলা অঞ্চলে ক্বাদেরিয়া ত্বরীকার সম্প্রসারণে উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে যে অবদান রেখেছেন, তা শ্রদ্ধার সাথে কেবল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে স্মরণ করে না; বরং ইসলাম বিদ্বেষী কিম্বা ইসলামের ছদ্মাবরণে যারা প্রতিনিয়ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবমাননা করে আসছে, তারাও নিঃসঙ্কুচে ও অকপটে স্বীকার করে যে, 'যদি তিনি এ দেশে না আসতেন, তবে অনেক সাধারণ জনগণ নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হতো কিংবা ভ্রান্ত পথের পথিক থেকে যেতো।

ইসলাম ও ক্বাদেরিয়া ত্বরীকা সম্প্রসারণ স্থায়ীভাবে রূপদানে শাহানশাহে সিরিকোট রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর কর্মসূচীকে বেগবান রাখার জন্য

এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ইন্তিকালের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরও তা ফুলে-ফলে মহীরূহে পরিলক্ষিত হতে চলছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর এ বাণী সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য "তৈয়্যব আউর তাহের কাম সাম্বালেঙ্গে, সাবের মুলকে বাঙ্গাল কা পীর হো-গা"। বাস্তবিকপক্ষে, তাঁর ইন্তেক্বালের পর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর কনিষ্ঠ শাহজাদা পঞ্চাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.) (১৯১৬-১৯৯৩ইং) বাংলাদেশের উত্তর-দক্ষিণে এ ত্বরীকার প্রসার ঘটান। অত:পর তাঁর বড় শাহজাদা গাউসে যমান আল্লামা তাহের শাহ (মু.যি.আ.) চারিদিকে বিস্তৃত করেন এবং সীমান্ত এলাকা জুড়ে এ ক্বাদেরীয়া ত্বরীকা সম্প্রসারণ করে আসছেন। এ দু'জনের প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়াসে বর্তমানে এ ত্বরীকার অনুসারী এতদ্অঞ্চলে প্রায় দু'কোটির অধিক।

---o---

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থকার		গ্রন্থ
আবুল ফাদ্বলাইন আবদুর রহমান চৌহরভী	:	মাজমূ'আ-ই সালাওয়াতির রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (পেশোয়ার : মঞ্জুর আম প্রেস-১৯৫৩ইং)
আবুল হাসান আলী নদভী	:	রিজালুল ফিকর ওয়াদ দা'ওয়াত ফীল ইসলাম (কুয়েত : দারুল কলম লিল নছর-১৯৯১ইং)
মন্ত্রনালয়	:	আল জা'ওহারুল ছামীন ফী বা'দ্বী মান ইশতাহারা যিকরুহু বায়নাল মুসলিমীন (লিবানন:দারুল মাশারীহ-২০০২ ইং)
ড. জালালুদ্দীন আহমদ নূরী	:	সায়্যিদিনা শায়খ আবদুল ক্বাদের গিলানী বাগদাদী কে ইলমী ওয়া ফিকরী আছরাত (করাচী : কুল্লীয়া মা'আরিফ - ই ইসলামিয়া - ২০০৭ ইং)
ড. গোলাম ইয়াহইয়া আনজুম	:	তারীখে মাশায়িখে ক্বাদেরীয়া (নয়াদিল্লী : জামেয়া হামর্দদ -২০০৩ ইং)
আবদুল মুজতবা রেজভী	:	তাযকীরা-এ মাশায়িখে ক্বাদেরীয়া রেজভীয়া (ইউ.পি. :আল মাজমা'উল মাসাবীহ জামেয়া আশরাফীয়া-১৯৮৯ ইং)
ড. প্রফেসর শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম	:	উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাস [আবে কাউসার](ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-২০০৪)
ড. মুহাম্মদ মাস'উদ আহমদ	:	ইফতেতাহিয়া (করাচী : এদারায়ে মাস'উদিয়া -২০০২ ইং)
আবদুল হাকীম শরফ ক্বাদেরী	:	তাযকিরায়ে আকাবের-এ আহলে সুন্নাত(লাহোর :ফরীদ বুক স্টল-২০০০ ইং)
সায়্যিদ ইউসুফ শাহ	:	হালাত ই মাশওয়ানী (লাহোর মুহাম্মদী ষ্টীম প্রেস-১৯৩১ইং)
সাইফুর রহমান	:	তাযকিরায়ে আলেমে ইসলাম(হরিপুর :দারুল উলুম রহমানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা-১৯৮৬ইং)
ড. তাহের হামীদ তানূলী	:	মাকতুবাত-এ রহমানিয়া (লাহোর : ইনষ্টিটিউড অফ রিসার্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট -২০০৬ইং)

ইসলামি সংস্কৃতি

ইসলামি সংস্কৃতির প্রকৃতি, তাৎপর্য ও এর পরিধি

অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার*

'সংস্কৃতি' বিমূর্ত বিষয়। এর কোনো বস্তুগত স্বরূপ নেই। দেখা যায় না, ছোঁয়া যায়না- এমন কিছু বিধায় একে শুধু অনুভব করা যায়। বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয় এটি। সংস্কৃতি সম্পর্কে একেকজন একেকভাবে ধারনা দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন জনের ধারনার আলোকে ও বিশ্লেষণে এর একটি সাধারণ জ্ঞান বা ধারণা আমাদের দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে। এরই মাপকাঠিতে সংস্কৃতি বিষয়টি আলোচিত হয়ে আসছে এ পর্যন্ত।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি

ইংরেজি Culture শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাঙলায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি পরিচিত। এর আভিধানিক অর্থ-শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ বা কৃষ্টি। সম্-কৃ (করা)+ ক্তি-এ ব্যুৎপত্তির মধ্যেই নিহিত থাকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত পরিশ্রুত, নির্মলীকৃত শোধিত ধরনের অনুভবসমূহ। ফলে উৎকর্ষময় বা পরিশ্রুত জীবন চেতনাই সংস্কৃতির সার কথা-এ উক্তি মূলানুগ।

[নরেন বিশ্বাস, ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশর সংস্কৃতি, সুকান্ত একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯]

ড. আহমদ শরীফ বলেন, সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের প্রতি মানুষের যে প্রবণতা, মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টা দ্বারা যে সুন্দর চেতনা, কল্যাণকর বুদ্ধি ও সুশোভিত জগৎময় দৃষ্টি অর্জন করতে চায়- তাকেই হয়তো তার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়। সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশুদ্ধ জীবন-চেতনা। জীবিকা-সম্পৃক্ত পরিবেষ্টনী প্রসূত হলেও প্রজ্ঞা ও বোধিসম্পন্ন ব্যক্তি চিত্তেই এর উদ্ভব এবং বিকাশ। ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজে এবং সমাজ থেকে বিশ্বে তা হয় ব্যাপ্ত। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর, শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।

[তাজুল ইসলাম হাশেমী, ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, সুকান্ত একাডেমী, পৃ. ৫৫]

---

* **যুগ্ম মহাসচিব**- গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী'র মতে, সমাজ সাধারণভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে, মানুষ আবার নিজেকে গড়ে তোলে শিক্ষাদীক্ষা ও সৌন্দর্য সাধনার সহায়তায়। এই নিজেকে বিশেষভাবে গড়ে তোলার নাম কালচার। তাই কালচার্ড মানুষ স্বতন্ত্র সত্তা, আলাদা মানুষ। নিজের চিন্তা, নিজের সাধনা, নিজের কল্পনার বিকাশ না ঘটলে কালচার্ড হওয়া যায়না। তিনি বলেন, সত্যকে ভালোবাসো, সৌন্দর্যকে ভালোবাসো, ভালোবাসাকে ভালোবাসো, বিনা লাভের আশায় ভালোবাসো, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসো-এরি নাম সংস্কৃতি। তাঁর মতে সংস্কৃতির অনিবার্য শর্ত হচ্ছে মূল্যবোধ।

তিনি মনে করেন, অমৃতকে কামনা, তথা প্রেমকে কামনা, সৌন্দর্যকে কামনা, উচ্চতর জীবনকে কামনা এ তো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানে জীবনের Values সম্বন্ধে ধারনা। তিনি বলেন, সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ-নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা। বন্দুকের নলেই যারা জীবনের একমাত্র সার্থকতা খুঁজে পান তারা কালচার্ড নন। তাঁর মতে, কালচার্ড লোকেরা সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন অন্যায় আর নিষ্ঠুরতাকে। [সূত্র. মোতাহার হোসেন চৌধুরী, সংস্কৃতির কথা]

কীভাবে সংস্কৃতিবান হওয়া যায় এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল ফজল তাঁর 'সাহিত্য-সংস্কৃতি জীবন' গ্রন্থে বলেন, 'কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও ধার্মিকের সৃষ্টিকে হজম করেই সংস্কৃতিকে করা যায় আয়ত্ব ও একমাত্র এভাবেই হওয়া যায় সংস্কৃতিবান। কতিপয় সৃষ্ট বিষয় যখন অনেকের উপভোগের ব্যাপার হয়, অতীত ও বর্তমানের উৎকৃষ্ট বস্তুগুলো যখন মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করে ও তার উপযুক্ত মূল্য দেয়, তখনই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। [সূত্র. আসাদ বিন হাফিজ, ইসলামী সংস্কৃতি, পৃ.২৩]

বদরুদ্দিন ওমরের মতে, 'জীবন চর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি। মানুষের জীবিকা, তার আহার-বিহার, চলাফেরা, তাঁর শোকতাপ, আনন্দ বেদনার অভিব্যক্তি, তার শিক্ষা-সাহিত্য, ভাষা, তার দিন-রাত্রির হাজারো কাজকর্ম, সব কিছুরই মধ্যেই তার সংস্কৃতির পরিচয়।

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থে বলেন, "কোনও সমাজ বা জাতির মনে কোন এক ব্যাপারে একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার বিধি মোটামুটি সার্বজনীন চরিত্র, ক্যারেক্টর, আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করিলেই সেটাকে এ ব্যাপারে ওই মানব গোষ্ঠীর কালচার বলা হইয়া থাকে।"

গোপাল হালদার 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে বলেন, সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তি ও কর্ম, তার জীবন যাত্রার আর্থিক

ও সামাজিকরূপ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়া আর নানা শিল্প সৃষ্টি, সমস্ত চারু ও কারু কলা-এই হল সংস্কৃতির স্বরূপ।'

পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি

ডিউই বলেন, CULTURE MEANS AT LEAST SOMETHING CULTIVATED, SOMETHING REPENED. IT IS OPPOSED TO THE RAW AND CRUDE. অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে বুঝায় এমন কিছু যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অমার্জিত ও অপরিণতের পরিপন্থী।

টেইলর বলেন, CULTURE IS THE COMPLEX-WHOLE WHICH INCLUDES KNOWLEDGE, BELIEF, ART, MORAL LAW, CUSTOM AND ANY OTHER CAPABILITES AND HABITS ACQUIRED BY MEN AS A MEMBER OF SOCIETY. অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস শিল্পকলা, নেতিক আইন, প্রথা, সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে জটিল সমাবেশ। [আসাদ বিন হাফিয, ইসলামী সংস্কৃতি, পৃ.২৪]

রাশিয়ান চিন্তাবিদ ট.ভি.ডি রবার্টির মতে, সংস্কৃতি হলো অনুমানগত ও ফলিত সব চিন্তাধারা ও জ্ঞানের সমষ্টি। গ্রাহাম ওয়ালেসের মতে, সংস্কৃতি হলো, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও বস্তুর সমষ্টি, এক কথায় সামাজিক ঐক্য। আর, বি. মালিনওস্কির মতে, সংস্কৃতি হলো, মানুষের ক্রমবর্ধমান সৃষ্টির সমষ্টি। রবার্ট রেডফিল্ড বলেছেন, সংস্কৃতি হলো সমগ্রভাবে 'সমঝোতাসমূহের অংশ।' র‍্যাডক্লিফ ব্রাউনের মতে, সংস্কৃতি মূলতই একটি 'নিয়ম কানুনের ধারা'।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বুলবুল ওসমান তাঁর 'সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব' বইয়ে বলেন, 'মানুষের সমগ্র সৃষ্টির বিভিন্ন নাম, যেমন- ভাষা, কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, দর্শন, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, ধর্ম-তাছাড়া সমগ্র যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারিক দ্রব্যাদি এবং এই সমস্ত দ্রব্য নির্মাণের সমস্ত বিদ্যা, ঐতিহ্য, রীতি-প্রথা, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান-এর সবই পড়ে সংস্কৃতির আওতায়। সংস্কৃতি ধারণাকে উপরোক্ত অভিমতসমূহের আলোকে বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় যে, সংস্কৃতি একটি ব্যাপক-বিস্তৃত ব্যাপার। মানুষের সামগ্রিক অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য জীবনাচারের অপর নাম সংস্কৃতি। মূল্যবোধ এর অপরিহার্য পূর্বশর্ত বিধায় বিশ্বাসই এর মূলভিত্তি। মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়ে তার বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আওতায় যা যা করে তাই সংস্কৃতি। মানুষের কাজ-আচরণ

শুধু নয় তার ব্যবহারের জিনিষ-পত্রকেও সংস্কৃতির আওতায় আনা হয়েছে। মানুষের যাবতীয় সৃষ্টি যেমন সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আইন-কানুন ইত্যাদি সবকিছু। সুতরাং সংস্কৃতি এতো ব্যাপক একটি ব্যাপার যে, একে মানুষের সামগ্রিক পরিশীলিত কর্মকান্ড হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে, সমগ্র পর্যায়ে।

অথচ আজ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারিত হলেই আমাদের মানসপটে এক সংকীর্ণ কর্মকান্ডের কথা বার বার ভেসে আসে। সংস্কৃতিকর্মী বলতে আমরা আজকাল বুঝি বিনোদন কর্মীদের। যারা নাটক-থিয়েটার করে। গান গায়-নাচে। ভাষাতত্ত্বের ভাষায়, এটা সংস্কৃতি (Culture) অভিধাটির অর্থ সংকোচনের এক সাম্প্রতিক উদাহরণ বটে। বাংলাদেশে এ শব্দটির ব্যাপকতা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে এবং সংকীর্ণ একটি পরিমন্ডলের সাথে যুক্ত থাকছে মাত্র। নাটক-গান-নাচ ইত্যাদি বিনোদনধর্মী কাজগুলো এক শ্রেণির মানুষের সামগ্রিক সংস্কৃতির একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র। এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সংস্কৃতি কর্মী নিঃসন্দেহে। তবে, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের একটি সীমিত মন্ডলের কর্মী এরা। রাজনৈতিক কর্মীরাও সাংস্কৃতিক কর্মী; বরং এদের সীমানা তুলনামূলকভাবে বড়। কারণ, রাজনৈদিক দর্শন বিনোদন সংস্কৃতির রূপরেখাতেও পরিবর্তন আনতে সক্ষম। ধর্ম ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিধায় মসজিদ, মাদরাসা খানক্বাহ্, মাজার ইত্যাদিতে নিয়োজিত কর্মীরাও সংস্কৃতি কর্মী। এভাবে মানব সমাজে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতায় নিয়োজিত হয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছে এ সমাজের অসংখ্য মানুষ এসব শাখা-প্রশাখার প্রায় সব মানুষও সংস্কৃতিকর্মী। হ্যাঁ, যেহেতু পরিশ্রুত উৎকর্ষিত জীবন চেতনাকেই সংস্কৃতির বিবেচনাতে ধরা হচ্ছে, সেহেতু এসব কর্মকান্ড অবশ্যই ওই মূল্যবোধের আওতায় হওয়া অপরিহার্য।

সুতরাং বাংলাদেশের মানুষের ধর্ম-কর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, আইন-বিচার, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরণ, নাটক, সিনেমা, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, কথার ধরণ, ব্যবহৃত জিনিষপত্র, লোক গাঁথা, ঐতিহ্য-প্রথা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র থেকে পরিবার পর্যন্ত আচরিত যাবতীয় বৈশিষ্ট্য যা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের সাথে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে মিল-অমিল রক্ষা করে বহমান আছে, তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতি। দেশগত এবং ধর্মীয় পার্থক্যের কারণেই আজ বাংলাদেশের বাঙালি সংস্কৃতির সাথে কোলকাতার বাঙালি সংস্কৃতির রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য।

ইসলামী সংস্কৃতি কী

উপরোক্ত মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বলা যায় যে, ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত মানবজাতির জীবনঘনিষ্ট যাবতীয় কর্মকান্ডই ইসলামী সংস্কৃতি। যেহেতু মূল্যবোধ সংস্কৃতির প্রাণ, তাই ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী জীবনাচারকে অপসংস্কৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মদপান, ঘুষ খাওয়া, জুয়া খেলা, ব্যভিচার, অশ্লীলতা সবই অপসংস্কৃতি, যদিও তা মুসলিম সমাজে আচরিত হোক না কেন। অপরপক্ষে, অমুসলিম সমাজে প্রচলিত থাকলেও সত্যবাদিতা, শালীনতা, মেহমানদারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, পরোপকারে ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদিকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। ঈমান না থাকার কারণে এসব ইসলাম সম্মত কাজ করার পরও তারা মুসলিম নয় বটে। তবুও তাদের আচরিত অভ্যাসকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। যেহেতু, ব্যক্তি থেকে সমাজে সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয়, সুতরাং এর বিকাশ ঠিকানা হযরত আদম-হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং পরিপূর্ণতা এসেছে শেষ নবী সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাতে, সাহাবা, তাবে'ঈন, আহলে বায়ত, সূফী, দরবেশ, আউলিয়া ও সচেতন আলেম-ওলামা এবং তাক্বওয়াবান মুসলমানদের হাতে। এর সৌন্দর্য ও পরিধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে চলছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

ব্যক্তি যখন ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেন, তখন তাঁর পরিশীলিত আচরণ-অভ্যাস ধীরে ধীরে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে গৃহীত হতে থাকে। এভাবেই সংস্কৃতির এক একটি সোপান গড়ে উঠে। নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর অনুসরণে তাঁদের উম্মতের সমাজ ও উত্তম ইসলামি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করেছে এভাবেই।

আবার, সমাজ থেকেও ব্যক্তিতে, সমাজ থেকে অপর সমাজেও সংস্কৃতি স্থানান্তরিত হতে পারে। যেমন, শিশু মুসলিম সমাজে জন্ম নেওয়ার সুবাদে সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকে ইসলামি রীতিনীতি শিখে নেয়। দীর্ঘদিন মুসলিম সমাজে বসবাসের কারণে অমুসলিমরাও অনেক সময় মুসলিম সমাজের রীতিনীতিতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠতে পারে। বিশেষত অন্য সম্প্রদায়ের ভালো রীতি-নীতিকে গ্রহণে ইসলাম আপত্তি করেনা, যদি তা ক্বোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি না হয়। আর এ কারণেই ইসলাম জাহেলী যুগের অনেক পরিশ্রুত আচার-আচরণকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যখন যে দেশ আয়ত্ব করেছে তখন সে দেশের স্থানীয় সংস্কৃতির ভালো উপাদানগুলোকেও অনুমোদন দিয়েছে এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। আর এই উদারতাই ইসলামকে দিয়েছে মহাবিজয়, ইসলামি সংস্কৃতির ভান্ডারকে করেছে মহাসাগরের মতো গভীর ও বিশাল।

ইসলামী সংস্কৃতির বিবর্তন ও রূপরেখা

ইসলামী সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়ে বর্তমানের ব্যাপক পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে মূলত: ইসলামের চার দলীলের ভিত্তিতে- কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাহ্, এজমা' ও ক্বিয়াস। ক্বোরআনুল করীম হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম মারফত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রেরিত আল্লাহর বাণী বা 'ওহী'। 'সুন্নাহ্' বলতে বুঝাচ্ছি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম, বাণী ও অনুমোদন, যেগুলো খোদ্ রসূলের পাকের জন্য খাস নয়; উম্মতের আমল করার জন্য প্রযোজ্য।

এগুলো ছাড়াও খোলাফা-ই রাশেদীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হযরত শেরে খোদা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সুন্নাতসমূহও 'সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত। ক্বোরআন- সুন্নাহ্ মূলত আল্লাহরই পক্ষ হতে এসেছে। এ দু'টি ইসলামি সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি। এ দুই ভিত্তি'র আলোকেই ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত হলো এজমা'। ক্বোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা'র অনুসরণে ক্বিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত পরিবেশ, সমস্যা ও পরিস্থিতির আলোকে গবেষণা করে ক্বিয়াস বা অনুমান ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠবে। এভাবে ইসলামী সংস্কৃতি বির্নিমাণের অবারিত ধারা চলতে থাকবে, যা কখনো শেষ হবে না। উল্লেখ্য, বর্ণিত উৎসগুলো শেষ নবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকে ধরা হয়। তাছাড়া, সংস্কৃতির ধারা, প্রথম নবী হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম পুরুষ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং প্রথম নারী হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম'র জীবনাচার'র বিবর্তন' ও আজকের সংস্কৃতির আদিতম উৎস, যা তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে এবং তাদের মধ্যে সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হয়ে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত সেই রূপরেখা অনুসরণ করেই সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ মানব সমাজের স্রোতে ভেসে কালের শেষ সীমানা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। যদিও এ সাংস্কৃতিক ধারা আদম-হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম'র মাধ্যমেই সর্বপ্রথম এ দুনিয়ায় প্রবেশ করে, পক্ষান্তরে একটি প্রশ্ন থেকে যায় 'অপসংস্কৃতি' সম্পর্কে। অপসংস্কৃতির উৎস ও বিকাশ কিভাবে হলো- এ প্রশ্নটিকে আমরা সূত্রবদ্ধ করে দেখাতে চাই। আর এর সহজ উত্তর হলো এই যে, এ অপসংস্কৃতির উৎস এর বিকাশ মানুষের আদি শত্রু ইবলীসের মাধ্যমে। আল্লাহর বিধান ও নির্দেশের প্রতি বিনা প্রশ্নে অনুগত হওয়ার ফেরেশতা সূলভ আচরণ এবং এর বিপরীতে আনুগত্য প্রত্যাখ্যানকারী অহংকারী শয়তানী আচরণ এ উভয় বৈশিষ্ট্যই

পরবর্তীতে বিকশিত হয় এ পৃথিবীতে। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণ তথা আল্লাহর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এ ফেরেশতা মনোভাবের বিকাশ ঘটতে থাকে, যাঁর নামই সংস্কৃতি বা ইসলামী সংস্কৃতি। আর পরবর্তীতে ইবলিস শয়তানের প্ররোচণায় স্রষ্টা বিস্মৃত পথভ্রষ্ট মানব সমাজের মাধ্যমে প্রসারিত বিশ্বাস ও আচার-আচরণই হলো অপসংস্কৃতি।

সুতরাং সংস্কৃতি নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে আসা এক মহান নি'মাত যা দুনিয়াকে জান্নাতের মরূদ্যানে পরিণত করতে পারে। আর পক্ষান্তরে, অপসংস্কৃতি হলো শয়তানী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ যা সৃষ্টির সেরা মানুষকে নিকৃষ্ট জীব-জানোয়ারের পর্যায়ে নামিয়ে দুনিয়াতে অশান্তি ও আখিরাতে কষ্টদায়ক ভয়াবহ্ নরক যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত করে। মানুষ নবীগণের শিক্ষায় সংস্কৃতিবান হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর শয়তানী প্ররোচনায় নিজের মনগড়া বিশ্বাস ও আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বিতারিত ইবলিসের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কারণে আল্লাহর গজব ডেকে আনে। উল্লেখ থাকে যে, সেদিন আদম আলায়হিস্ সালামকে সম্মান না করার অপরাধে বিতাড়িত ইবলিস, তার হাজার হাজার বছরের ইবাদতের বদলা হিসেবে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে এমন একটি ক্ষমতা অর্জন করেছিল, যেন সে মানুষের একটি বিশাল অংশকেও প্ররোচনা দিয়ে তার সঙ্গী হিসেবে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। তার এই শক্তির মহড়া সেদিন থেকে শুরু হয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এভাবে সৃষ্টির শুরু থেকে একদল নবীগণের আদর্শে সংস্কৃতিবান হয়ে জান্নাতের দিকে আর অপরদল শয়তানের অপসংস্কৃতিতে মগ্ন হয়ে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। আল্লাহর খলীফাগণ সত্যের দিকে আর শয়তান তার বিপরীতে নেতৃত্ব দিয়ে পৃথিবীর ধাবিত করবে। মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে, শয়তানের প্ররোচনায় নিজের ভালো-মন্দের বিধান নিজেরা তৈরী করে পৃথিবীতে অশান্তি-হানাহানি বাড়িয়ে দেয়, ঠিক তখনি আল্লাহ্ পাক তাঁর সে বান্দাদের ফিরিয়ে আনতে পাঠিয়ে দেন উক্ত অঞ্চলের মানুষের একই ভাষাভাষি কোন নবী রাসূল আলায়হিমুস্ সালামকে। এভাবে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত তিন লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার পর্যন্ত খলীফা প্রেরণের কথা আমরা জেনে আসছি। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কোনো নবী প্রেরণ করবেন না, সেহেতু তাঁর হাতেই দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা করা হয়; যাতে করে মানুষ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামের সংস্কৃতি অতিক্রম করার কোনো প্রয়োজন না হয়।

প্রাক- ইসলামী বিশ্বের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি

প্রাক-ইসলামী যুগ বলতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন'র আগের সময়কে বুঝানো হয়। এ সময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়াতও বলা হয়। এ সময়ের নবী ছিলেন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের পাঁচশত বছর পরের এ সময় (৫১০-৬১০ খ্রিস্টাব্দ) সাধারণত: আইয়্যামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারের যুগ' হিসেবে পরিচিত। (P.k. Hitti, History of the Arabs)

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পর তাঁর উম্মতগণ খোদায়ী বিধান ছেড়ে ধীরে ধীরে আবারো শয়তানের তাঁবেদার বনে যায়। তারা আল্লাহর কিতাব পবিত্র ইঞ্জীলকেও নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধানুযায়ী পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলে। এভাবে পাঁচশ' বছরের এ সময়ে ঈসায়ী ধর্মের আর কোনো অক্ষত-অবিকৃত নিদর্শনের অস্তিত্ব পাওয়া না যাওয়ায় ধর্মের নামে পৌত্তলিকতা এবং হিংসা ও হানাহানি এ ভয়াবহ রূপ লাভ করে। পরিশ্রুত মানবিক জীবন-যাপনের খোদায়ী বিধানের অবর্তমানে মানুষ নানা ধরনের অপসংস্কৃতি ও পাপাচারে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। জ্ঞান সাধনা, তথ্য অনুসন্ধান, সুস্থ বিনোদন, পরিবার ও সমাজব্যবস্থা সবকিছুই নির্বাসিত হয়েছিল দুনিয়া থেকে। সে যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপীয়দের কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থপাঠ করাকেও সহ্য করা হতোনা। শিক্ষিত লোক এবং পাঠাগার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে J.W. Draper তাঁর intellectual Development in Europe গ্রন্থে বলেন, "খ্রীষ্ট ধর্মের যুগে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। পৃথিবীকে গোলাকার বলা ছিল অপরাধ। ঠিক সেই যুগের অজ্ঞতার কারণেই হিপাশিয়ার Hypatia দেহকে তাঁহার জ্ঞান পিপাসার জন্য আলোকজান্দ্রিয়ার গীর্জায় খন্ড-বিখন্ড করা হইয়াছিল। গ্যালিলিওকে রোমের গীর্জায় আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল। কোন লোকই নিজের সম্পদ, জীবন বা দেহের নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া প্রচলিত মতবাদের উপর সন্দেহ পোষণ করিতে পারিতনা। ফলে কোথাও কোন আইন প্রণেতা, দার্শনিক ও কবির আবির্ভাব ঘটে নাই।" [কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ.-২০৭]

বাইবেলের বিকৃতরূপ তুলে ধরে গীর্জা ভিত্তিক স্বার্থান্বেষী পুরোহিতরা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সেদিন সংস্কৃতির বিকাশের সকল দরজা শক্তহাতে বন্ধ করে রেখেছিল। সেদিনকার ইউরোপের অন্ধকার যুগ সম্পর্কে রয়েছে অসংখ্য

ঐতিহাসিক দলিল। অধ্যাপক কে. আলী তাঁর 'মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস' গ্রন্থে অপর এক ঐতিহাসিকের সূত্রে বলেন, "মহান গ্রেগরি রোম হইতে সকল শিক্ষিত লোককে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে অগাষ্টাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত দর্শন শাস্ত্রের পাঠাগারে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার কুশাসনে গ্রীক ও রোমান গ্রন্থ পাঠ ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।" লেক্ বলেন, সপ্তম শতাব্দিতে ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ইউরোপে জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পূর্বে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সুপ্তাবস্থায় ছিল। পুরোহিতদের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নানা কুসংস্কার গড়িয়া তুলিয়াছিল। এইভাবে মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" [সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮]

ঐতিহাসিকদের মতে, সে যুগে তুলনামূলকভাবে আরবের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্য-জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপের চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল আরবরা। আরবদের উন্নত ভাষা সম্পর্কে পি.কে. হিট্টি HISTORY OF ARABS গ্রন্থে বলেন, "এই ভাষাই (আরবী) মধ্যযুগে বহু শতাব্দি ধরিয়া সভ্য বিশ্বের সর্বত্র শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতি চেতনার বাহন ছিল।" তিনি বলেন, "পৃথিবীতে সম্ভবত, অন্য কোনো জাতি আরবদের ন্যায় সাহিত্য চর্চায় এতবেশী স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ প্রকাশ করে নাই এবং কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা এত আবেগাচ্ছন্ন হয়নাই।" হযরত জালালুদ্দিন সুয়ূত্বী তাঁর 'আল-মুযহির' ২য় খন্ডে বলেন, "কবিতা আরবদের সার্বজনীন পরিচয়ের স্বাক্ষরিত দলিল।"

R.A. Nicholson তাঁর A Literary History of the Arbs গ্রন্থে আরবদের কবিতা প্রীতি সম্পর্কে বলেন, 'সেই যুগে কবিতা কিছু সংখ্যক সংস্কৃতিমনা লোকের বিলাসিতার বস্তু ছিল না, বরং ইহা ছিল তাহাদের সাহিত্য প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।' [সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯, ২১০]

প্রাক-ইসলামী যুগের 'উকাযের বার্ষিক মেলায় যে কবিতা উৎসব ও প্রতিযোগিতা চলতো তা আজ সকল কবিতাপ্রেমীদের জানা। সে যুগের এ বার্ষিক মেলায় সাতটি নির্বাচিত গীতি কবিতাকে সোনালী অক্ষরে লিখে কা'বা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। এ সাতটি নির্বাচিত কবিতার নাম 'সাব'ই মু'আল্লাক্বাহ্'।

আধুনিক যুগেও প্রাচীন আরবের ওই সাব'ই-মু'আল্লাক্বাহ্' সেরা কবিতাগ্রন্থ এবং সে যুগের সেরা কবি ইম্‌রুল ক্বায়স আরবদের শেকেস্‌পিয়ার হিসেবে পরিচিত।

উল্লেখ্য, যখন ইউরোপে গীর্জার বাইরে জ্ঞানার্জনের রাস্তা বন্ধ রাখা হয়েছিল, সে সময়েও আরবের শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত ক্বোরাঈশ বংশে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে আবী তালিব, হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতো শিক্ষিত পুরুষ এবং হযরত হাফসা ও উম্মে কুলসূম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার মতো শিক্ষিত নারী'র মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা ছিল। আর এ সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের পরবর্তী সময়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বিধি-বিধান তথা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে লিপিবদ্ধ করণের কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

শিক্ষা-সংস্কৃতির কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের চেয়ে আরব'রা এগিয়ে থাকলেও সামগ্রিকভাবে সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। রাজনৈতিকভাবে কোন কেন্দ্রীয় শাসন না থাকায় গোত্র ভিত্তিক শাসনের এ যুগে গোত্রে-গোত্রে শত্রুতা ছিল বংশ পরম্পরায়। এক গোত্রের বিরুদ্ধে অপর গোত্রের প্রতিশোধ স্পৃহা এবং এর পরিণামে সমগ্র আরব বিশেষত: নজদ ও হিজায ছিল রক্তারক্তি ও হানাহানির এক নিয়মিত ময়দান। বহুধা বিভক্ত এ আরব সমাজে আইনের শাসনের পরিবর্তে 'জোর যার মুল্লুক তার' বিধানই প্রচলিত ছিল সর্বত্র।

সামাজিকভাবে নানা প্রকারের কুসংস্কার সমগ্র আরবকে জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। দেব-দেবীর সন্তুষ্টি পেতে বেদীমূলে নরবলি ছিল সে সমাজের স্বাভাবিক সংস্কৃতি। নারীদের কোন সামাজিক মর্যাদা সে যুগে আরব বা অন্য কোথাও কল্পনা করা যেত না। বহু পত্নী ও বহুপতি প্রথা আরবের সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে পশুর মতো ব্যবহার করা হতো। সুদ, মদ, জুয়া, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যাসহ অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত ছিল মানুষ। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে অপমানের চোখে দেখা হতো সামাজিকভাবে। তাই জন্মদাতা পিতা স্বহস্তে জীবিত কবর দিতো নিজের শিশু কন্যাকে। বিধবা বিয়ে ও সম্পত্তিতে নারীর অংশ কল্পনা করা যেত না। অধিকন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে তারা বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাথর, বৃক্ষ ও মূর্তির পূজাতে লিপ্ত ছিল। W.Muir তাঁর Life of Muhammad গ্রন্থে বলেন,

'স্বরণাতীত কাল হইতে মক্কা ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ আধ্যাত্মিক আসারতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল-মূর্তি পূজাই ছিল তাহাদের ধর্ম'। [প্রাগুক্ত, পৃ. ৪]

কা'বা ঘরে 'হুবল'সহ ছোট বড় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে তাদের পূজা করত এবং বলত যে, "আমরা কেবল ইহাদের পূজা এই জন্যই করিতেছি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিবে'। [আল-ক্বোরআন: ৩৯ঃ৩]

এ সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআনে অপর আয়াতে বলা হয় যে, "বেদুইন আরবদের মধ্যে কুফর ও মুনাফেক্বী বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।" [আয়াত ৯ঃ৯৮]

মোটকথা, 'হাজরে আসওয়াদ' (কালো পাথর) চুম্বন এবং খানায়ে কা'বার তাওয়াফের মতো কিছু মৌলিক সংস্কৃতির অনুসরণের পাশাপাশি তাদের মধ্যে ছিল অসংখ্য অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা। সে সময়ে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুসহ কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মূর্তিপূজা ও অন্যান্য পাপাচার মুক্ত সহজ-সরল জীবন-যাপন করলেও অধিকাংশরা ছিলো শির্ক ও অন্যান্য গর্হিত কাজে অভ্যস্ত। ঠিক এমন সময়েই ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে ইসলামের সূচনা।

ইসলামের বিস্ময়কর সূচনা

'ইক্বরা' বা 'পড়' শব্দ দিয়ে ইসলামের প্রথম ঐশী বাণী পৃথিবীতে বিদ্যমান তৎকালীন সময়ের সকল অজ্ঞানতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। শিক্ষার লক্ষ্য যাতে লক্ষ্যহীন হয়ে নিছক ভোগ-বিলাসের উপায়ে পরিণত না হয় সে জন্য প্রথম আয়াতেই এর নীতি নির্ধারণ করে বলা হয়েছে, 'ইক্বরা' বিস্‌মিরাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব'- পড়! তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আলাক্ব]

এ আয়াতেই আমাদের শিক্ষানীতি যে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারে না, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম শুধু 'ইক্বরা' শব্দ বারবার বলার পরও তা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের মুখে উচ্চারণ করেননি। সম্পূর্ণ আয়াত অর্থাৎ 'পড়ুন আপনার রবের নামে' বলার পরই তিনি পড়তে শুরু করলেন। এ ঘটনা থেকেও ধারণা করা যায় যে, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি হবে স্রষ্টা নির্দেশিত কাঠামোকে অনুসরণ করে। এর পরের আয়াতেই বলা হয়েছে, 'খালাক্বাল ইনসানা মিন আলাক্ব' অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে 'আলাক্ব' তথা অপবিত্র তরল পদার্থ বা শুক্র থেকে; যা একদিকে মানুষকে তার

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে অন্যদিকে মানুষকে বানরের জাত বানানোর মতো অপমানকর ডারউইনের বিবর্তনবাদ (Theory of Evelution) কে বাতিল করে দিয়েছে। সৃষ্টির সেরা মানব যাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতা ও জিন জাতির উপর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত; তাদেরকে ইতর প্রাণী বানরের সংস্করণ হিসেবে প্রদর্শন করা আর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিভ্রান্তিতে ফেলা একই কথা। পৃথিবীতে অসংখ্য সৃষ্ট জীব-জানোয়ার রয়েছে, রয়েছে কীট-পতঙ্গ। এদেরও নিজস্ব জীবনধারা, আচার-আচরণ ইত্যাদি রয়েছে। তাদের এ জীবনাচারকে সংস্কৃতি বলা হয়না। সংস্কৃতি বলা হয় শুধু মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবন যাপন প্রণালীর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকান্ডকে। 'বানরের জাত' প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে অধঃপতিত করে বানর-শিয়াল-শুকরের আচরণে উৎসাহিত করবে। কারণ সংস্কৃতির নামে শিকড় সন্ধানের যে শ্লোগান বর্তমানে ওঠেছে সে সূত্র ধরে পিছনে যেতে যেতে বানরের বাঁদররামিটাই শুধু পাওয়া যাবে। ঐতিহ্য প্রিয় এ বানরের জাত কীভাবে একটি সুশৃঙ্খল সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবে? কখনো সম্ভব নয়। তাইতো এ দুনিয়ায় 'আশরাফুল মাখলূক্বাত' মানুষগণ সৃষ্টি করে চলেছেন 'সংস্কৃতি'; আর বানরের জাতরা জন্ম দিচ্ছে সংস্কৃতি ও বিনোদনের নামে অপসংস্কৃতি বিকাশের অসংখ্য সন্তান। এ সন্তানদের হাতেই আজ বাংলাদেশটা পরিণত হচ্ছে সন্ত্রাস-ধর্ষণ-অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার এক আঁধার জগৎ এবং বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও লক্ষ্যহীন হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের এক অভয়ারণ্য।

আশরাফুল মাখলূক্বাতের এ চরম অবনতি ঠেকাতেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ আল-ক্বোরআন মানব জাতিকে শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে সত্য, ঐতিহ্য ও উন্নয়নের পথ বের করার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। সূরা আলাক্বের অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে সে পড়ালেখার কথা এবং মানবজাতির মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কথা। বলা হয়েছে, "পড়ুন ওই প্রভুর নামে, যিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন, কলমের ব্যবহার শিখিয়েছেন এবং যা সে জানতোনা সবকিছু শিখিয়েছেন ইত্যাদি। যা ইসলামী সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতিকে একটি সুন্দর রূপরেখার মাধ্যমে পরিচালনার পথ নির্দেশ করেছে। আল-ক্বোরআন সর্বশেষ ঐশী কিতাব। এরপর আর কোনো মৌলিক ধর্মগ্রন্থ আসবেনা বিধায় একে পরিপূর্ণতা দেওয়া হয়েছে। এতে সংযোজিত হয়েছে হযরত আদম থেকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত সময়ের উত্তম সংস্কৃতি এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানব সংস্কৃতির জন্য সম্ভাব্য কত

উপাদান দরকার তার বর্ণনা। পূর্ববর্তী নবীগণ আলায়হিস্ সালাম ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং শেষ গ্রন্থ আল ক্বোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও সমাপনী বিষয়ে নিজ নিজ উম্মতকে অবহিত করেছেন। আর ক্বোরআনেও বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী নবীগণের জীবন ও কর্ম। মোটকথা, এটা আল্লাহর অপরাপর কিতাবগুলোর বিবর্তিত সর্বশেষ রূপ' যা সকল কালের মানুষের পথ নির্দেশনার জন্য নির্ধারিত। ক্বোরআন আরবী 'ক্বারউন' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে একত্রে সন্নিবেশিত করা। এর অন্য অর্থ হলো পাঠ করা বা আবৃত্তি করা। এতে সকল ধর্মের অবিকৃত উত্তম সংস্কৃতির সংযোজন হয়েছে এবং এ গ্রন্থ পাঠ করলে মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও সংস্কৃতি আয়ত্ব করা সম্ভব হবে, তাই এর নামকরণ হলো আল-ক্বোরআন। ক্বোরআনের ভাষায় এর অন্যান্য নামও পাওয়া যায়। যেমন, আল-কিতাব অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ, আল ফোরক্বান অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী। এতে আল-হিকমত (বিজ্ঞান), আল-হুকুম (বিচার), আর-রহমত (কল্যাণ), আন্ নি'মাত (আর্শীবাদ), আন নূর (আলো), আল-হক্ব (সত্য) ইত্যাদি বলা হয়েছে, যা আল ক্বোরআনের পূর্ণতা নির্দেশক। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর বাণী ছিল, 'এখনও আমার অনেক কথাই বলিবার রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যাহা হইক, যখন তিনি সত্যের চেতনা শক্তি আসিতেছেন, তখন তিনিই তোমাদিগকে সকল সত্যের পথে পরিচালিত করিবেন' যা শেষ নবীর আগমন, পূর্ণতা ও সত্যের বিবর্বিত রূপ'র একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

ইসলামে পূর্ববর্তী সময়ের সংস্কৃতিকে যে লালন করা হয়েছে তার উজ্জ্বল প্রমাণ ক্বোরআনে রয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা বল! আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যাহা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক্ব ও হযরত ইয়াক্বুব আলায়হিমুস্ সালাম এবং তদীয় বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাঁহাদের প্রতিপালক হইতে যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল, তদসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি; তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আমরা প্রভেদ করিনা এবং তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।"

[আল ক্বোরআন: ২: ১৩৬]

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম আল্লাহর বিধানসমূহের সর্বশেষ সংস্কারণ। এতে হযরত আদম-হযরত আলায়হিমাস্ সালাম থেকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত সময়ের বিবর্তনের সৃষ্ট সকল উত্তম সৃষ্টি সভ্যতাকে ধারণ করা হয়েছে। আর এ সময়ে শয়তানী মেধার কুফলে সৃষ্ট সকল অপসংস্কৃতিকেই শুধু বাদ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে সকল ধর্মের সত্যকে লালন করে, ভ্রান্তি সংশোধন করে, সত্য-মিথ্যার প্রভেদকে সুস্পষ্ট করে পৃথিবীর সর্বশেস সময় পর্যন্ত কালের চাহিদা মেটানোর উপযোগী কল্যাণকর যে গ্রন্থ লালন করেছে তাই আল ক্বোরআন। আল ক্বোরআন'র এই চিরন্তন শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি অমুসলিম দার্শনিকরাও দিয়ে আসছেন। টলস্টয় বলেন, 'ক্বোরআন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের নিখুঁত দিক দর্শন। দুনিয়ার সামনে যদি এই একটি মাত্র গ্রন্থ থাকতো এবং কোন সংস্কারকই না আসতেন, তবু মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এটাই ছিল যথেষ্ট।'

[সূত্র. দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম ১৫/০১/২০০১ খ্রিষ্টাব্দ]

William Muir তাঁর Life of Muhammad গ্রন্থে'র ভূমিকায় বলেন, ক্বোরআনের ন্যায় পৃথিবীতে সম্ভবত, আর এমন একটি গ্রন্থও নাই, দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দী ধরে যার ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়ে আছে'। পৃথিবীতে ক্বোরআনের সমকক্ষ কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই, যাকে বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব। যাঁর অবিকৃতি সম্পর্কেও বিজ্ঞানের সূত্র প্রয়োগ সম্ভব। সম্প্রতি আবিস্কৃত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর ১৯ হরফ সংখ্যা দিয়ে কম্পিউটার পদ্ধতিতে ক্বোরআন-বিশ্লেষণের সূত্র অনুসন্ধানী অমুসলিম গবেষকদেরও আলোর পথ দেখাতে পারে।

মানব সমস্যার স্থায়ী সমাধান ছাড়া ও এর সাহিত্য মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। এফ. আরবুথনট বলেন, "সাহিত্য শৈলীর বিচারে ক্বোরআন হইতেছে আধা-পদ্য ও আধা-গদ্যের সংমিশ্রণে বিশুদ্ধতম আরবীর নমুনা।" 'দ্য- লা ভিনিসেটের উক্তি অনুযায়ী ক্বোরআন হইতেছে মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের সনদ ও গঠনতন্ত্র যাহা বর্তমান দুনিয়ার কল্যাণের প্রতিশ্রুতি এবং আখেরাতের মুক্তির আশ্বাস দিয়াছে। ক্বোরআনের সাহিত্যিক মূল্যমান সম্পর্কে ড. মরিস নামে আর একজন ফরাসী পন্ডিত বলেন, 'ক্বোরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দ কোষ, বৈয়াকরণের জন্য ব্যাপকরণ গ্রন্থ, কবিদের

জন্য একটি কাব্যগ্রন্থ এবং আইন বিধানের এক বিশ্বকোষ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ ইহার একটি মাত্র সূরা'র সমকক্ষ বলিয়া ও বিবেচিত হয় নাই।'

[কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃ. ২৭-২৮]

সুতরাং ক্বোরআনের সাহিত্য মূল্য বিবেচনা করলেও এর সাংস্কৃতিক মর্যাদা অনুধাবন করা যায়।

সংস্কৃতি মানুষের বিশ্বাস ও কর্মকান্ডের সামগ্রিক একটি দিক। সুতরাং ইসলামের যাবতীয় বিশ্বাস ও বিধি-বিধানগুলোই ইসলামী সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। পবিত্র ক্বোরআন হলো ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক তাত্ত্বিক গ্রন্থ এবং সুন্নাহ্ হচ্ছে এর বিশদ ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারিক (Practical) ক্বোরআনের বক্তব্যগুলো ১১৪টি সূরায় বিন্যস্থ করা হয়েছে। এর ৯২টি মক্কী এবং ২২টি মাদানী সূরা। হিজরতের পূর্বে মক্কা জীবনে নাযিলকৃত সূরাগুলোতে আল্লাহর একত্ববাদ, 'আল্লাহর গুণাবলী, মানুষের নৈতিক কর্তব্য, পরকালের শান্তিমূলক ইত্যাদি বিষয় এবং মাদানী সূরাতে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রবিধান, বিধি-নিষেধ, আইন-অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। মক্কী জীবনে এ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সত্ত্বা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রকৃত বিশ্বাস ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও আহ্বান করেছেন, আর মাদানী জীবনে তা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর মদীনা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সংস্কৃতি পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মক্কী জীবনে ধীরে ধীরে যে ক্ষুদ্র ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠেছিল তা হিজরতের পর মদীনায় এসে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ নেয়। এখানে ইসলাম এক উদার বিশাল স্রোত ধারণ করে। পৌত্তলিক, ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নি উপাসকরাও এ রাষ্ট্রের মদীনা সনদে স্বাক্ষর করে ইসলামের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সমর্থন দিয়েছিলো। এ মদীনা সনদ'ই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। মদীনা রাষ্ট্রই পৃথিবীর প্রথম রাষ্ট্র যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত গোত্রগুলো সাথে নিয়ে একটি শাসনের অধীনে আনা হয়। এ রাষ্ট্রে যার যার ধর্ম-সংস্কৃতি ও গোত্র-সংস্কৃতিকে সম্মান করা হয়েছে। ভিন্নমতাবলম্বীদের জান-মাল ইজ্জত ও ধর্ম-সংস্কৃতির সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের কারণেই ইসলাম একটি উদার আদর্শ হিসেবে পৃথিবীতে সুনাম কুঁড়াতে পেরেছে।

ইসলামি সমাজ ও ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক নীতির পার্থক্য দেখিয়ে কবি গোলাম মুস্তফা তাঁর 'বিশ্বনবী'তে খুব সুন্দরই বলেছেন যে, 'ইসলামি সমাজে

দূর্গাপূজা চলা অসম্ভব আর ইসলামি রাষ্ট্রে দূর্গা পূজা বন্ধ করা অসম্ভব'। আসলেও তাই ইসলামি সমাজ মুসলমানদের একান্ত নিজস্ব পরিমন্ডল। আর ইসলামি রাষ্ট্র কাফের, বেদ্বীন মুসলমান, নাস্তিক সবার জন্য। এতে সবার সাংকৃতিক অধিকার সমান।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এক দশকের রাষ্ট্রীয় জীবনে মানব সভ্যতার সর্বশেষ প্রয়োজনের দিকটিও বিবেচনা করে আল্লাহর বিধান আল ক্বোরআন এসেছে এবং রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তিনি নিজের এ ক্বোরআনের ব্যাখ্যা ও নিজের সাংস্কৃতিক জীবনের যে আদর্শ রেখে গেছেন তাই সুন্নাহ্ হিসেবে পরিচিত। ক্বোরআন সুন্নাহ'র আলোকে পরবর্তী সময়ে ইসলামকে গবেষণার অবারিত সুযোগের মাধ্যমে একে কালজয়ী করা হয়েছে। বিদায় হজ্জের সময়ে তাই এই দ্বীন-ইসলামের পূর্ণতার গ্যারান্টি সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (পরিপূর্ণ জীবন বিধান) হিসেবে মনোনীত করিলাম'। [আল ক্বোরআন- ৬:৩]

সংস্কৃতি হল মানব সমাজের সামগ্রিক আচার-আচরণ। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত সেই পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি বা দ্বীন যা পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক আরো সুবিন্যস্থ হয়ে এবং বিভিন্ন মাযহাবের মাধ্যমে বৈচিত্র্য অর্জন করে এং বিভিন্ন সূফী ত্বরিকা এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিত্য নতুন সৌন্দর্য লাভ করে প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছে।

ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা

ক্বোরআন, সুন্নাহ, এজমা' ও ক্বিয়াস'ই ইসলামি সংস্কৃতির উৎস। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ হলো- ঈমান, নামাজ, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। এগুলোকে আমরা ইসলামের মৌলিক এবং বাধ্যতামূলক সাংস্কৃতিক উপাদান বলতে পারি। সঠিক বিশ্বাস বা আক্বিদার উপরই ঈমানের বাস্তবতা নির্ভর করে। ঈমান হলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাসমূহ, কিতাবসমূহ (পূর্ববর্তী এবং বর্তমান), নবীগণ (পূর্ববর্তীসহ) পরকাল সম্পর্কে, তাক্বদীর তথা অদৃষ্টের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে সঠিক আক্বিদা (যথাযথ বিশ্বাস) প্রতিষ্ঠা। উপরোক্ত সপ্ত বিষয়ের যে কোনটিতে ব্যতিক্রম আক্বীদা পোষণকারী'র ঈমানের অস্তিত্ব প্রশ্নে সংশয় সৃষ্টি হয়। নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত শুধুমাত্র ঈমানদারের জন্যই নির্ধারিত। নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি পূর্ববতী নবীগণ

আলায়হিমুস্ সালাম-এর সময়েও পালিত হতো, তবে বর্তমানের মতো এতো সমৃদ্ধ ও সুসংহত ছিল না। নামায মুসলমানদের প্রধান সংস্কৃতি। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের একজন নামাজিকে দেখে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বুঝে নিতে পারে যে উনি মুসলিম। দৈনিক পাঁচওয়াক্ত শুক্রবারে জুমা এবং ঈদ-জানাযা ইত্যাদি নামাযের মাধ্যমে বিশষত জামাতসহ আদায়ের রীতি মুসলমানদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে সুসংহত করেছে। মুসলমানদের এ সংস্কৃতি পালনের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তি হলেও তা শারীরিক সুস্থতার জন্য হালকা যোগ ব্যায়ামের কাজও করে। এখানেই ইসলামী সংস্কৃতির সার্থকতা। রোযা পালনের মাধ্যমেও শারীরিক সুস্থতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান খালিপেটে থাকার একটি নিয়মিত ব্যবস্থাকে শারীরিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য মনে করছে। তাছাড়া 'কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়, জীবনে যাদের হররোজ রোজা-ক্ষুধায় আসেনা নীদ' এমন অভাবী-অনাহারী প্রতিবেশির ব্যথা অনুধাবনের একটা ব্যবস্থাও এই রোযা। আবার ইফতার পার্টি তো আজকাল সার্বজনীন উৎসবে পরিনত হচ্ছে। সুতরাং রোযা সাংস্কৃতি আমাদের সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। হজ্ব' বিশ্ব ইসলামী সংস্কৃতির একটি রূপ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এ উপলক্ষে মক্কায়ে মুয়ায্যামা ও মদীনা মুনাওয়ারায় সমবেত হয়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে কতিপয় নির্ধারিত কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই একই আওয়াজে গেয়ে যাচ্ছে 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শরিকা লাকা লাব্বাইক... খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করছে, চুমু খাচ্ছে হাযরে আসওয়াদে। সাফা-মারওয়া সা'ঈ (দৌড়াদৌড়ি) করছে। ৯ যিলহজ্ব আরাফাতের ময়দানে বক্তব্য শুনে নামায পড়ছে দুই ওয়াক্তকে একত্র করে। রাত যাপন করছে মুয্দালিফা নামক পাহাড়ে এবং মাগরিব-এশা একত্রে আদায় করছে। আবার লক্ষ লক্ষ হাজী ফিরে আসছে মিনার তাঁবুতে। সেখানে শয়তানের কল্পিত প্রতিকৃতিতে তিনদিন পর্যন্ত পাথর ছুঁড়ে মারছে। কোরবানী দিচ্ছে। মাথা মুন্ডাচ্ছে। কি এক অপরূপ দৃশ্য। এ সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বের নানা রঙের নানা জাতের নানা মাযহাবের মুসলমানদেরকে এক কাতারে শামিল করে বিশ্বের সকল ঈমানদার ভাই-ভাই এ মূল্যবোধের সাক্ষ্য দিচ্ছে। যাকাত ইসলামি অর্থনীতি উন্নয়নের এক গতিশীল ব্যবস্থা। ধনীদের পুঞ্জীভূত অতিরিক্ত ধন-সম্পদ, টাকা পয়সা প্রতি বছরে একবার অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়ার এ সংস্কৃতি পৃথিবীর অন্য কোন বিধানে

বিরল। ধনী-গরীবের ব্যবধান কমিয়ে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার এ অঙ্গীকার শুধু ইসলামী সংস্কৃতিতেই রয়েছে। এখানে সংস্কৃতি পালনের উদ্দেশ্য একই সাথে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। এখানেই অন্যান্যদের সাথে ইসলামের পার্থক্য।

উপরোক্ত ফরয সংস্কৃতির বাইরে রয়েছে অসংখ্য ওয়াজিব সুন্নাত, নফল মুবাহ ধরনের সংস্কৃতি। যা একজন সাধারণ ঈমানদারকে পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে কবরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে ভয় করা উচিত এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা। [সূরা আল-ই ইমরান]

পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে কবরে যাওয়ার জন্য মুসলমানরা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুবাহ্ সব ধরনের কর্মপালন করে আসছে। একজন মুসলিম কী করবে আর কী করবেনা তা নির্ধারণের জন্য হালাল এবং হারাম এ দু'ধরনের কর্মকান্ড নির্ধারিত আছে। যা করা ক্বোরআন-সুন্নাহ্ অনুসারে নিষিদ্ধ তাই হারাম। যা হারমা নয় তাই হালাল। এগুলোই প্রকৃত অর্থে গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি হিসেবে পালিত হবে। এ ছাড়া মুবাহ্ এবং মাকরূহও রয়েছে, যা করাতে গুনাহ্ নেই বরং নিয়ত গুণে সাওয়াব আছে তা মুবাহ, যা না করা উত্তম তবে গুনাহ্ নয় তা মাকরূহ। অবশ্য মাকরূহ ধরনের কাজগুলো তাহরীমী ও তানযীহী এ দু'ভাগে বিভক্ত। তাহরীমিকে চরম অপছন্দনীয় (গুনাহ্) এবং তানযীহীকে অপছন্দনীয় গণ্য করা হয়। সুতরাং ইসলামি সংস্কৃতির পরিধি বৃদ্ধিতে কোন কাজটি অপছন্দনীয় ও অপছন্দনীয়, কোনটি ইবাদত আবার কোনটি নিষিদ্ধ, কোনটা না করা উত্তম বিবেচনা করতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা অনুধাবনে আরো কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে। একজন মুসলমানের যাবতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি তাওহীদ রেসালত ও আখিরাত'র প্রতি দৃঢ় আস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ ধারণ করেই আখেরাতে মুক্তি সম্ভব। এ মূল্যবোধ ধারণ করেই ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো নির্মিত হয়ে আসছে।

হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা আরো প্রসারিত হয়েছে। এরপর থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমসাময়িক পরিস্থিতি ও সমস্যার আলোকে সমাধান দিতে এবং ইসলামের এ ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করতে জন্ম হয় হানাফী, শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী- এ চারটি

মাযহাব। ঈমান আক্বীদার ক্ষেত্রে এ চার মাযহাবের কোন পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাত-নফল সংস্কৃতিগুলো পালনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সামান্য পার্থক্য এদের মধ্যে রয়েছে। এ পার্থক্য মূল কাঠামোতে নয় বরং অতি কাঠামো বা উপরি কাঠামোতে (Super structure) হওয়ায় মুসলমানদের নির্ধারিত মৌলিক সংস্কৃতিতেও বৈচিত্র এসেছে। যে যার পছন্দ অনুসারে একই সুন্নি আক্বিদায় বিশ্বাস স্থাপনের পর ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব অনুসরণ করতে পারে।

নিজ নিজ মাযহাব অনুসারে নিম্নস্বরে অথবা উচ্চস্বরে বলছে মাযহাবের পার্থক্য ইসলামের জন্য কল্যাণকর। এরা পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্তও নয়। কিন্তু আক্বিদাগত বিভ্রান্তির কারণে যে সব উপদল ইসলামের নামে সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো ইসলামের মূলধারার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে। শান্তি ভঙ্গ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক রাস্তা মাত্র একটিই এবং একটি দলই জান্নাতে যাবে, বাকিরা বিভ্রান্ত হিসেবে দোযখী হবে। এ সংক্রান্ত একটি বহুল প্রচারিত হাদিস হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। বাহাত্তর দলই জাহান্নামে যাবে, একদল যাবে জান্নাতে। সাহাবা-এ কেরাম আরয করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম কোন্ দলটি জান্নাতে যাবে? এরশাদ হলো, 'মা'- আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী, 'আমি এবং আমার সাহাবীদের দল।' [তিরমিযী]

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর মিরক্বাত শরহে মিশকাত এ নাজাত প্রাপ্ত দলটিকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' বা সুন্নি মুসলমানদের দল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হযরত বড়পীর গাউসুল আ'যম আব্দুল ক্বাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর 'গুনিয়াতুত্ তালেবীন'-এ উক্ত নাজাতপ্রাপ্ত দলকে 'সুন্নী জামা'আত' বলে উল্লেখ করেন এবং বাকি ৭২টি বাতিল ইসলামের তালিকাও তিনি প্রণয়ন করেন। এ বাতিল দলে রাফেজী, খারেজী, শিয়া, মু'তাযিলা, ক্বদরিয়া, জবরিয়া এভাবে ৭২টি দলের নামে রয়েছে। শিয়ারা অধিকাংশ সাহাবীকেই গালাগালি করার ধৃষ্টতা দেখায়। সুতরাং তারা সাহাবীদের অনুসারী হবার প্রশ্নই উঠেনা। পরবর্তীতে এ দলগুলো আরো বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে ইসলামের সাংস্কৃতিক ঐক্য নষ্ট করেছে। এ সমস্ত বাতিল সম্প্রদায়ের সাথে ইসলামের মূলধারা সুন্নিয়তের অনুসারীদের রয়েছে সাংস্কৃতিক সংঘাত। বর্তমানে আছে শিয়া সম্প্রদায়, খারেজীদের নব্য সংস্করণ

ওহাবী সম্প্রদায়, কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং মু'তাযিলাদের নব্য সংস্করণ মওদুদী সম্প্রদায়। ইসলামি আইনে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক আইনসহ অনেক ক্ষেত্রে এ পার্থক্য সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, শিয়া'রা সাময়িক বিয়ে অর্থাৎ নেকাহ-ই মাত্'আহ্ (Contact Marriage) কে নিজেদের সংস্কৃতির অংশ করে নিয়েছে, অথচ এটা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই। কারণ, এটা নারী জাতিকে ভোগের পণ্যে পরিণত করে। শিয়ারা একদিকে ইসলামের দাবীদার অন্যদিকে খ্রিস্টান ইহুদীদের সাময়িক বিয়েকে লালন করে যাচ্ছে। সুন্নিরা ১০ মহররম পবিত্র আশুরা উপলক্ষে ফাতেহা-মাহফিল করে, তবাররুকের আয়োজন করে, শোহাদায়ে কারবালা'র তাৎপর্য শীর্ষক ওয়াজ-নসীহতের ব্যবস্থা করে, ওরস শরীফ উদ্‌যাপন করো আহলে বায়তের মর্যাদা তুলে ধরে। আর শিয়ারা কারবালার অনুসরণের নামে বুকে ছুরি চালানোর মতো অতি গর্হিত মাতম সংস্কৃতি পালন করে, যা সুন্নিরা নিন্দনীয় মনে করে। আশুরার মেলার নামে এরা কল্পিত এজিদ ও ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মূর্তি তৈরি করে। শিয়ারা ইফতার করে এশা' নামাযের সময়ে- অথচ সুন্নিরা করে সূর্যাস্তের পরপর। এরা ক্বোরআনের অনেক সূরাকে অস্বীকার করে আর অধিকাংশ হাদিসকেই বানোয়াট মনে করে। এ বিস্তর সাংস্কৃতিক পার্থক্য শিয়াদেরকে আলাদা একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করেছে এবং বিশ্বব্যাপী সুন্নিদের সাথে তাদের সংঘাতকে অনিবার্য করে রেখেছে। সমাজ পৃথক হলে সংস্কৃতিও পৃথক হতে পারে। শিয়াদের সমাজও পৃথক হয়ে আছে।

শুধু শিয়ারা কেন, ক্বাদিয়ানীরাও আলাদা সমাজে বসবাস করে। তাদের মসজিদেও প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। তারা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীকেও নবী মানে বিধায় সুন্নিদের সাথে সংঘাত চলছে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী-এরপর অন্য কোনো নবী আসতে পারে না, এরপর ওলী, পীর, মুর্শিদ, মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) এবং ইমামগণই নবীগণের উত্তরসূরী হয়ে দায়িত্ব পালন করবেন অথচ এরা এ মৌলিক বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করায় আলাদা ধর্ম-সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এদের সমাজ ও বিশ্বাসের পার্থক্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। ওহাবী সম্প্রদায় খারেজীদের উত্তরসূরী কট্টর-উগ্রপন্থী একটি নব্য উপদল। সউদী আরব (নজদ)'র ক্ষমতা দখল করে প্রায় ৭০ বছর যাবত এরা সুন্নি পরিচয়ে সুন্নিদের

সাথে আক্বিদাগত সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী ও মুহাম্মদ ইবনে সউদকে হাতে নিয়ে, আর্থিক ও সশস্ত্র সহযোগিতা দিয়ে আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগানের আড়ালে তুর্কী ভিত্তিক সুন্নি খেলাফতের অবসান ঘটানোর কৌশল হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘ এক শতাব্দির প্রচেষ্টায় নজদ ভিত্তিক 'ওহাবী আন্দোলনকারী'দের ক্ষমতায় বসায়। ওহাবীদের নজদ ভিত্তিক উত্থান নবীজি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ভবিষ্যৎবাণী 'নজদ থেকে শয়তানের শিং বের হবে' (আল হাদিস) -এর যথার্থ বাস্তবায়ন। তাদের উত্থান মুসলমানদের বর্তমান ভয়াবহ পরিণতির প্রধান কারণ। তাদের কারণে তুর্কি খেলাফত ধ্বংস হলো এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আজ পঞ্চাশ বছর ধরে ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর কোন নির্যাতিত দেশের পক্ষে এ সউদী আরব দাঁড়াতে পারেনি। কারণ, মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়াতে গেলে ব্রিটিশ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যেতে হবে। যারা ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে গেলে ফাঁস হয়ে যাবে অনেক তথ্য, অধিকন্তু হারাতে হবে ক্ষমতা। তাই, তারা বরাবরই খ্রিস্টান ইহুদীদের স্বার্থ রক্ষা করে 'শয়তানের শিং' হবার সত্যতা প্রমাণ করেছে। যে জজিরাতুল আরব থেকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের বাইরে রাখার নির্দেশ রয়েছে, সেখানেই আজ ইহুদী-খ্রিস্টান তথা আমেরিকান পুরুষ-মহিলা সৈনিকদের মেহমানদারী করা হচ্ছে। এরা ক্ষমতায় এসেই সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছিল ভয়াবহভাবে। মুছে দিতে চেয়েছে ইতিহাস-ঐতিহ্যকে।

পৃথিবীর দেশে দেশে যখন সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষে পুরোনো স্থাপনা, স্থাপত্য, নাম ফলক তথা বিভিন্ন নিদর্শন আবিস্কার, সংরক্ষণ করছে। পুরোনো নিদর্শন সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান জাদুঘর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সেখানে ওহাবীরা ক্ষমতায় এসেই প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-ই কেরাম ও আহলে বায়তের স্মৃতি বিজড়িত তেরশ' বছর আগের নজদ-হেযাযকে ইবনে সউদ এর নামানুসারে পরিবর্তন করে 'সউদী আরব' নামকরণ করলো। 'নজদ থেকে শয়তানের শিং বের হবে' এ ভবিষ্যৎ বাণী যাতে আর জীবিত না থাকে এ জন্য 'নজদ' স্থানটিকে 'রিয়াদ' বানানো হলো। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রওযা মুবারকটি ধ্বংস করতে না পারলেও ওখানকার তেরশ' বছরের স্মৃতিবাহী সকল মাযার-খানক্বাহ্ এমনকি মসজিদ পর্যন্ত মাটির সাথে মিশিয়ে নজীরবিহীন

সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস চালানো হলো। ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ওরস-ফাতেহাসহ সূফী দর্শন ভিত্তিক সংস্কৃতি কঠোর হস্তে দমন করা হলো এবং এসব সংস্কৃতির সমর্থকদেরও উচ্ছেদ করা হলো-মাতৃভূমি থেকে। আগের আরব আর সউদী আরব সাংস্কৃতিকভাবে বহুযোজন দূরে অবস্থান করছে মক্কা শরীফ দারুল ইলম কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। মদীনা শরীফের নতুন ও পুরাতন নিদর্শনাবলীর ইতিহাস সংক্রান্ত ৩৩৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট একটি বইয়ে ৭০-৮০ বছর আগের বিভিন্ন মসজিদ, মাযার-গুম্বুজ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছবিসহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরের ছবিসহ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে ওহাবী শাসকদের সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের ইতিহাস।

আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ ইয়াসিন আল খাইয়্যারী আল মাদানী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কর্তৃক লিখিত 'তারীখু মা'আলিমিল মদীনাতিল মুনাওয়ারাহ্' নামক এ প্রামাণ্য গ্রন্থটির ১৯৯১ সালে মক্কা শরীফ থেকে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ চট্টগ্রামের মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফি'র ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে আমি (লেখক) নিজেও দেখেছি। এছাড়াও দৈনিক আজাদী চট্টগ্রাম'র চীফ রিপোর্টার মুহাম্মদ ওবায়দুল হক গত ১৪ মার্চ ২০০২ তারিখে চট্টগ্রামের মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী ও আমাকে (লেখক) একটি করে সেদিন মাত্র প্রকাশিত হওয়া একটি বই 'সফরনামা': আরব ও হেজায'-এর কপি সরবরাহ্ করেন। এ বইটি তাঁর দাদা হাটহাজারী থানার ধলই (হাধুরখিল) নিবাসী মাওলানা এয়ার মুহাম্মদ সাহেবের নিজ হাতে আজ থেকে ৮৮ বছর আগে লিখিত তাঁর নিজের আরব-হেজাজ সফরের বর্ণনা হিসেবে একটি ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য দলিল বটে। ১৫ জুন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ (১৩২০) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভারত, মিসর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আরব ও হেজাজের বিভিন্ন নিদর্শন যেয়ারতে যাওয়ার ধারাবাহিক বর্ণনার সময়, দূরত্ব, যানবাহনের প্রকৃতি ও ভাড়াসহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন এতে এমন একটি সুস্পষ্ট নির্ভরযোগ্য দলিল দেখা যাচ্ছে, আজ থেকে মাত্র ৭০-৮০ বছর আগেও সেখানে অসংখ্য গুম্বুজওয়ালা মাযার ছিল। মাওলানা এয়ার মুহাম্মদ সাহেব ওহুদ প্রান্তরে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁত মুবারক শহীদ হবার স্থানটিকে গুম্বুজওয়ালা ঘর হিসেবে সংরক্ষিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানকার হযরত আমির হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মাযারকেও গম্বুজ ও লোহার গ্রীলওয়ালা মাযার ঘর বলে বর্ণনা

করেছেন। তিনি এরূপ অসংখ্য মাযারের অবকাঠামোগত বর্ণনা করেছেন, যা এরপরই ১৯৩২ সনের দিকে 'সউদী আরব' প্রতিষ্ঠার সময় ধ্বংস করা হয়েছে। উহুদের শহীদের মাযার-মসজিদের ছবি মক্কা শরীফ থেকে প্রকাশিত ওই বইটিতেও দেখেছি। শুধু তাই নয়, এয়ার মুহাম্মদ সাহেব প্রণীত সফরনামায় দেখা যায়, মক্কা শরীফে খানায়ে কা'বার সাথে জবলে আবী ক্বোবাইস পাহাড়ের পাদদেশে 'হযরত গাউসুল আ'যম আবদুল ক্বাদের জীলানী মসজিদ' ছিল যেখানে তিনি নামায আদায় করেছেন ১৯১৪ সনে। যার অস্তিত্ব বর্তমানে কল্পনাতীত। এরূপ অসংখ্য মসজিদ ও মাযার ভাঙ্গা হয়েছে শুধুমাত্র শির্ক-বিদ'আত ও হারাম থেকে মানুষকে রক্ষার মিথ্যা অজুহাতে।

[সূত্র. মৌলভী হাজি এয়ার মোহাম্মদ কর্তৃক ২৫ মাঘ ১৩৩০ বাংলা সনে প্রথম সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত গ্রন্থ 'সফরনামা আরব ও হেজায'র ১১ মার্চ ২০০২ তারিখে কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস, চট্টগ্রাম হতে সাংবাদিক ওবায়দুল হক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ সংখ্যা]

মোটকথা, সামগ্রিক কর্মকান্ডে এরা সুন্নিয়তের ধারা থেকে আলাদা হয়ে খারেজীদের কট্টরপন্থাকে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে ও এদের পেট্রোডলারের সুফলভোগি ওহাবী-খারেজীরা এখানকার সূফীতাত্ত্বিক উদার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বহুমুখী আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। মিলাদ মাহফিলে দাঁড়িয়ে (ক্বিয়াম) 'এয়া নবী সালাম আলায়কা' পড়ার মতো একটি ভাবগম্ভীর ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এরা একই সাথে মুখ, কলম এবং অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সুন্নিদের বিরুদ্ধে। সবাই মিলে উচ্চস্বরে দুরূদ পড়ার মতো ইবাদতেও এরা বাধা দিচ্ছে। এসব বিষয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সম্মুখবিতর্কে এদের পরাভূত করেছে বহুবার এবং ইসলামী সংস্কৃতির দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এখন এদের সমাজ ও সুন্নিদের চেয়ে অনেকটা আলাদা বলা যায়। এদের মাদরাসাগুলো সরকারি মাদরাসা বোর্ড, সরকারি সিলেবাস এমনকি সরকারি কোন বিধি-বিধান পর্যন্ত অনুসরণ করেনা। এখন খারেজ-কওমী মাদরাসাগুলোর টাকা যেমন সউদী আরব থেকে আসে, তেমনি সিলেবাসসহ অন্যান্য অনেক উপাদানও সেখান থেকে পায়। সুন্নীদের সাথে কোন কোন জায়গায় এদের বাড়ি-ঘর, মসজিদ পর্যন্ত পৃথক। ফলে ওহাবী-সুন্নীতে সাংস্কৃতিক পার্থক্যও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মওদুদীপন্থীদের সাথে সাংস্কৃতিক পার্থক্য শুধু সুন্নিদের সাথে নয় ওহাবীদের সাথেও রয়েছে। ওহাবীরাও বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমে আবুল আ'লা মওদুদী এবং তাঁর অনেক প্রকাশনাকে বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ

করেছেন। মওদুদীপন্থীরা মাদরাসা, মসজিদসহ অন্য অনেক ক্ষেত্রে সুন্নি-ওহাবী উভয়ের সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকলেও আক্বিদাগত ক্ষেত্রে এরা উভয়ের কাছে বিভ্রান্তিকর। শিয়াদের মতো এরাও 'সাহাবা-এ কেরাম সত্যের মাপকাটি নয়' মন্তব্য প্রকাশ করেছে বিভিন্ন বই-পুস্তকে। তাই তাদেরকে সাহাবীদের অনুসারী ধরা যাবেনা বিধায় পূর্বোক্ত হাদীস শরীফ অনুসারে বাতিলদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন অনেকেই।

তাসাউফ বা সূফী দর্শন ইসলামি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। বিশেষত: ভারত উপমহাদেশে এ বাংলাদেশের মানুষ হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে মুসলিম হয়েছে সূফী দরবেশদের হাতে; অথচ সেই সব পীর-ফকিরদের বিরুদ্ধে মওদুদীপন্থীদের অবস্থান। মওদুদী সাহেব 'ডায়াবেটিক রোগিকে যেভাবে চিনি থেকে, সেভাবে মুসলমানদেরকে পীর থেকে দূরে থাকার' পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন নামক বইয়ে ফাতেহাখানি, যেয়ারত, নযর-নেয়ায, ওরস ইত্যাদিকে মুশরিকদের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন, যা সুন্নি মুসলমানরা অন্তত: হাজার-হাজার বছর ধরে পালন করে আসছে। আর যেয়ারত ও ফাতেহা সুন্নাত হিসেবে হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়। সুতরাং মওদুদীর এ জাতীয় উক্তিগুলোর ইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘাষণার নামান্তর। এরাও ওহাবীদের মতো মাযার-ওরস উচ্ছেদের পক্ষে এবং শিয়াদের মতো সাহাবীদের এমনকি নবীগণ সম্বন্ধে পর্যন্ত বিভ্রান্তিকর আক্বিদার প্রচারক। এ ধরনের ৭২ দলীয় ইসলাম বিকৃতিকারী সম্প্রদায়ের কারণে ইসলামের মূল ধারার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নানাভাবে বাধাগ্রস্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। এতদসত্ত্বেও ইসলামের সাংস্কৃতিক বিস্তৃতির পেছনে আউলিয়ায়ে কেরাম তথা সুফী ত্বরিকার রয়েছে বিশাল অবদান। এরা ক্বোরআন-সুন্নাহ্, ইজমাহ, ক্বিয়াস'র আলোকে নিজ নিজ ত্বরিকার মধ্যে নিত্য নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে চলেছেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। নবীগণের আগমন বন্ধ হলেও মানুষ যাতে একতরফাভাবে শয়তানের অনুগত হয়ে না যায় এজন্যই নবীর উত্তরসূরী ও খলিফা হিসেবে আউলিয়া ও সংস্কারক ইমামগণ শয়তানী অপসংস্কৃতির প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন। তাঁরা ইসলামের প্রচারক, সংস্কারক ও বাতিলের প্রতিরোধকারী হিসেবে দুনিয়ার বুকে সর্বাবস্থায় বিরাজ করেন। ক্বোরআন-হাদীসে আউলিয়া-এ কেরামের যোগ্যতা, মর্যাদা, দক্ষতা ও কর্মময় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে একই সাথে সাড়ে তিন শত আউলিয়ার একটি

আধ্যাত্মিক শাসন-প্রশাসন থাকার কথা হাদীস শরীফেই রয়েছে। হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুসারে, শুধু শাম দেশেই চল্লিশ জন আবদাল সব সময় বিরাজ করবেন। এভাবে গাউস, কুতুব, আবদাল, আওতাদসহ বিভিন্ন স্তরের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সমন্বয়েই আল্লাহর খেলাফত-আউলিয়া সরকারের অধীনে চলতে থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত।

আর এ প্রশাসন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ রক্ষা করেন। বর্তমানে দুনিয়া ব্যাপী যে কয়েকটি ত্বরিকা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করেছে সেগুলো ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্সবন্দিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া নামে অধিক পরিচিত। গাউসুল আযম হযরত আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্বীনকে পুনর্জীবনদাতা 'মুহীউদ্দীন' হিসেবে যেমন পরিচিত, তেমনি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্বরীক্বা 'সিলসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরিয়া'রও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অনুসারী ত্বরিকতপন্থীদের 'ক্বাদেরী' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও রয়েছে এ ত্বরিক্বার লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরীদ।

বিশেষত: পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'দরবারে আলীয়া ক্বাদেরিয়া সিরিকোট' থেকে আগত গাউসে যামান আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ পেশোয়ারী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এবং গাউসে যামান আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে আজ এ ত্বরিক্বার ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁদের মাধ্যমে আজ থেকে নয়শত বচর আগে ইরাকের বাগদাদে উদ্ভূত এ ত্বরিক্বার যাবতীয় সংস্কৃতি যেমন, যিকির-দরূদ, খতমে গাউসিয়া শরীফ, গেয়ারভী শরীফ ইত্যাদি আমাদের ঘরে ঘরে অনুসৃত হচ্ছে। এ শতাব্দির সংস্কারক অলি, আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি প্রবর্তিত 'জশনে জুলূসে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' তথা মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আজ বাংলাদেশে গণ ইসলামি সংস্কৃতির অংশ হয়েছে। সউদী আরবে ওহাবীদের সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসে বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক অনুষ্ঠান তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আযানের পূর্বে দুরূদ-সালাম এগুলোর মধ্যে অন্যতম। চৌদ্দশ' হিজরীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির রচিত না'ত-ই রসূল 'সবসে আওলা ওয়া আ'লা হামারা নবী' এবং

সালাত-সালাম 'মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম' আজ চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এনেছে।

ঠিক সেভাবে চিশতিয়া ত্বরিকার নিজস্ব অন্যান্য কর্মকান্ডের সাথে সাথে ইসলামি গযলের সংযোজন ভারত উপমহাদেশের ইসলামি সংস্কৃতির সাথে এক বিশেষ সংযোজন। মুজাদ্দিদ আলফেসানী হযরত শেখ আহমদ ফারুক্বী সিরহিন্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ইসলামি সংস্কৃতির প্রাচীনতম উপাদান গরু জবাই-গরু কোরবানী বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে এবং সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের দরবারের অনৈসলামিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে কারাগারে গিয়েছিলেন বলেই আজ আমরা গরু কোরবানি করতে সক্ষম হচ্ছি। এ ভারত বর্ষে ইংরেজ আমলে ও হিন্দু-ওহাবীদের যৌথ উদ্যোগে গরু জবাই নিষিদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই সময় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নামে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীকে ওহাবীরা দিল্লী শাহী জামে মসজিদের মিম্বরে বসিয়ে বক্তৃতা শুনেছিল, যা এদেশে একটি অপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতো। আ'লা হযরত তাদের এ নীতিরও কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। বিশেষত: বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সংস্কৃতির সাথে ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্বশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া ত্বরিকার সমন্বিত সূফী দর্শনের উদ্ভব হয়েছে।

এভাবে সূফীগণের হাতে ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্র দিন দিন প্রসার লাভ করে বিশ্ব সংস্কৃতিকেই তাকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সূফীগণের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা নির্মাণে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ববহ বিবেচনা করতে হবে- অন্যথায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সংস্কৃতি আশা করা যায়না। বিশেষ করে যে উপাদানাটি ইসলামী সংস্কৃতিতে সে রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকে গুরুত্বসহ বিবেচিত হয়ে আসছে তা হলো পূর্বতন সমাজের আচার-আচরণ ও ঐতিহ্য। মনে রাখতে হবে ইসলাম কখনো স্থানীয় সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করেনি। কোন স্থানীয় কালচার অমানবিক ও ক্ষতিকর প্রমাণিত না হলে তা কখনো উচ্ছেদ করা হয়নি। ক্বোরআন করীমে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে; অথচ ইঞ্জীলের বিকৃত সংস্করণ বাইবেলে অনেক নবীর বিরুদ্ধে

আপত্তিকর অভিযোগ আনা হয়েছে, যা ধর্ম গ্রন্থের বিকৃতিরই সাক্ষী বহন করে। কিন্তু ইসলাম পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যতা প্রমাণ করেছে এবং তাঁদের সময়ের অনেক বিধানকেও বহাল রেখেছে।

ইসলামে এসে ওই বিধানাবলী ও ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণতা লাভ করেছে। তৎকালীন আরবে যে সব অপসংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে ইসলাম সেসব উচ্ছেদ করেছে মানবতার কল্যাণের প্রয়োজনে। ইসলাম শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়া বন্ধ করেছে। বিধবা বিবাহ্‌কে উৎসাহিত করতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম বিয়েটিই ছিল চল্লিশ বছর বয়স্কা হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সঙ্গে। আগে পিতা-স্বামী বা ভাইয়ের সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিলনা; অথচ ইসলাম তা দিয়েছে। নারীকে 'শয়তানের ফাঁদ' বলা হতো, পাশ্চাত্য প্রাচ্য সর্বত্র। তাকে আল্লাহর ইবাদত করার অধিকারও দেওয়া হতোনা; অথচ ইসলাম ধর্ম পালনে নারী-পুরুষে কোন পার্থক্য করেনি। আগে নারীদের শিক্ষার অধিকার ছিলনা। ইসলাম 'জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য ফরয' ঘোষণা করেছে।

[আল-হাদীস]

ইসলাম ইতোপূর্বের দাস প্রথা উচ্ছেদ করেছে। সাদা-কালো-ধনী-গরিবের পার্থক্য দূর করেছে। মানুষের নিজের এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর বিধায় মদ, জুয়া, ব্যভিচারের মতো অপসংস্কৃতি কঠোর হস্তে দমন করেছে। এভাবে ইসলাম যখন যেখানে গেছে স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও অপসংস্কৃতি উচ্ছেদের প্রয়োজন অনুভব করেছে। মুসলমানরা মিশর বিজয়ের পর সেখানকার প্রচলিত অনেক সংস্কৃতি সংরক্ষণ করলেও নীল নদের পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য যুবতী সুন্দরী কন্যা বলি দেওয়ার মতো জঘন্য অপসংস্কৃতি উচ্ছেদ করেছে। ভারতবর্ষে মুসলমানরা প্রায় হাজার বছর ধরে শাসন করেছে, অথচ কোথাও স্থানীয় সংস্কৃতি উচ্ছেদ করা হয়নি। কোথাও মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মিত হয়নি। কাউকে মুসলমান হতে বাধ্য করা হয়নি। এখনো সমগ্র ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ট, যা মুসলমানদের উদারতার বড় প্রমাণ। পৃথিবীর কোথাও অন্য ধর্মের শাসনে ভিন্নধর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কল্পনাতীত। মুসলমানরা ভারতে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে সত্য, স্থানীয় সংস্কৃতিকে উচ্ছেদ করেনি। ভারত বর্ষে সেন শাসকরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, অথচ ঐতিহাসিক দীনেশ চন্দ্র সেনের সাক্ষ্য হলো 'আমার বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গ ভাষার

এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।' স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি ইসলামের মনোভাবের সুফল সম্পর্কে রাহু সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'ইসলাম কী রূপরেখা'য় বলেন, 'ঔদার্যের কারণে স্থানিকতাকে অস্বীকার করে নেওয়ার ফলেই ইসলাম ভূমন্ডলে সম্প্রসারিত হয়েছে।' বাস্তবেই এ ঐদার্য্য যখন বিঘ্নিত হয়েছে তখনই দেখা গেছে বিপত্তি। পাকিস্তান ইসলামের এ বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার পরিণতি হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেয়েছে, পরবর্তী সময়ে। ততদিনে পাকিস্তান হারিয়েছে তার একটি অংশ এবং ওই অংশের ভাইদের আগের সহানুভুতিও। পাকিস্তানের অনেক সুকীর্তি পর্যন্ত আজ আলোচনায় আনবার সাহস নাই কারো। কারণ, এদেশের পরবর্তী সাংস্কৃতিক অঙ্গন অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তাদের অপমান করে বিদায় করেছে এ দেশ থেকে। পৃথিবীর কোথাও যাতে মুসলমানদের পরিণতি এমন না হয়, যাতে ইসলাম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থেকে শাসন করতে পারে, এজন্যই স্থানীয়তাকে গ্রহণের নযীর স্থাপন করে গেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ। আমরা তাঁদেরই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী। তাই, ইসলামি সংস্কৃতি হঠাৎ আসমান থেকে নেমে আসা কোন কিছু নয়। এটি সমগ্র বিশ্ব সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন একটি রূপমাত্র। 'সারা বিশ্বে সংস্কৃতির একটি ঐক্যতো আছেই, যার মূলে মানবজাতির ঐক্য, সেই আদি এক পুরুষ ও এক নারীর ঐক্য। কিন্তু আবার অজস্র জাতিগত বিচিত্রতায় প্রত্যেকে একটু একটু করে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।' ... 'ইসলামী সংস্কৃতির যেমন একটি অভিন্ন মৌলিক পাটাতন আছে, তেমনি আছে দেশ ভেদে ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্নতাও।' [আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাহিত্যে মুসলমান পৃ.৪৩,৩]

আবদুল মান্নান সৈয়দ বাঙ্গালী মুসলমানের সংস্কৃতির রূপরেখা তুলে ধরে বলেন, কালচারের দু'টি অংশঃ একটি আদর্শিক; অপরটি স্থানিক। সংস্কৃতির স্থানিকতা ততোক্ষণ গ্রাহ্য যতোক্ষণ আদর্শকে আঘাত করে না। যেমন, বাঙালি মুসলমান স্থানিক পোশাক গ্রহণ করেছে, কিন্তু প্রতিমা পূজা করেনা।' [প্রাগুক্ত, পৃ.৫১]

সুতরাং বাংলাদেশের ইসলামি সংস্কৃতি ও স্থানীয় পরিচ্ছন্ন ঐতিহ্যকে ধারণ করে এবং আদর্শ বিরোধী অংশকে বর্জন করে এগিয়ে চলবে। ইসলামি সংস্কৃতিতে আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ বিনোদনের ও শিল্প সাহিত্য চর্চার পথ অবারিত রাখতে হবে যাতে এসব বিষয়ে কেউ নিজস্ব মাধ্যমের অনুপস্থিতিতে অপসংস্কৃতির ক্রীড়নক হয়ে না যায়। ভালো কবি ও কবিতাকে পৃষ্ঠপোষকতা না দিলে খারাপ কবিদের দৌরাত্ম্য বাড়বে। ইসলাম বিভ্রান্ত কবিদের যেমন নিন্দা করেছে তেমনি উত্তম কবিতার প্রশংসাও করেছে। পবিত্র ক্বোরআনের সূরা 'আশ-শোয়ারা'য় বলা হয়েছে, "এবং কবিদের সম্বন্ধে বলা যায়, বিভ্রান্ত লোকেরাই তাদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখতে পাওনা। তারা উপত্যকায় উপত্যকায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়, তদুপরি তারা মুখে যা বলে কাজে তা করেনা। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে অতিমাত্রায়

তৎপর রয়েছে এবং অত্যাচারিত হলে নিজেদের আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে, তাদের সম্বন্ধেও কথা প্রয়োজ্য নয়। জুলুমবাজরা সত্বরই জানতে পারবে তাদেরকে কি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে।" এ আয়াতের পূর্ব ভাগে ভ্রান্ত কবিদের নিন্দাবাদ এবং শেষভাগে হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র মতো কবিদের উৎসাহিত করা হয়েছে; বরং কাফিরদের কবিতার জওয়াবে কবিতা রচনার জন্য উৎসাহিত করে হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহও রসূলের সাহায্য করেছে, কথা (কবিতা) দ্বারা আল্লাহর সাহায্য করতে কে তাদের বাঁধা দিয়েছে?

[আল হাদীস]

উক্ত ক্বোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি বর্তমান বিশ্ব এবং আমাদের দেশে সমভাবে প্রযোজ্য। আজ কবিতা এবং সংগীতের নামে চলমান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে ঈমানদার-মুত্তাক্বীদের একই অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসা সময়ের দাবী।

সংস্কৃতির এমন কোনো বিভাগ নেই যেখানে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলনা। খ্রিস্টান দুনিয়া যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন ইসলাম জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যকে আলোকিত করেছে। গবেষণা ও মুক্ত চিন্তার বন্ধ দরজাকে মুক্ত করেছে। মক্কা-মদীনা, কুফা-বসরা, দামেস্ক থেকে স্পেন পর্যন্ত গ্রন্থাগারের পর গ্রন্থাগার বানিয়েছে। বানিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইতিহাস বলুন আর দর্শন বলুন কিংবা অনুবাদ শিল্প বলুন সবকিছুই তো মুসলমানদের অবদান। প্রাচীন বিজ্ঞানের শুরু থেকে সফলতার শীর্ষে আরোহণ পর্যন্ত সবকিছু মুসলমানদের হাতেই হয়েছে যখন ইহুদী-খ্রিস্টানরা নতুন আবিস্কার বা বক্তব্য সহ্য করছিলনা। বিজ্ঞানীদের জীবন্ত কবর দিচ্ছিল। তখন শব্দ বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যার মতো প্রাচীন বিজ্ঞানের এক একটি অধ্যায় আবিস্কার করে যাচ্ছে মুসলমানরা। সাহিত্যিক অগ্রগতিতে মুসলমানদের অবদানের স্বীকৃতি কে না জানে। দর্শন শাস্ত্রে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল শীর্ষ স্থানীয়। ভূগোল, মানচিত্র বিদ্যায়ও মুসলমানদের অবদান ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ে।

সার্টন (Sarton) তাঁর Indtroduction to the History of Science গ্রন্থে বলেন, "মানব সমাজের প্রধান কাজ মুসলমানগণ সাধন করিয়াছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল ফারাবী ছিলেন মুসলমান, সর্বশ্রেষ্ঠ গণিত বেত্তা আবু কাবিল ও ইব্রাহিম ইবনে সিনান ছিলেন মুসলমান, সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ও বিশ্বকোষ প্রণেতা আল মাসূদী ছিলন মুসলমান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আততাবারীও ছিলেন মুসলমান।"

[P.K. Hitti, History of the Arabs সূত্রে, কে. আলী মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃ.-৩২১]

আজ আধুনিক বিজ্ঞান ও ইউরোপের যে অগ্রগতি তার ভিত্তি মুসলমানদের হাতে একথা অকপটে স্বীকৃত হয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়- যা মুসলমানদের উন্নত সাংস্কৃতিক ভিত্তির পরিচায়ক। সংস্কৃতির মূল পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র (রাজনীতি) এবং এর চালিকা শক্তি

অর্থনীতি-ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ছিল একাধারে হাজার বছরেরও বেশি। সংস্কৃতির উক্ত সব বাহন ছাড়াও বিনোদন শিল্পপটিও এক নতুনত্ব লাভ করেছিল মুসলমানদের হাতে। সংগীত শিল্পটি হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলমানদের হাতে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। অশ্লীল যৌন আবেদনময়ী এ শিল্পটিকে মুসলমানরাই পরিচ্ছন্ন বিনোদনের উপযুক্ত করেছে। 'খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে আয়োজিত এক সংগীত অনুষ্ঠানে দুই হাজার গায়ক অংশ গ্রহণ করেছিলো।'

[কে. আলী. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৫৮]

ইমাম গাযালী তাঁর 'এহইয়া-উল উলুম' গ্রন্থে নিষিদ্ধ ও বিধিসম্মত সংগীতের বিবরণ দিয়েছিলেন। খ্রিস্টান বিশ্বের নিষিদ্ধ সংগীতের মুকাবেলায় মুসলমানরা বিধিসম্মত রুচিশীল সংগীতের চর্চা করতেন। গাযালী, সংগীতকে স্নায়ু ও মস্তিস্কের খোরাক বলে মন্তব্য করেন। আবুল ফারাজ ইস্পাহানী আরবীতে সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেন, যা ২১ খন্ডে বিনস্থ ছিল এবং এতে একশত প্রকারের স্বরলিপির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ ছিল। বাগদাদে অসংখ্য সংগীত স্কুল ছিল এবং এ সময় সংগীত বিষয়ক বহু গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়েছিল। আমাদের এ ভারত বর্ষে সংগীত শিল্পের উন্নয়নের জন্য হযরত মাহবূবে এলাহি নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলায়হির খলিফা তুতিয়ে হিন্দু নামে পরিচিত হযরত আমির খুসরু রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এখনো বিখ্যাত হয়ে আছেন। আমির খুসরু রহমাতুল্লাহি আলায়হি বেশ কিছু বিশেষ বাদ্যযন্ত্র আবিস্কারসহ উচ্চাঙ্গ সংগীতের জন্য বিখ্যাত ব্যক্তি; অথচ আজ এ মাধ্যমটির অপব্যবহার। এ ব্যাপারে উদাসীনতায় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়েছে। হস্তলিপি শিল্প (Calligraphy) তখনো মুসলমানদের হাতে ছিল। ইনশাআল্লাহ, এখনো অন্তত, আরবী ক্যালিগ্রাফীতে মুসলমানদের প্রতিভা বিশ্ববরণীয় হয়েছে।

সুতরাং যে সব বিভাগে ইতোপূর্বে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ছিল সে সব মাধ্যমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যে সব নতুন নতুন দিক বিনোদন ও শিল্পের নামে বাজারে আসছে তাতেও অবস্থান মজবুত করতে হবে। অন্যথায় সে সব মাধ্যম থেকে বিনা প্রতিরোধে ইহুদী-খ্রিস্টান ও আর্য সংস্কৃতির মিসাইল এসে আমাদের সমাজকে লন্ডভন্ড করে দেবে। বর্তমানে দিচ্ছেও। বর্তমানে মেলা'র যে কদর বেড়েছে একে স্বচ্ছ ও সুন্দররূপে কাজে না লাগিয়ে উপায় নেই। জশনে জুলূস এ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হিজরি নববর্ষ, ঈদ উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে সুস্থ বিনোদনমূলক নতুন নতুন উপাদান যোগ করে মেলার আয়োজন করা দরকার। বই, ক্যাসেট, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও দেশীয় শিল্প সামগ্রির সমাহার করে এ মেলাকে জনপ্রিয় করতে হবে। ফ্যাশন শো-বিজ্ঞাপন শিল্পকেও আমাদের আদর্শ ও বিশ্বাসের আলোকে সাজাতে হবে। অন্যথায়, যেভাবে এই দুই শিল্প পাশ্চাত্যের বেহায়া সংস্কৃতির দিকে এগুচ্ছে শীঘ্রই নতুন প্রজন্মকে মূল্যবোধ বিস্মৃত করে দেবে।

মনে রাখতে হবে, ইসলামে সব নতুন আবিস্কার (বিদ'আত) নিন্দনীয় নয়। বিদ'আত-এ হাসানা-ভালো উদ্ভাবন এবং বিদ'আত-এ সাইয়্যি বা মন্দ উদ্ভাবন এ দুই প্রকার রয়েছে। বিদআত-এ হাসানাহ্ নতুন সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার দলিল হিসেবে যথেষ্ট। ইসলামি সংস্কৃতির পরিসর বাড়াতে ব্যর্থ হলে নতুন প্রজন্ম বিজাতীয় সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। নিজের ঘর টিকিয়ে রাখতে যুগোপযোগি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ ইসলামই খোলা রেখেছে, ইজমা', ক্বিয়াস ও ইজতিহাদের অনুমতি দিয়ে।

বর্তমানে বিয়ে শাদীকে উপলক্ষে করে সঙ্গীতানুষ্ঠান করা হয়। পূর্ববর্তী সময় মুসলিম সমাজে বিবাহের পূর্বরাতে দক্ষ আলিম দ্বারা ওয়াজ-নসিহতের আয়োজন করা হতো। ওই মাহফিলে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য, মাতাপিতার প্রতি নব দম্পত্তির কর্তব্য এবং স্বামীর পরিবার গঠন ও সন্তান-পালনের ইসলাম সম্মত সুন্দর পদ্ধতিগুলো আলোচনা ও রপ্ত করা হতো। এখন ক্রমশ মুসলিম সমাজে এ সুন্নাতটি পালনের ক্ষেত্রে অইসলামী সংস্কৃতি চালু হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের বিবাহে বিধর্মীদের সমাজে প্রচলিত অশ্লীল গান-বাদ্য, তাও বিকট ও শব্দ দূষণ সম্বলিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার চলছে দেদারসে। এতে মুসলিম সমাজে ধর্মহীনতা, অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ তো ঘটছেই। পক্ষান্তরে আর্থিকভাবেও মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পরিশেষে, আমি সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত ও সংস্কৃতির অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে লেখার ইতি টানলাম।

--সমাপ্ত--